মানুষের সত্যিকারের বন্ধু

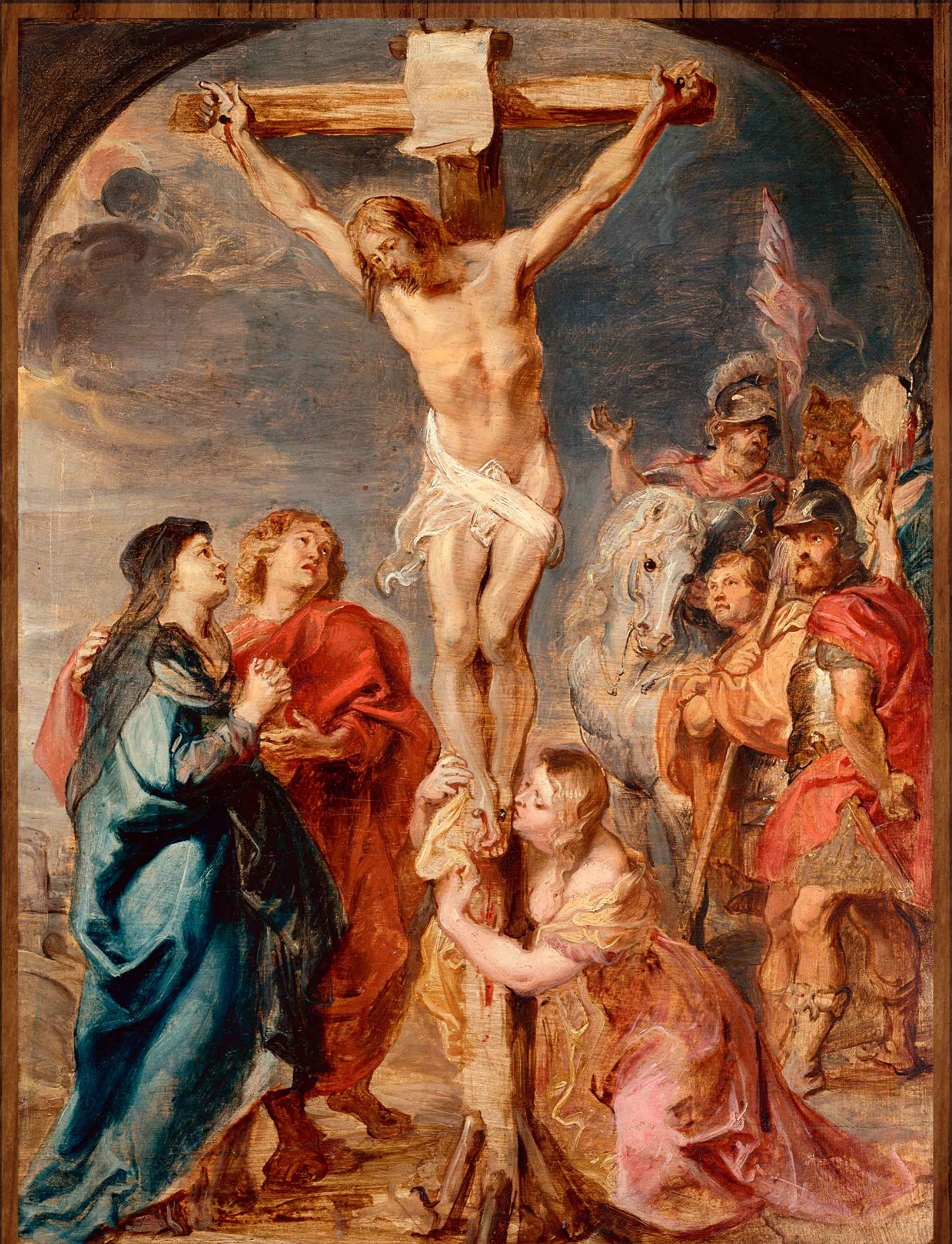

মানুষের সত্যিকারের বন্ধু

"কেউ যদি আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয়,
তবে তার চেয়ে বেশি প্রেম কারো নেই।" – যীশু

পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ
(বাচিব) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইসিবি)
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh
(BACIB) & International Bible Church (IBC)

মানুষের সত্যিকারের বন্ধু

The True Friend of Human Beings

লেখক: পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

By: Pastor Shamsul Alam Polash (M. Th)

ইন্টারনেট সংস্করণ, জুলাই ২০২৪

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব (©) সংরক্ষিত

এই পুস্তকে পবিত্র বাইবেলের যে সব পদ ব্যবহার করা হয়েছে তা বাচিব কতৃক প্রকাশিত “নিউ কেরী ভার্সন” থেকে নেওয়া হয়েছে।

Published By:
BACIB & IBC
House # 12, Road # 4, Sector # 7,
Uttara, Dhaka - 1230, Bangladesh.
Email: contact@ibc-bacib.com; bacib123@yahoo.com
Phone: +880 1714075742

BACIB | International Bible CHURCH

মানব দেহে খ্রীষ্টের আগমন

(লূক ১:১৮-২৫)

খ্রীষ্টের জন্মের যে সময়কাল কাল তা 'পূর্ণতা'র এক অপর নাম। যুগ যুগান্ত ধরে মানুষের মনে মুক্তির বিষয়ে যে নানান প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের সময়কাল সেই সব প্রশ্নের উত্তরের এক শুভ সময়ের ক্ষণ। সমস্ত সৃষ্টিতে যে গভীর রহস্য লুকিয়ে ছিল এই সময়কাল সেই রহস্যের উম্মোচনের শুভ সময়। এটি মহান ঈশ্বরের মানুষ হয়ে মানুষের বেশে মানুষের মাঝে বাস করার শুরুর সময়। ঈশ্বর তাঁর অভিষিক্ত খ্রীষ্ট হিসাবে পৃথিবীতে নেমে আসার যে রহস্য তা আমাদের সীমিত বোধ দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। একে বুঝতে হলে সত্যিকারের হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালবাসতে হবে– উপলব্ধি করতে হবে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির পরিকল্পনাকে।

আজও হাজারো মানুষের প্রশ্ন ঈশ্বরের পক্ষে কি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা সম্ভব? সত্যিই কি সময়ের পরিক্রমায় তা ঘটেছিল যা আমরা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করি? হয়তো সেই প্রশ্ন যুগান্তরের শেষ সময় পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু ২০০০ বছর আগে মথি, মার্ক, লূক ও যোহনের মত সুসমাচার লেখকের কল্যানে আমরা জানতে পেরেছি যে, সত্যি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বাক্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি মানুষের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি মানুষ হলেন। এটি একটি বিশাল রহস্য। শুধু আমরা নই, সমস্ত সৃষ্টি এই রহস্য সম্বন্ধে জানতে চায়, জানার জন্য উৎসুক হয়। মানুষ ছাড়াও যেসব বুদ্ধিমান মহাজাগতিক

প্রাণী এই মহা বিশ্বে বিরাজমান তারাও এই রহস্য জানার জন্য– মানুষের মুক্তির পরিকল্পনাকে জানার জন্য উৎসুক হয়। আমরা হাজার হাজার বছর পর্যন্ত জানতাম না কী করে মায়ের গর্ভে মানুষের দেহ গঠিত হয়, কী করে সেই শিশুদের ভেতরে জীবন-বায়ু প্রবেশ করে যদিও এখন আমরা বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার ফলে অনেক কিছু জানি, এমন কি এর ছবিও দেখতে পাই। কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদের শক্তিতে খ্রীষ্টকে একজন কুমারী নারী– মরিয়মের গর্ভে বড় করে তুলেছিলেন। কারণ তিনিই কেবলমাত্র তা করতে পারেন।

ঘটনার বিবরণে দেখা যায়, আমাদের প্রভুর মা, মরিয়ম যোষেফের বাগদত্তা ছিলেন। ঈশ্বর যখন মানুষের সমাজে বাস করবার জন্য এই পৃথিবীতে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন তখন তিনি তৎকালীন মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতির অবকাঠামোর মধ্যেই আসলেন। তিনি মানুষের সমাজে আসবার জন্য তৎকালীন মানুষের সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করলেন। আমরা দেখতে পাই যে, সামাজিকতা মেনেই যোষেফের বিয়ে মরিয়মের সাথে ঠিক হয়েছিল। সে সময় নিশ্চিতভাবেই এটিকে বিয়ের জন্য চুক্তি বলে ধরা হতো। এই চুক্তির মাধ্যমে নারী ও পুরুষ পরস্পর বিয়ের প্রস্তুতি গ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করতেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে এই প্রতিজ্ঞা করা হতো বলে তা তাদের কাছে খুবই পবিত্র ছিল।

কিন্তু এর মধ্যেই এমন কিছু ঘটে গেল যা বাধা হয়ে দাঁড়াল যোষেফের কাছে। তিনি জানতে পারলেন যে, মরিয়ম ইতিমধ্যেই গর্ভবতী। যাকে

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সামাজিকভাবে ঘরে তুলবেন তিনি গর্ভবতী। এটা তার কাছে অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা ছিল! ঘটনার আকস্মিকতায় যোষেফ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। ভাবতে মোটেও অসুবিধা হয় না যে, যোষেফ মানসিকভাবে কতটা হতাশ ও সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিলেন। যাঁকে তিনি বিয়ে করার জন্য তাঁর বাগদত্তা হিসেবে বেছে নিলেন, তাঁর এভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়াটা মেনে নিতে মানুষ হিসেবে যোষেফের স্বভাবতই কষ্ট হওয়ার কথা। যে নারী এরকম পাপের সাথে জড়িত তার সাথে একই ছাদের নিচে তিনি কীভাবে বাস করবেন! আর কীভাবেইবা তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে মেনে নেবেন! 'এই কি সেই মরিয়ম?' যোষেফ তখন ভাবতে বসলেন, 'যাকে ভাল বলে জানি সে কীভাবে এভাবে প্রতারণা করতে পারে! যাঁকে নিয়ে আশার স্বপ্ন বুনলাম সে কী করে এমন হতাশার চাবুক ছুঁড়ে মারতে পারে!" ভাবতে ভাবতে তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার যোগাড়। যে মরিয়মকে তিনি সতী বলে জানতেন তাঁর গর্ভবতী হয়ে পড়ার খবর শুনে তিনি নিজেকে বঞ্চিত, প্রতারিত ভাবার প্রয়াস পেয়ে ঠিক করলেন যে, তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দেবেন, এনগেইজমেন্ট থেকে বের হয়ে আসবেন। সে সময় এনগেইজমেন্টের যে চুক্তি হত মাত্র ভেঙ্গে দেবার মাধ্যমেই তা থেকে মুক্ত হবার প্রথা ছিল। তিনি মনে করলেন এরকম একটি মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন সংসার করাটা অসম্ভব। তাঁকে ক্ষমা করাটাতো আরও খারাপ কাজ হবে। একদিকে নিজেকে প্রতারিত ভেবে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন তিনি। অন্যদিকে মরিয়মের প্রতি ভালবাসার দরুন আরও মুষড়ে পড়েছিলেন। ভালবাসা ও ঈর্ষার এক চরম দ্বন্দ্ব তাই যোষেফের মনে আপনা থেকেই কাজ করতে থাকে।

যোষেফ মরিয়মের অবস্থার চরম প্রকাশের কথা চিন্তা করে তা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তিনি তাঁকে লোকের সামনে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না। কিন্তু তিনি ইচ্ছে করলে মরিয়মের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। হয়তো তা-ই করতেন কারণ ব্যবস্থার মতে বাগদত্তা স্ত্রীলোক যদি ব্যভিচার করতো তবে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হতো (দ্বিতীয় বিবরণ ২২: ২৩, ২৪)। কিন্তু তিনি চাইলেন না যে, আইন-কানুন অনুযায়ী মরিয়মের উপর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক বা মরিয়ম ব্যভিচার করার অপরাধে পাথরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করুক। যদিও তাঁর জানার উপায় ছিল না যে, মরিয়ম দোষী কি নির্দোষ ছিলেন; আর প্রকৃতপক্ষে মরিয়ম দোষী ছিলেন কি না সেটা তার পক্ষে জানাও সম্ভব ছিল না।

পবিত্র শাস্ত্রে যোষেফ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা মনে করে দেখতে পারি, কারণ বলা হয়েছে, 'তিনি ছিলেন ধার্মিক এবং ভাল মানুষ' যে কারণে তিনি ঈশ্বরের সেই ক্ষমাশীলতার গুণ দেখাতে পেরেছিলেন। মন কঠিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে– খারাপটা ভাবার সাথে সাথে তিনি ভালটাও ভাবতে শিখেছিলেন। কারণ যোষেফ শেষ পর্যন্ত তো একজন মানুষই ছিলেন; যে কারণে তিনি মরিয়মকে লোকের সামনে লজ্জায় ফেলতে চাননি। ঈশ্বর যেভাবে আমাদের ক্ষমা করেন সেভাবেই তিনিও মরিয়মকে ক্ষমা করলেন; কারণ ঈশ্বরের শিক্ষা তাঁর মাঝে ছিল। আইন-কানুন মতে একজন নিরাপরাধ কুমারী যার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে সে যদি অনিচ্ছায় কারও দ্বারা ধর্ষিত হয় তবে তাকে কিছুই করা হতো না (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:২৬)। মরিয়মের বেলায় হয়তো এরকমও ঘটতে পারে। যদি তাই হয় তবে তো সে নির্দোষ।

হয়তো যোষেফ এমনটা ভেবে থাকবেন। তাই এরকম নিয়ম-কানুনের কথা যোষেফ জানতেন; বোধকরি সে কারণেই এই ঘটনায় তাঁর এরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অন্য আর একটি কারণ হতে পারে যে, তিনি চাইছিলেন যেন তাঁর চরিত্রের যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে তা অটুট থাকে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যোষেফ আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন।

যোষেফ একটি সহজ সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন। কারণ গর্ভবতী মরিয়মের শেষ অবস্থা উপনীত হওয়ার আগেই তিনি তাঁকে গোপনে ত্যাগ করতে চাইলেন। এই ত্যাগ দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হতো তা হল – দু'জন সাক্ষীর সামনে মরিয়মের হাতে লিখিত ভাবে ত্যাগ দেওয়ার কাগজ তুলে দিয়ে নিজেদের মাঝেই ঘটন-াটি চাপা দেওয়া। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে, যিনি ব্যবস্থার বিষয়ে ভালভাবে জানতেন তিনি মরিয়মকে বিয়ে না করেই তাঁকে ত্যাগ দেয়ার সমাধান খুঁজলেন। এই কাজ করতে তিনি যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইলেন। কারণ তিনি মরিয়মকে লোকদের সামনে লজ্জায় ফেলতে চাননি। তিনি জানতেন যে, বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তাকে সমাজের নিন্দার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

আমরা পবিত্র শাস্ত্রে লক্ষ্য করি, যোষেফ যখন এসব ভাবছেন– তিনি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন স্বর্গ থেকে পাঠানো এক বার্তায় তার সেই অবস্থাটা কেটে গেল (১:২০, ২১ পদ)। তিনি যখন কী করবেন তা মনস্থ করতে পারছিলেন না তখন ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের শক্তিতে

যোষেফকে দিক-নির্দেশনা দিলেন; তার করণীয়কে অনেক সহজ করে দিলেন। স্বপ্নযোগে ঈশ্বর তার জন্য পরামর্শ পাঠালেন– কি করতে হবে সুনিদিষ্টভাবে তা তাকে জানিয়ে দিলেন।

এর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে দেন নি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র যীশু যেন যোষেফের ছেলে হিসাবেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। এছাড়া সামাজিক বিয়ের মাধ্যমে মরিয়মের এ ব্যাপারটি রক্ষা পেতে পারে এবং মানুষের কাছে যীশু খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য পবিত্র শাস্ত্রে দেখা যায়, লোকেরা যীশুর বিষয়ে প্রশ্ন করেছে ‘এ-ই কি সেই কাঠমিস্ত্রির ছেলে নয়?’ যদি এই সামাজিকতার চাদরে এটি ঢাকা না হত তবে এর পরিবর্তে হয়তো বলা হত ‘এ-ই কি সেই বেশ্যার ছেলে নয়?’

অন্য দিকে, যদিও মরিয়ম ঈশ্বরের পুত্রের মা হতে যাচ্ছেন– পরম ধন্য হিসাবে তিনি স্বর্গদূত কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছেন– তবুও তাঁর কি প্রয়োজন ছিল না এমন একজন সঙ্গীর যিনি তাকে ভালবাসবেন? যাঁর কাছে তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনে সাড়া পাবেন তাঁর তারুণ্যে ভরা দিনগুলোতে, একাকীত্বে, তাঁকে সঙ্গ দেবেন? ঈশ্বর ঠিকই তাঁর জন্য ভেবেছিলেন। সেজন্য যোষেফের সঙ্গে তাঁর যে ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান করতে ঈশ্বর নিজেই উদ্দ্যোগ নিয়েছিলেন। এই সম্পর্কের মধ্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি যাতে না হয় সেজন্য বিয়েতে ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছিলেন। যোষেফের কাছে ঈশ্বরের নির্দেশনা সেই স্বর্গদূতই নিয়ে এসেছিলেন যিনি মরিয়মের কাছে যীশুর জন্মের সুসংবাদ দিয়েছিলেন; আর তিনি

হচ্ছেন গ্রাব্রিয়েল। স্বর্গীয় দূতেরা যাঁরা ঈশ্বরের আদেশ পালনে সর্বদা নিয়োজিত থাকেন, তাঁদেরই একজনের দ্বারা মানুষ এখানে পুনরায় সম্মানিত হল। আদমের পাপের ফলে মানুষ ঈশ্বরের কাছে থাকার যে অধিকার হারিয়েছিল, সেই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় স্বর্গদূতের কার্যক্রম মানুষকে নতুন করে আশান্বিত করে তুললো।

যোষেফের সঙ্গে মরিয়মের বিয়ের বিষয়ে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ভিন্ন আরেকটি কারণে প্রয়োজন ছিল। স্বর্গদূত যোষেফকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন মরিয়মকে বিয়ে করার জন্য কারণ বংশের দিক থেকে খ্রীষ্টের জন্য যোষেফের বংশ প্রয়োজন ছিল। যদিও যীশু ঈশ্বরের পুত্র ঐশ্বরিকভাবে কিন্তু সামাজিকভাবে তিনি অবশ্যই দায়ূদের বংশে আসবেন কারণ সেরকম ভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। যিহূদীরা সেটাই এক্সপেক্ট করতো। তাই পবিত্র শাস্ত্রে দেখা যায়, স্বর্গদূত তাকে 'দায়ূদের বংশধর যোষেফ' বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ সবাই জানতো যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশে আসবেন। যারা ক্ষুদ্র, সমাজের চোখে বড় মাপের মানুষ নন তারা অনেক সময় বিরাট সম্মান পেয়ে গেলে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন না; তারা তা রেখে আসতে চান; খ্রীষ্ট যে যোষেফেরই বাগদত্তা মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেবেন তা শুনে যোষেফের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটাই তো ছিল স্বাভাবিক। এক দরিদ্র কাঠমিস্ত্রি তখন ভাবতে লাগলেন, 'যোষেফ, তুমি তো খুবই সাধারণ ছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার অংশী হিসেবে তোমাকে যখন বেছে নিয়েছেন, তখন অবশ্যই তুমি মূল্যবান। নিজেকে তুচ্ছ মনে কোরো না; কারণ দায়ূদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তোমার মধ্য দিয়েই বাস্তবে রূপ লাভ করতে যাচ্ছে।'

ঈশ্বরের দূত যোষেফকে বলেছিলেন, 'মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় পেও না'। যোষেফ আসলে মরিয়মকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে ভয় পেয়েছিলেন কারণ তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে, ব্যভিচারের কারণেই মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছেন; তাই তিনি তাকে গ্রহণ করে অনাহুত পাপ কিংবা নিন্দা বয়ে আনতে চাননি। কিন্তু ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন, 'ভয় পেও না, কারণ এ সন্তান পবিত্র-আত্মার শক্তির প্রকাশ।' যোষেফ হয়তো মরিয়মের কাছ থেকে পবিত্র-আত্মার এই কাজের বিষয়ে আগেই শুনেছিলেন; এমনকি এলিজাবেত তাঁর সম্পর্কে মরিয়মকে যা বলেছিলেন তা-ও তিনি শুনে থাকতে পারেন (লূক ১:৪৩)। এলিজাবেত মরিয়মকে 'প্রভুর মা' বলে সম্বোধন করায় যোষেফ হয়তো তার সীমিত বোধে মরিয়মের এই মহিমান্বিত রূপ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। ফলে মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সব ভয় দূর হয়ে গেল এই কথায়, 'মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় পেও না'। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সন্তুষ্টির সাথে কোন কাজ করতে গিয়ে যাবতীয় ভয়, সন্দেহের অবসান হওয়াটা ঈশ্বরের আশীর্বাদেরই কাজ।

যোষেফকে এই পবিত্র সত্যের বিষয়ে জানানো হয়েছিল যে, তাঁর বাগদত্তা মরিয়ম পবিত্র-আত্মার শক্তিতে গর্ভবতী হয়েছেন। ফলে এ নিয়ে যোষেফের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করার ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক আলাপ-আলোচনা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন, কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেখানে তাঁকে সেই সত্যের বিষয়ে বলছেন, তখন তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইল না। এখানে আমরা দু'টি বিষয় দেখতে পাই:

প্রথমত: মরিয়মের গর্ভে যে সন্তান এসেছে তা পবিত্র-আত্মার শক্তিতেই হয়েছে; পৃথিবীর কোন মানুষের দ্বারা হয়নি। পবিত্র আত্মা– যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করেন সেই তিনিই এখানে পৃথিবীর মানুষের পরিত্রাতার তত্ত্বাবধান করছেন। যেমনটা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে তিনি খ্রীষ্টের দেহের আদল গড়ে চলেছেন। ইব্রীয় ১০:৫ পদে আমরা দেখি 'কিন্তু আমার জন্য একটা শরীর তুমি তৈরি করেছ'। খ্রীষ্ট এক নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (গালাতীয় ৪:৪) এবং তিনি সেই দ্বিতীয় আদম যিনি স্বর্গ থেকে এসেছিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৪৭)। তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি ধন্য এবং তাঁকে গর্ভে ধারণ করায় তাঁর মা মরিয়মকেও 'সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তুমি ধন্যা' বলে অভিহিত করা হয় (লূক ১:৪২)। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের পরিবারে খ্রীষ্টের অত্যন্ত সাধারণ জন্মের ফলে তিনি মানবীয় প্রবৃত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষেও দুর্নীতি, অনিয়মে গা ভাসিয়ে দেয়াটা হতো স্বাভাবিক; কিন্তু এখানেই আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই। দৈহিকভাবে খ্রীষ্ট একশো ভাগ মানুষ হলেও স্বভাবে তিনি ঈশ্বর-ই রইলেন। এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে মরিয়মের গর্ভে তাঁর জন্ম স্বাভাবিক নিয়মে হয়নি। সেজন্য মরিয়মকে 'ধন্যা' বলা হয়েছে। ঈশ্বরের দূত-ই তাঁকে এই অভিধা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

দ্বিতীয়: মরিয়মের যে ছেলে হবে তিনি সমস্ত মানুষকে তাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন (মথি ১:২১ পদ)। মরিয়মের ছেলেকে এক মহান নাম দেওয়া হল: 'তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি সমস্ত মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন'। খ্রীষ্টের 'যীশু' নামকরণের মূল যে কারণ তা হচ্ছে, তিনি তাঁর লোকদের পাপ থেকে পরিত্রাণ

করবেন। লোক বলতে এখানে শুধুমাত্র যিহূদীদেরই কথা বলা হচ্ছে না উপরন্তু পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যারা তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করবে তিনি তাদের প্রত্যেককে পাপের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করবেন। ঈশ্বর যাদের মনোনীত করে রেখেছেন তারা এবং যারা স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টের কাছে আসবে তারাই এই পরিত্রাণ পাবে। তিনি সেই রাজা– যিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেন এবং তিনি পুরানো দিনের সেই বিচারক যিনি তাঁর লোকদের পরিত্রাণ দেন। এর মাধ্যমে শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হল।

এখানে যীশুর জন্মের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেল। কারণ যীশু-ই সেই খ্রীষ্ট যাঁর আসবার কথা ছিল এবং যাঁর সম্পর্কে পূর্বেকার ভাববাদীরা বলেছিলেন। ফলে আমাদের আর অন্য কারও দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। যীশুর জন্মের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের যে কথা পূর্ণ হল তা আমরা যিশাইয় ৭:১৪ পদে দেখতে পাই। ‘একজন কুমারী গর্ভবতী হবে;’ খ্রীষ্ট একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এটা ছিল একটা চিহ্ন। একজন কুমারী গর্ভবতী হবে আর তাঁর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট পৃথিবীতে আসবেন (লূক ১:৩৪)। এই চিহ্নটি সত্যিকার অর্থেই ছিল অসাধারণ; যেরকমটা পৃথিবীর আর কারও জন্যেই দেওয়া হয়নি। খ্রীষ্ট সম্পর্কে শুরু থেকেই বলে আসা হচ্ছিল যে তিনি কুমারীর গর্ভে জন্ম নেবেন; যখন বলা হল যে, তিনি হবেন নারীর বংশধর; তখন তার মানে দাঁড়ায়, তিনি কোন পুরুষের মাধ্যমে আসবেন না। কুমারীর গর্ভে খ্রীষ্টের জন্মের কারণ এই নয় যে তার জন্ম হতে হবে অলৌকিক, অসাধারণভাবে; বরং এই জন্য যে তিনি হবেন নিষ্পাপ, খাঁটি ও পাপের কোন লজ্জা তাঁর মাঝে থাকবে না।

যোষেফ স্বর্গীয় নির্দেশের বাধ্য হলেন (মথি ১:২৪ পদ)। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বপ্নে দেখা প্রতিটি কথা নিয়ে ভাবলেন। তারপর ঈশ্বরের স্বর্গদূত তাঁকে যা করতে বলেছিলেন তাই করলেন। যদিও এর সাথে তাঁর আগের আবেগ এবং ঠিক করে রাখা করণীয়ের দ্বন্দ্ব ছিল তবুও তিনি সবকিছু একপাশে হটিয়ে দিয়ে মরিয়মকে বিয়ে করলেন। তিনি তা করতে দেরি করলেন না কারণ তিনি যে স্বর্গীয় দর্শন পেয়েছিলেন, তার প্রতি বিশ্বাসে বাধ্য হয়েছিলেন।

স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা পেল (মথি ১:২৫ পদ)। সময় পূর্ণ হলে মরিয়ম তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম দিলেন। যোষেফ ঈশ্বরের নির্দেশ মতোই ছেলের নাম 'যীশু' রাখলেন। ঈশ্বর এই শিশুকে আমাদের পরিত্রাণ দাতা হিসেবে মনোনয়ন ও নিয়োগ দিয়েছিলেন; যে কারণে তাঁর নাম 'যীশু' রাখা হল। আমরা অবশ্যই তাঁকে আমাদের পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করব এবং পরিত্রাতা হিসেবে তাঁর নিয়োগ লাভের বিষয়টি চিন্তা করে আমরা তাঁকে যীশু, আমাদের পরিত্রাতা বলে ডাকব। তিনি আমাদের সকলের হৃদয়ের গভীরে জন্ম নিন এই কামনা করি। আমেন।

মানুষের সত্যিকারের বন্ধু

আজকাল মিডিয়াতে প্রায়ই বন্ধুত্বের শ্লোগান শোনা যায়, বিশেষ করে মোবাইল ফোনের এডগুলোতে। সত্যি মানুষের জীবনে বন্ধু দরকার। বন্ধু ছাড়া জীবন যেন একাকীত্বের ঘন জঙ্গলে বসবাস। এক জীবনের কাল একেবারে কম সময় নয়। জীবন কালের এই সময়টুকুতে জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়। এই সময়টুকুতে আসল-নকল, বন্ধু-শত্রু, সময়ের বন্ধু, অসময়ের বন্ধু ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের সাম্যক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বুঝতে পারি কে আমাদের সত্যিকারের বন্ধু আর কে আমাদের মৌসুমি বন্ধু। পবিত্র বাইবেলে বন্ধুত্বের এই সব নিদর্শনের দারুন দারুন ঘটনা-প্রবাহের চিত্র আমাদের নজর কেড়ে নেয়– আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

বন্ধুত্বের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা অব্রাহামের জীবনে দেখতে পাই। ঈশ্বরের আহ্বানে তিনি তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে তৎকালীন প্যালেষ্টাইনে এসে বাস করছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর সন্তানতুল্য ভাইপো লোটও তাঁর সহযাত্রী হয়েছেন। এক সময় স্থানের সংকুলান না হওয়ার কারণে অব্রাহাম ও লোট একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে বাস করতে শুরু করেন। এমনই এক অবস্থায় লোট যখন সদোম নগরে বাস করছিলেন তখন পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজারা সদোম আক্রমণ করে, সেই সঙ্গে লোটের সমস্ত সম্পত্তি সহ তাকে ও তার পরিবারের লোকজনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর যখন অব্রাহামের কাছে এসে পৌঁছায় তখন তিনি ও তাঁর প্রশিক্ষণ পাওয়া যোদ্ধারা এবং তিনি যাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের

বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন তাঁর ডাকে তারাও তাঁর সঙ্গে লোটকে উদ্ধারের কাজে যোগ দেন। আমরা দেখতে পাই যে, বন্ধুদের সাহায্যে তিনি লোট, তাঁর পরিজন ও ধন-সম্পত্তি সহ সমস্ত কিছু উদ্ধার করে আনেন। তারা যে শুধু লোটকে উদ্ধার করেছেন ত-ই নয়, সেই সমস্ত রাজাদের ধন-সম্পত্তিও লুট করে নিয়ে এসেছিলেন।

এখানে আমরা দেখতে পাই সত্যিকারের বন্ধুত্বের পরিচয়। এই কাজে রিস্ক আছে জেনেও সেই বন্ধুরা তার সহযাত্রী হয়েছিল। এটাই আসল বন্ধুত্বের পরিচয়। প্রয়োজনের সময়ে বন্ধুরা এগিয়ে আসে। হাতে হাত রাখে।

বন্ধুত্বের আরেকটি চমৎকার ঘটনা দেখতে পাই দায়ূদ ও যোনাথনের বিবরণের মধ্যে। এঘটনা হয়তো আমরা অনেকেই জানি কারণ এটা নিয়ে আমরা প্রায়ই প্রচার করে থাকি। যেমনি যোনাথন সারা জীবন এই বন্ধুত্বের মূল্য বজায় রেখেছেন তেমনি দায়ূদও এই বন্ধুত্বের মূল্য বজায় রেখেছেন। দায়ূদ যখন শৌলের তাড়া খেয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন সেই গভীর জঙ্গলে এসে যোনাথন দায়ূদের হাত শক্তিশালী করেছিলেন, তাঁর মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে যোনাথনের মৃত্যুতে দায়ূদ ভীষণভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। দায়ূদ রাজা হবার পরে যোনাথনের কথা মনে করেই শৌলের পরিবারের কে কোথায় আছে তা জানতে চেয়েছেন। যোনাথনের ছেলে মফিবোসৎকে তিনি নিজের পরিবারের একজন করে নিয়েছিলেন এবং তার রাজপরিবারের টেবিলে বসে খেতে ও রাজ বাড়ীতে থাকবার ও রাজকীয় সুবিধা ভোগ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এটাই বন্ধুত্বের

মূল্য। এছাড়াও দায়ূদের আরও কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। এরা ইস্রায়েলীয় ছিল না কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশের বাসিন্দা ছিল। এদের মধ্যে গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় রোগলীম ছিলেন অন্যতম।

দায়ূদের যখন সত্যিকারের বিপদ– তাঁর ছেলে তার রাজ্য দখল করে নিয়েছে। তিনি মরু-এলাকায় আশ্রয় নিয়েছেন– সঙ্গে তাঁর আরও অনেক লোক। এই মুহূর্তে তাদের বড় সংকট খাবারের যোগান। এই বর্সিল্লয় তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অনেক রকমের খাবার তিনি এই পুরো দলের জন্য যোগান দিয়েছিলেন। দায়ূদ যখন আবার তাঁর রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন তখন তিনি তার কথা ভুলে যান নি। তিনি বন্ধুত্বের মূল্য দিয়েছিলেন। দায়ূদ তাকে রাজধানীতে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন তার সঙ্গে বাস করার জন্য।

আমরা দানিয়েলের তিন বন্ধুর কথা জানি। ক্ষমতার কারণে আমরা তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ভাঙ্গনের কোন কারণ দেখতে পাই না। যদিও বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞতায় ও রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় অন্যদের চেয়ে দানিয়েল অনেক উপরে ছিলেন তবুও দানিয়েল সারা জীবন এই বন্ধুত্ব রক্ষা করেছেন ও তাদের বিপদে তিনি এগিয়ে এসেছেন ও তাদের উন্নতির চেষ্টা করেছেন।

নতুন নিয়মে যীশুকে বলা হয়েছে, “ঐ দেখ, এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী, কর-আদায়কারীদের ও পাপীদের বন্ধু।” যীশু ছিলেন পতিত মানুষের প্রকৃত বন্ধু– নিজের জীবন দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করে গেছেন। যীশুর নিজেরও একজন বন্ধু ছিল যাকে আমরা লাসার বলে চিনি– যে লাসারের বাড়িতে যীশু বিশ্রামের জন্য যেতেন। লাসার তাঁর

যত্ন নিতেন। এই লাসারকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বন্ধুর অনেক উদাহরণ পবিত্র বাইবেলে আছে। যেমন ভাল বন্ধুর উদাহরণ আছে তেমনি মন্দ বন্ধুর উদাহরণও আছে। এমন অনেক বন্ধু আছে যারা বন্ধুর জীবনের ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু বন্ধু যে প্রয়োজনের সময়ে হিতকর হয়, মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে সেই প্রকৃত বন্ধু। আজকে পবিত্র বাইবেল থেকে এমন কয়েকজন বন্ধুর কথা বলতে চাই যারা কোন রাজ-রাজা বা কোন নামীদামী কোন লোককের বন্ধু নয় কিন্তু এমন একজন লোকের বন্ধু যে অনেক বছর যাবৎ অবশ-রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। যদিও ঘটনায় তার সামাজিক স্টেটাস দেওয়া হয় নি তবুও এ কথা বুঝা যায় যে সে অতি দরিদ্রই ছিল। কিন্তু তার কয়েকজন ভাল বন্ধু ছিল। যদিও সেই ঘটনায় বন্ধু শব্দটির উল্লেখ নেই তবুও ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায় তারা তার সত্যিকারের বন্ধু ছিল– যারা তার মঙ্গল চেষ্টায় কম কিছু করেন নি। মার্ক ২:১-১১ পদ পাঠ করলে এই নির্ভেজাল বন্ধুত্ব সম্বন্ধে জানা যাবে। সেখানে লেখা আছে: "কয়েক দিন পরে তিনি আবার কফরনাহূমে চলে আসলে শোনা গেল যে, তিনি বাড়িতে আছেন। আর এত লোক তাঁর কাছে একত্রিত হল যে, দরজার কাছেও আর স্থান রইলো না। আর তিনি তাদের কাছে বাক্য প্রচার করতে লাগলেন। তখন লোকেরা চার জন লোক দিয়ে এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বহন করিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে আসল। কিন্তু ভিড়ের কারণে তাঁর কাছে আসতে না পারাতে তিনি যেখানে ছিলেন সেই স্থানের ছাদ খুলে ফেললো আর ছিদ্র করে যে খাটে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শুয়েছিল সেটি নামিয়ে দিল। তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন,

বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল। কিন্তু সেখানে কয়েক জন ধর্ম-শিক্ষক বসেছিল; তারা মনে মনে এরকম তর্ক করতে লাগল, এই ব্যক্তি এমন কথা কেন বলছে? এ যে নিন্দা করছে; একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? তারা মনে মনে এরকম তর্ক করছে, যীশু তৎক্ষণাৎ আপন আত্মায় তা বুঝতে পেরে তাদেরকে বললেন, তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন করছো? পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোন্‌টা বলা সহজ– 'তোমার পাপ ক্ষমা হলো', না 'উঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে চলে যাও'? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, তা যেন তোমরা জানতে পার, এজন্য– তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন– তোমাকে বলছি, উঠ, তোমার খাট তুলে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাও। তাতে সে উঠলো ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলে নিয়ে সকলের সাক্ষাতে বাইরে চলে গেল; এতে সকলে ভীষণ আশ্চর্য হল আর এই কথা বলে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে লাগল যে, এমন কখনও দেখি নি।' ”

এই ঘটনায় আমরা অবশ-রোগী ছাড়াও আমরা আরও চারজন লোক দেখতে পাই যারা খাটিয়া বহন করে নিয়ে এসেছিল। আমরা জানি না তারা কত দূরে থেকে এসেছিল। কিন্তু একটি বিষয় আমরা বুঝতে পারি যে, যে লোকটির অন্যের সাহায্য দরকার ছিল। অন্যের সাহায্য ছাড়া সে কিছুই করতে পারত না। হয়তো লোকটি যীশুর কথা শুনেছিল– তাঁর আশ্চর্য কাজের কথা শুনেছিল, হয়তো তারই পার্শ্ববর্তী কোন লোক ইতিমধ্যেই তার কাছে এসে সুস্থ হয়ে গেছে। হয়তো এরকম কোন কথা তার এই চার বন্ধুর কোন এক বন্ধু যীশুর কথা শুনেছিল। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যেকোন মূল্যে এই আশ্চর্য

ডাক্তারের কাছে তার বন্ধুকে নিতেই হবে। তাকে সুস্থ্য দেখতে চাইলে তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।
তারা চার বন্ধু মিলে রওয়ানা দিল কফরনাহুমের উদ্দেশ্যে। আমরা জানি না কয় দিন বা কতঘন্টা লেগেছিল যীশু যে বাড়ীতে আছেন সেখানে পৌঁছাতে। কিন্তু তারা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছাল তখন দেখা গেল ঘর ভর্তি মানুষ। তারা যীশুর কথা শুনছে। আর সেখানে এত মানুষ যে, ঘর ছেড়ে বাইরে পর্যন্ত বিস্তর লোক বসে যীশুর কথা শুনছে। এই ভীড় ঠেলে যীশু অব্দি যাওয়া তাদের কাছে অসম্ভব মনে হল।

তারা যীশুর কাছে সেই রোগীকে পৌঁছে দেবার একটি বুদ্ধি বের করল। আমাদের কাছে সেই বুদ্ধিটা বেশ অদ্ভূত মনে হয়। আমাদের পেক্ষাপটে হয়তো তা সম্ভবও না। তারা সেই ঘরের ছাদে বা চালে উঠল। উদ্দেশ্য ছাদ বা চাল ফাঁকা করে সেখান দিয়ে তারা ঠিক যীশুর কাছে সেই রোগীকে নামিয়ে দেবে। তৎকালীন সমাজে যারা মধ্যবিত্ত তাদের ঘর সাধারণত টালি দিয়ে চাল বা ছাদ দেওয়া হত। বর্ণনা দেখে মনে হয় ঘরটি বেশ বড়ই ছিল। কিন্তু যদি আমি বা আপনি সেই বাড়ির মালিক হতাম তবে কি আমাদের ঘরের এত বড় একটা ক্ষতি হতে দিতাম? নিশ্চয়ই না। কারণ ঘর আমাদের আশ্রয়ের স্থান আর সেই স্থান আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না। তাও আবার অন্যের কারণে। কিন্তু এখানে আমরা ঘরের মালিকের কোন কিছু দেখতে পাই না। তার থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না জানি না। আমরা জানি না হয়তো সেই ঘরের ভিড়ের মধ্যেই সে বসেছিল। ঘর থেকে বের হয়ে আসবার কোন সুযোগই হয়তো তার হাতে ছিল না। আর ইতিমধ্যেই

এই অবশরোগীর চার বন্ধু তাদের পরিকল্পনা মাফিক ঘরের চাল সরাতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগছে যে, একটা ঘরের ছাদ খুলে ফেলছে আর তারই নীচে বসে লোকেরা যীশুর কথা শুনছে। এটা কি সম্ভব? আমার মাথার উপরে যদি এমন কিছু ঘটে তবে আমরা কি সেখানে বসে থাকতে পারব? আমরা কি চেঁচিয়ে উঠব না? আমাদের মাথার উপর কিছু না কিছু উপর থেকে পরে মাথা ফেটে যেতে পারে এই ভয়ে সেখান থেকে সরে যাব না? নাকি অন্য কোন কিছু এখানে কাজ করেছিল?

আমার কাছে মনে হয়, ছাদ খোলাখুলির কাজ যখন চলছিল তখন যীশু শ্রোতার মনে এমন এক গভীর মনমুগ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যে, কেউ হয়তো টেরই পান নি যে, তাদের মাথার উপরকার ছাদ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। সেই দিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই ছিল না। মালিকও হয়তো টের পান নি যে, তার ঘরের ছাদ এতটাই খুলে ফেলা হয়েছে যেখান দিয়ে একটি খাট নামিয়ে দেওয়া যায়। তারা যীশুর কথা শুনতে শুনতে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, জগৎ-সংসারে আর কি হচ্ছে সেই দিকে তাদের কোন ভাবনার সৃষ্টি হয় নি। সত্যিকার অর্থেই যীশু এমন মুগ্ধ শ্রোতাই চান। আর এরকম মুগ্ধ শ্রোতা থাকলে পরে সেখানে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। সেখানে আশ্চর্য কাজ হয় যা দেখে ভক্তশ্রোতারা ঈশ্বরের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেন।

সেই চার বন্ধু চালের সেই ফাঁকা অংশ দিয়ে অবশ-রোগীটিকে নামিয়ে দিলেন ঠিক যেখানে যীশু আছেন তাঁর সামনে। যীশু নিজেও অবাক হয়েছেন– হতবাক হয়েছেন। তিনি অবাক হয়েছেন তাদের বিশ্বাস

দেখে। তিনি অবাক হয়েছেন প্রয়োজনের সময়ে তার বন্ধুদের হাত বাড়িয়ে দেওয়া দেখে। তিনি তাদের বিশ্বাসকে অবিশ্বাসে বদলে যেতে দেন নি। শাস্ত্র বলে, "তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন, বৎস তোমার পাপ সকল ক্ষমা হল।"

আমরা জানি না যীশু সেই মুহূর্তে কি বিষয় নিয়ে লোকদের কাছে কথা বলছিলেন– কি বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আমরা জানি না কেনই বা লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে বসে তাঁর শিক্ষা শুনছিলেন। স্পষ্টতই দেখা যায় যে, সেই সময়টাতে তিনি কোন আশ্চর্য কাজ করছিলেন না কিন্তু লোকদের কাছে কথা বলছিলেন আর লোকেরাও তাঁর কথা শুনছিলেন। কিন্তু লোকদের কাছে একটা সুযোগ এলো একটি আশ্চর্য কাজ দেখার। যীশু এই সুযোগটিকে হাতছাড়া করেন নি। কারণ তিনি যে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এই আশ্চর্য কাজ সেই শিক্ষাকে আরো প্রামানিক করে তুলবে– আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন যে, লোকেরা এই লোকটিকে তার পাপের ক্ষমা পাবার জন্য এখানে আনেন নি। পুরো দৃশ্যপট দেখলেই বুঝা যায় যে, তারা এসেছেন লোকটির সুস্থতার জন্য। লোকদের আ-শাও সৃষ্টি হয়েছে যে, যীশু এমন কিছু করবেন যাতে লোকটি সুস্থ হয়ে যায়। চালের উপর থেকেও তার বন্ধুরা অধীর আগ্রহে নীচের দিকে চেয়ে আছে কখন সে সুস্থ হবে। কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা হল।"

একটু চিন্তার বিষয় হল কেন যীশু তাকে সরাসরি সুস্থ না করে এমন

একটি কথা বললেন যে, শ্রোতারা যারা এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন তাদের মধ্যে কারো কারো মনে রিএকশন শুরু হল। তারা এটাকে সহজভাবে নিতে পারেন নি। তারা ভাবছে এ কে যে পাপ ক্ষমা করে?

আমরা মানুষ হিসাবে সব সময় আমাদের চোখে যে সমস্যা দেখা যায় আমরা সেটাকেই বড় করে দেখি। আমরা এর root causes দেখতে চাই না। আমরা বাইরেরটা দেখেই বিচার করি। কিন্তু যীশু এখানে দেখাতে চেয়েছেন এর ভিতরের বিষয়টি– মূল সমস্যাটি– যেটির সমাধান আগে হওয়া উচিত। মূল সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেলে যে সমস্যাটি চোখে দেখা যায় সেটি চলে যাবে। হয়তো সেজন্যই তিনি আগে এর পাপের সমস্যাটির সমাধান করতে চেয়েছেন। আর একটি বিষয়ও তিনি লোকদের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা তাঁর আছে। লোকদের এটা জানা দরকার যে, তিনিই মনুষ্যপুত্র যার আগমনের কথা লেখা আছে। তিনিই খ্রীষ্ট যার মধ্যে সমস্ত ঈশ্বরত্ব বাস করে। তিনি লোকদের পাপ ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।

পাপের সমস্যাটি দেখার পর তিনি মানুষের এক্সপেক্টেশনের ব্যাপারে কাজ করেছেন। তিনি একটি প্রশ্ন করেছেন, "কোন্‌টা সহজ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'উঠ, তোমার শয্যা তুলে বেড়াও' বলা? এরপর তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন, "তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার খাট তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।"

এর পর আমরা দেখতে পাই যে লোকটিকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারা যায় নি ভীড়ের কারণে সেই অসুস্থ লোকটি নিজের খাট বয়ে নিয়ে লোকদের ভীড় ঠেলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বের হয়ে যেতে।

তিনি ঘর থেকে বের হয়েই নিশ্চয়ই তার বন্ধুদের ডেকেছেন– নেমে আসতে বলেছেন– আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলেছেন, "দেখ আমি সুস্থ হয়ে গেছি। যীশু আমাকে ভাল করে দিয়েছেন। তোদের পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে। আমাদের আশা, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন। ধন্য তাঁর নাম।"

বন্ধুত্বের কথা প্রথমে শুরু করেছিলাম। এই অবশ-রোগীকে যীশু সুস্থ করেছিলেন। কিন্তু এই বন্ধুরা যদি এই অসুস্থ লোকটিকে যীশুর কাছে না নিয়ে আসত তবে হয়তো এই ঘটনারই জন্ম হত না। এই ঘটনার মধ্যে যে শিক্ষার নতুন নতুন আলো আছে যা আমাদের চিন্তা, মন ও মমনকে আলোকিত করে তার জন্ম হত না। এসবই বন্ধুত্বের জন্য হয়েছিল। ঈশ্বর বন্ধুত্বকে মূল্য দেন। তিনি চান যেন আমাদের জীবনে ভাল বন্ধু থাকে– যেন আমরা ভাল ও উপকারী বন্ধু হই।

যীশু তখনও কেঁদেছিলেন যীশু আজও কাঁদেন

“যিনি মৃত্যু থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সমর্থ, তাঁরই কাছে যীশু এই পৃথিবীতে থাকবার সময়ে তীব্র আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে প্রার্থনা ও বিনতি করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তির কারণে তিনি তাঁর প্রার্থনার উত্তর পেয়েছিলেন।” (ইব্রীয় ৫:৭)

আমাদের উপাসনার গান বইতে একটি জনপ্রিয় গান আছে যা আমরা মণ্ডলীতে প্রায়ই গেয়ে থাকি ‘আয় পাপী আয় সবে, যীশু কাঁদেন তোর তরে।’ হয়তো আমরা বুঝি, হয়তো বুঝতে পারি না কেন যীশু আমার জন্য কাঁদবেন। এই কথা মাথায় রেখেই আজকে যীশুর জীবনের কিছু মুহূর্তের ছবি নিয়ে চিন্তা করতে চাই। যীশুর জীবনের ৩৩ বছরের কথা আমাদের সুসমাচার লেখকগণ ছবির মত করে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যীশুর জন্মের, তাঁর বেড়ে উঠার, তারপর একটা লম্বা বিরতি, এরপর ১২ বছরের সময়ে যিরূশালেমের মন্দিরে গমন, এরপর আবার একটা লম্বা বিরতি, তারপর তিনি প্রায় ৩০ বছরের পরিপূর্ণ পুরুষ– আমরা যাকে এই যুগে বিয়ের বয়স বলে থাকি। এরপর

আমরা তাঁর এক বিলাশ কর্মযজ্ঞের সময় দেখি প্রায় সারে তিন বছরের আর এই সময়গুলের পরে আমরা তাঁর সশরীরে এই পৃথিবীর কাজ সমাপ্ত হতে দেখি। সুসমাচার লেখকগণের লেখার আলোকে তাঁর জীবনের বিশেষ অনেক মুহূর্ত আমাদের নজর কাড়ে।

আমরা যীশুর জীবনে অনেক রকম অভিব্যক্তি দেখতে পাই। তাঁকে প্রবল বেগে কাজ করতে দেখতে পাই, প্রচণ্ড প্রতাপে প্রচার করতে ও শিক্ষা দিতে দেখতে পাই, মানুষকে নানাভাবে উপকার করতে পাই, আমরা তাঁকে রাগতে দেখি, হেঁটে যেতে দেখি, চিৎকার করতে দেখি, আমরা তাঁকে রাগান্বিত হতে দেখি, আমরা তাকে কাঁদতে দেখি, ইত্যাদি। কিন্তু আপনারা কি কখনও যীশুকে হাসতে দেখেছেন? যীশু কি কোন কারণে হেসেছেন আর এই রকম দৃশ্য কি আমরা পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই। সমস্ত নতুন নিয়মে মাত্র একবার আমরা দেখতে পাই যীশু 'উল্লাসিত' হলেন। হতে পারে এই উল্লসিত হওয়ার মধ্যে হাসি ছিল কারণ মানুষ আনন্দিত হলে তার মুখে হাসি ফুটে উঠে। লেখা আছে: "সেই সময়ে তিনি পবিত্র আত্মায় উল্লসিত হলেন ও বললেন, হে আমার পিতা, স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের থেকে এসব বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদের কাছে এসব প্রকাশ করেছ। হ্যাঁ, পিতা, কেননা তা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হল (লূক ১০:২১)।

তিনি উল্লসিত হয়েছিলেন কারণ তাঁর পিতার দৃষ্টিতে তা প্রীতিজনক হয়েছিল– এর মানে তার পিতাও উল্লাসিত হয়েছিলেন।

বাইবেল মাত্র একবার একটি মুহূর্তের কথা জানি যখন যীশু উল্লসিত, আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যীশুকে অকেনবার কাঁদতে দেখি। পবিত্র বাইবেলের রেকর্ড অনুসারে এর অনুপাত ১:৩। নতুন নিয়মে অন্ততপক্ষে তিনবার যীশুর কান্নার কথা পাই। তিনি একবার আনন্দিত হয়েছেন কিন্তু তিনবার কেঁদেছেন। আজ আপনাদের সঙ্গে যীশুর কান্না নিয়েই আলোচনা করতে চাই। কারণ কান্নার ভাগটাই যীশুর জীবনে বেশী আর হয়তো অন্য কোন দিন তাঁর উল্লসিত হওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

আজকের পবিত্র শাস্ত্র আমাদের বলে যে, তিনি যখন এই জগতে ছিলেন– মাংশময় শরীরে প্রবাস করছিলেন– তখন প্রবল আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে প্রার্থনা করেছিলেন। শত শত বছর আগে যিশাইয় ভাববাদী তাঁর জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন: “তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হলেন” (যিশা ৫৩:৩)। এই বর্ণনা এটাই দেখায় যে, এই জগতে তাঁর সেবাকাজের সময়ে যীশু বহুবার অশ্রুপাত করেছিলেন– অনেকবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এজন্য এক কবি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন:

> “ব্যথার পাত্র’ তাঁর নাম,
> যিনি এসেছিলেন সেই ঈশ্বর পুত্র,
> পতিত পাপীদের পরিত্রাণ করতে,
> হাল্লেলুইয়া কী এক পরিত্রাতা,
> হাল্লেলুইয়া কী এক পরিত্রাতা!”

সেই যীশু, যিনি হলেন ব্যাথার পাত্র, নিশ্চিতভাবেই তিনি অনেকবার কান্না করেছিলেন। বাইবেল সেই প্রকার তিনটি মুহূর্তের কথা

জোড়ালোভাবেই আমাদের কাছে প্রকাশ করে; এই তিনটি মুহূর্ত আমাদের কাছে তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের অনুকম্পাকে তুলে ধরে।

প্রথমতঃ যীশু লাসারের কবরের কাছে গিয়ে কাঁদলেন

যোহন ১১:৩৫ পদে লেখা আছে, "যীশু কাঁদলেন।" এটি পবিত্র বাইবেলের সবচেয়ে ছোট্ট পদ। জন্মের পর প্রত্যেক শিশুই কান্না করে। হয়তো যীশু সেই সময়েও কেঁদেছিলেন। কিন্তু সুসমাচারের লেখক সেই বিষয় রেকর্ড করেন নি। কিন্তু তাঁর আত্মপ্রকাশের পর, যখন তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এমন একটি সময়ে যীশু যখন বৈথেনিয়াতে আসেন। তাঁর বন্ধু লাসার ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা তাকে চারদিন আগেই কবর দিয়েছেন। যীশু আসছেন শুনে সেই মৃত বন্ধুর বোন মরিয়ম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। যীশু দেখলেন সেই মেয়েটি কাঁদছে! তার সাথে সাথে যেসব যিহূদীরা এসেছেন তারাও কাঁদছিলেন! তখন তিনিও আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও উদ্বিগ্ন হলেন আর জানতে চাইলেন লাসারকে কোথায় রাখা হয়েছে? তারা তাঁকে বললেন, প্রভু, এসে দেখুন। তখন যীশু কাঁদলেন। এরপরে যিহূদীরা বললেন, "দেখ, ইনি তাকে কেমনভাবে ভালবাসতেন" (যোহন ১১:৩৩-৩৬)।

লাসারকে যে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করবেন তা যীশু জানতেন, তথাপি তিনি মরিয়ম ও অন্যদের সঙ্গে কাঁদলেন। আজকে আমাদের প্রশ্ন, "কেন তবে যীশু কাঁদলেন? তিনি তো জানতেন যে কিছু ক্ষণের মধ্যেই তিনি লাসারকে কবর থেকে ডেকে তুলবেন। কিন্তু তবুও তিনি মরিয়মের, মার্থার ও অন্যান্যদের কান্নার সময়ে নিজেও কাঁদলেন।

যীশু তখনও কেঁদেছিলেন যীশু আজও কাঁদেন

কখনও কি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন? কেন যীশু কাঁদলেন? তবে তিনি কি আজও কাঁদেন? কি কি কারণে তিনি আজও কাঁদেন?

- এই জগতে যত উগ্রচিত্ত, জঙ্গিবাদী লোক রয়েছেন তাদের জন্য তিনি কাঁদেন, কারণ তিনি জানেন যারা তলোয়ার ধরে, শেষ পর্যন্ত তলোয়ারের আঘাতেই তাদের প্রাণ বিনষ্ট হবে।
- যত মায়েরা তাদের মৃত শিশুদের জন্য কাঁদেন, তাদের সঙ্গে তিনিও কাঁদেন, কারণ তিনি জানেন শিশুদের মত না হতে পারলে কেউই স্বর্গস্থ পিতার কাছে যেতে পারবে না।
- প্রতিটি স্বামী যারা তাদের স্ত্রীর মৃত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদেন, তাঁদের সঙ্গে তিনিও কাঁদেন, কারণ ভালবাসার এক অনুপম জোড় ভেঙ্গে গেল।
- তিনি সেই সমস্ত পিতা ও মাতাদের জন্য কাঁদেন যারা রাতের পর রাত তাদের হারিয়ে যাওয়া বালক বা ছটফটে বালিকার জন্য কাঁদেন কিন্তু সেই কান্না আমার ও আপনার জন্যও এবং সেই সঙ্গে এই জগতের সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা যাতনা ও সমস্যার মধ্যে রয়েছেন, আমাদের সমস্যার সাথে সাথে তিনিও উদ্বিগ্ন তিনি প্রতিটি যাতনার মধ্যে প্রবেশ করেন।

বাইবেল আমাদের বলে, "যারা আনন্দ করে তাদের সঙ্গে আনন্দ কর, যারা কাঁদে তাদের সঙ্গে কাঁদ" (রোমীয় ১২:১৫)। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের যা করার জন্য পবিত্র বাইবেলে আদেশ করা হয়েছে, তার থেকে যীশু কম কিছু করেন না। কত আশ্চর্যভাবে এটা সত্য যে, যীশু আমাদের সমস্ত প্রকার যাতনায়, কষ্টে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। পাপীদের জন্য নিশ্চিত ভাবেই তিনি অনেকবার কেঁদেছেন।

কেন না সুখবরে অনকে বার বলা হয়েছে যে, যীশু অনুকম্পার সঙ্গে মর্মস্পর্শী হয়ে ছিলেন। তাই আমরা খুব ভালো ভাবেই অনুমান করতে পারি কোন কারণে আমাদের চোখে যখন জল আসে সেই সময় যীশুর চোখেও জল আসে। আর তিনি চান যেন আমরা তাঁকে একটু স্মরণ করি সাহায্যের জন্য। তখন আমাদের সাহায্য করার জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দেন।

আমার বয়স যখন দশ/বারো বৎসর ছিল তখন আমার দাদা মারা যায়। আমি তাকে কত ভালোই না বাসতাম। তিনি মিটফোর্ট হাসপাতালে মারা যান এবং তিনি চেয়েছিলেন যেন তাকে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাই তাকে আর আমাদের গ্রামের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় নি। ঢাকা দেখতে কেমন তখনও আমি জানতাম না, কারণ তখনও ঢাকায় আসা হয় নি। শহর কি জানি না। গাড়িঘোড়া কি জানিনা। কারেন্টের বাতি কি রকম জানি না। দাদা যে বাড়ী থেকে বের হয়ে আসলেন আর বাড়ীতে ফিরে যান নি আর আমারও দেখার সৌভাগ্য হয় নি। আমি শুধু জানি, আমি প্রচুর কেঁদেছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে জিভের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। আজকে আমার প্রশ্ন: যীশু কি সেদিন আমার সঙ্গে কেঁদেছিলেন? এখনও যখন কোন না কোন কারণে আমি কাঁদি তখন যীশু কি আমার সঙ্গে কান্না করেন?

যীশু তাঁর বন্ধু লাসারের কবরের কাছে কেঁদেছিলেন। মরিয়ম ও তাঁর আরও অনেক আত্মীয়-স্বজনের কান্না দেখে তিনি কেঁদেছিলেন। আজকে রাত্রে তিনি আপনার জন্যও কাঁদছেন। আপনার ভয় ও যাতনা যীশু জানেন। আমি আপনাকে বলতে চাই আসুন, যিনি আপনাকে

অনন্তকালীন প্রেমে প্রেম করেছেন, আপনার দুঃখে যিনি দুঃখ পান, আপনার আনন্দে যিনি আনন্দিত হন তাঁর কাছে আসুন।

- একটি বিষয় লক্ষ্য রাখবেন। যীশু কান্না করেছিলেন আর তার পরই তিনি সবচেয়ে মহৎ আশ্চর্য কাজটি করেছিলেন। মৃত্যুর উপর জীবনের যে প্রবল আদিপত্য তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন।
- আপনি যদি যীশুর লোক হয়ে থাকেন তবে আজও যীশু আপনার সঙ্গে কাঁদেন। আর আপনার জীবনে এমন আশ্চর্য কিছু করতে চান যা আগে কখনো হয় নি। আমি আবারও জোর দিয়েই বলছি, যদি আপনি আপনার কান্নায় যীশুকে কাঁদাতে পারেন তবে আপনি জানবেন যে, আপনার কান্না সার্থক হয়েছে। আপনার জীবনে বড় কোন আশ্চর্য কাজ ঘটতে চলেছে যা আগে কখনও হয় নি।
- হ্যাঁ, তিনি আপনাকে এতটাই ভালবাসেন– তিনি এতটা উত্তমভাবে ভালবাসেন। জিহ্বা যা বলতে পারে না, মুখ যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না তার চেয়েও তিনি আপনাকে বেশী ভালবাসেন। আর আপনার জন্য সেরকম কিছু করতে চান যাতে আপনি বিস্মিত হন।

দ্বিতীয়তঃ যীশু যিরূশালেম নগরটি দেখে কাঁদলেন

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে: “পরে যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন নগরটি দেখে তার জন্য কাঁদলেন” (লূক ১৯:৪১)। ডাঃ জেভারনন ম্যাকগী বলেন, সেই সময়ে যেহেতু তিনি যিরূশালেম শহরটি দেখে কান্না করেছিলেন, তাই আমি নিশ্চিত তিনি সেই সমস্ত নগরীর প্রতিও কান্না করেন যার মধ্যে আমি ও আপনি বসবাস করছি।

তিনি যিরূশালেমের ভবিষ্যত দেখতে পেয়েছিলেন। এর আসন্ন ধ্বংস দেখতে পেয়েছিলেন। যে পিতার গৃহের প্রতি তাঁর এত ভালবাসা, সেই গৃহের ধ্বংসের ছবি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল। আর সেজন্য তিনি কান্না করেছিলেন। আর ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের প্রতি এই ভয়ংকর ধ্বংস যজ্ঞ নেমে এসেছিল।

৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সেনাধক্ষ্য টাইটাস যিরূশালেমকে চরমভাবে অসম্মানিত করে বিনা করুণায় এর অধিবাসীদের ব্যাপক ভাবে হত্যা করেছিলেন। যীশু আগাম তা দেখতে পেয়ে কান্না করেছিলেন। কেন না তিনি জানতেন যে, ঈশ্বরের এই অতি সুন্দর মন্দির সহ যিরূশালেম সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। মন্দিরের পাশে একটি মাত্র দেওয়াল ছাড়া কোন কিছুই আর থাকবে না। আজও যিরূশালেমের সেই দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে যিহূদীরা যেভাবে বিলাপ করে ঠিক সেই ভাবে যীশু কান্না করেছিলেন।

আজ আমরা যেসব শহরগুলোতে বাস করছি, সেখানে যা যা ঘটে, তা দেখে কি যীশু খ্রীষ্ট হাসেন? না, আজও তিনি আমাদের দেখে কান্না করছেন? এখানকার অধার্মিকতা দেখে, এখানকার অসাম্যতা দেখে, এখানকার পাপ ও অন্যায় দেখ, এখানকার ভোগবিলাসিতা দেখে, এখানকার মানুষের পাপেপূর্ণ জীবন দেখে যীশু খ্রীষ্ট আজও কান্না করেন। আমরা কি সেই কান্না উপলব্দি করতে পারি? তাঁর চোখের জল কি আমাদের মধ্যে কোন চেতনার সৃষ্টি করে?

- যীশুতে একজন বিশ্বাসী হিসাবে অন্য কোন কিছু যেটা পারে না, যীশুর চোখের জল আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে যেন মানুষের কাছে আমরা যীশুর প্রেম প্রচার করি।
- তাঁর চোখের জল আমাদের উদ্বেলিত করে তোলে যেন আমরা তাঁর জীবন মানুষের কাছে তুলে ধরি।
- যেন মানুষ তাঁর মত হতে শিক্ষা করে, যেন মানুষ পাপ ও মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যীশুর কাছে আসে।
- যীশুর চোখের জল আমাদের উদ্বেলিত করে তোলে যেন আমরা "বের হয়ে রাজপথে রাজপথে ও সরু পথগুলোতে যাই এবং আসার জন্য লোকদেরকে পীড়াপীড়ি করি, যেন তাঁর বাড়ি পরিপূর্ণ হয়" (লূক ১৪:২৩)।

যীশু যিরূশালেম নগর দেখে কেঁদেছিলেন কারণ তিনি তার পরিণতি দেখেছিলেন। তিনি কতবার চেয়েছিলেন যেন এই নগরের লোকেরা তাঁর কাছে আসে, তাঁকে মশীহ হিসাবে গ্রহণ করে কিন্তু তারা তা না করে তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল। আমরা আমাদের ভবিষ্যত দেখতে পাই না, আমরা জানি না আগামীকাল, এমন কি, এক মুহূর্ত পরে আমার জীবনে বা আমাদের জীবনে কি হতে চলেছে। কিন্তু যীশু তা দেখতে পান। তিনি তা দেখতে পান বলে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠেন। কারণ তাঁর সন্তান হিসাবে তিনি চান না যে, আমরা দুঃখে বা কষ্টে পড়ি। তাই তিনি চেয়েছেন যেন আমরা তাঁর বাধ্য হয়ে চলি, শাস্ত্রমত জীবন যাপন করি, অন্যায় লোভের দিকে অগ্রসর না হই। কারণ সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও তাতে রয়েছে চরম অমঙ্গল। আমরা তা দেখতে না পেলেও যীশু তা দেখতে পান আর তাঁর সন্তানের

অধঃপতনের জন্য তিনি কান্না করেন। তিনি চান যেন আমরা শাস্ত্র অনুসারে জীবন যাপন করে ফলবন্ত হই, তাঁর জন্য জীবন-যাপন করি, তাঁর দেহরূপ মন্ডলীকে গড়ে তুলি।

তৃতীয়ত: গেৎশিমানী বাগানে যীশু কাঁদলেন

পবিত্র শাস্ত্রে আমাদের এই কথা বলে, "পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হয়ে আরও একাগ্র ভাবে প্রার্থনা করলেন; আর তাঁর শরীরের ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল।" মর্মভেদী দুঃখ সাধারণ কান্নার চেয়েও কয়েক ধাপ উপরে। হয়তো আমরা কখনও সেই কান্নার গভীরতা মাপতে পারবো না। আমাদের প্রভু সেই ভাবেই কান্না করেছিলেন যখন আমাদের পাপের নিমিত্ত তাঁর জীবনকে বলি হিসাবে উৎসর্গ করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল।

তাঁর এই অশ্রুপাতের যে মুহূর্তটি তা হল তৃতীয় নজীর। আহা! সেই বাগানের অন্ধকারে কিভাবে তিনি অশ্রুপাত করেছিলেন আজকের শাস্ত্রের বাণী সেই যীশুর বিষয়েই বলে, "যীশু এই পৃথিবীতে থাকবার সময়ে তীব্র আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে প্রার্থনা ও বিনতি করেছিলেন" (ইব্রীয় ৫:৭)।

গেৎশিমানী বাগানে যে দিনে তিনি ক্রুশারোপিত হবেন সেই রাতের আগের দিন যীশু একাকী প্রার্থনা করেন। সেই গেৎশিমানীর অন্ধকারে পরিত্রাতা তাঁর নিজের আত্মাকে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে মেলে ধরেন। তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন এক গভীর

অশ্রুপাতের সঙ্গে যা তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। আর তিনি তাঁর উত্তরও পেয়েছিলেন (ইব্রীয় ৫:৭)।

তিনি কিসের আশঙ্কা করেছিলেন? আমি বিশ্বাস করি যীশু আশঙ্কা করেছিলেন যেন ক্রুশে আমাদের পাপের জন্য প্রায়চিত্তস্বরূপ উৎসর্গ হওয়ার আগেই তিনি সেই বাগানে মৃত্যুবরণ করেন! ডাঃ জন রাইস বলেছেন, যীশু প্রার্থনা করেছিলেন যেন সেই রাত্রে তাঁর কাছ থেকে মৃত্যুর পেয়ালা দূর হয়ে যায়, যাতে পরের দিন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি জীবিত থাকেন।

এক খ্যাতনামা ধর্মতত্ত্ববিদ ডাঃ জন অলিভার বুশওয়েল এই একই বিষয় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, সেই বাগানে প্রার্থনা করেছিলেন যেন মৃত্যু থেকে সেই সময় তিনি নিস্তার লাভ করেন, যেটা তাঁর যে উদ্দেশ্য– সেই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি কৃতকার্যতার সাথে ক্রুশের ওপরে সম্পন্ন করতে পারেন। ইব্রীয় ৫:৭ পদে যেভাবে বলা হয়েছিল তার থেকে এই রকম একটা শক্ত ধারণা পাওয়া যায়। ডাঃ ম্যাগকীর সাথে ডাঃ বুশওয়েল এবং ডাঃ রাইস সহমত পোষণ করেন ও বলেন, ঈশ্বর যীশুর প্রার্থনা শুনেছিলেন, তাই তিনি গেৎশিমানীর বাগানে মৃত্যুবরণ করেন নি।

গেৎশিমানী বাগানেই যীশুর ওপরে ঈশ্বর এই জগতের পাপের ভার স্থাপন করেছিলেন। কারণ লেখা আছে, “পরে তিনি তাদের থেকে কমবেশ এক ঢেলার পথ দূরে গেলেন এবং জানু পেতে প্রার্থনা করতে লাগলেন, বললেন, পিতা, যদি তোমার অভিমত হয়, আমার কাছ

থেকে এই পানপাত্র দূর কর; তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক; তখন স্বর্গ থেকে এক জন স্বর্গদূত দেখা দিয়ে তাঁকে সবল করলেন। পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হয়ে আরও একাগ্র ভাবে প্রার্থনা করলেন; আর তাঁর শরীরের ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল” (লূক ২২:৪১-৪৪)।

ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের পাপের ভার যখন তাঁর ওপরে স্থাপন করা হয় তখন যীশু মর্মভেদী দুঃখের মধ্যে ছিলেন। আর সেই মর্মভেদী দুঃখের সময়ে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন একাগ্র চিত্তে আর তখন তাঁর শরীর থেকে রক্তের ফোঁটার ন্যায় ঘাম মাটিতে পড়েছিল (লূক ২২:২৪)। আমার মনে হয় তিনি যখন ক্রুশের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন তখন আমাদের প্রভু প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছিলেন আর মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভের জন্যে তিনি প্রার্থনা করছিলেন যাতে তিনি ক্রুশের নিকটবর্তী হতে পারেন। আর আমাদের সেই ভাবে বলা হয়েছে ‘তাঁর ভক্তির কারণে তিনি তাঁর প্রার্থনার উত্তর পেয়েছিলেন।’

গভীর আর্ত্তনাদ ও অশ্রুজল গেৎসিমানীর সেই অন্ধকারে ঈশ্বর যীশুর প্রার্থনা শুনলেন। তাঁকে শক্তিদান করার জন্য একজন স্বর্গদূতকে ঈশ্বর পাঠালেন যাতে ক্রুশে গিয়ে আমাদের পাপের যে মূল্য তা তিনি মিটিয়ে দিতে পারেন। যোসেফ হার্ট তার একটি গানে বাগানের মধ্যে যীশুর প্রার্থনাকে এই ভাবে উল্লেখ করেছেন,

> “ঈশ্বরের পুত্রের দুঃখ ভোগকে দেখ,
> আকুল, আর্ত্তনাদময়!
> ঘর্মাক্ত রক্তস্রোত!
> ঐশ্বরিক অনুগ্রহের সীমাহীন গভীরতা!

যীশু, তোমার সে কি প্রেম!”

- যীশু কেমনভাবে আপনাকে ভালবাসেন তা দেখুন, আপনার বেদনায় তিনি যে কান্না করেন তা দেখুন।
- নগরের মধ্যে যে পাপী লোকেরা রয়েছে তাদের প্রতি তাঁর অশ্রুপাতের দৃশ্য আপনি দেখুন।
- গেৎশিমানীতে চোখের জলতে তিনি যে অশ্রুপাত করেছিলেন তার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তিনি আমাদের পাপের দণ্ড নিজে তুলে নিয়ে পাপের মূল্য চুকিয়ে দিয়েছেন– এই বিষয়টি কি আপনাকে নাড়িয়ে দেয় না?

যীশুর কান্না যদি আপনাকে নাড়িয়ে দিতে না পারে, তাহলে আর কি আপনাকে উদ্বেলিত করবে? আপনি কি পাপের দ্বারা এতটাই কঠিন হয়ে পড়েছেন যাতে আপনার প্রতি তাঁর প্রেমকে আপনি অনুভব করতে পারছেন না? ডাঃ ওয়াটসের গান এখনও আমাদেরকে উদ্বেলিত করে তোলে। তিনি লিখেছেন:

“যখন আমি আশ্চর্য্য ক্রুশের সেবা করি,
যেখানে গৌরবের রাজকুমার মৃত্যুবরণ করেছেন,
আমার মূল্যবান লাভকে আমি ক্ষতি বলে গণণা করি,
আর আমার গর্বের সমস্ত কিছুকে ঘৃণ্য বলে পরিমাপ করি।
দেখ তাঁর মাথা থেকে, হাত থেকে, পা থেকে, প্রেম ও যাতনা মিলিত প্রবাহ ধারা;
সেই প্রকার প্রেম ও যাতনা কি কখনো মিলিত হয়েছে?
অথবা, একটি মুকুট অনেক কাঁটায় রচিত হয়েছে?
যেখানে জগতের সমস্ত কিছুই আমার প্রকৃতি,

সেই প্রকার এক উপহার অত্যন্তই নগন্য;
প্রেম এতটাই বিস্ময়কর ও ঐশ্বরিক,
যা দাবী করে আমার প্রাণ, জীবন, আমার সমস্ত কিছু।"

আজ আপনাকে বিনতি করছি যীশুকে বিশ্বাস করুন, তাঁর কাছে আসুন, তাঁর কাছে পতিত হোন আপনার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করুন। ডাঃ ওয়াটসের সঙ্গে বলুন, প্রেম অত্যন্ত বিস্ময়কর! অত্যন্ত ঐশ্বরিক যা আমার প্রাণ, আমার জীবন ও আমার সমস্ত কিছুকে দাবী করে।

খ্রীষ্ট কি পাপীদের জন্য ক্রন্দন করেছিলেন? আর তাহলে আমাদের গাল কি শুকনো কেন? তাই মনস্তাপের অনুশোচনার জল বন্যার মতো দুই চোখ থেকে বেরিয়ে আসুক! আজ আপনি কি আপনার পাপ স্বীকার করবেন না? আপনি অশ্রুপাতকারী পরিত্রাতার কাছে আসুন, তিনি আপনাকে পরিত্রাণ করবেন। তিনি আপনার পাপ ক্ষমা করবেন ও অনন্ত জীবন দান করবেন।

উপসংহারে এই কথা বলতে চাই– গেৎশিমানী বাগান থেকে তাঁকে যদি আপনি চোখের জল ও রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় বের হয়ে আসতে দেখতেন তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, তাঁর উপরে আপনি নির্ভর করতেন? তাহলে এখন তাঁর ওপরে নির্ভর করুন। আজও তিনি সেই একই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি সেই বাগানে ছিলেন। তিনি আপনাকে কেমনভাবে ভালবাসেন তা দেখুন। তিনি আপনার কাছে আসেন তাঁর নিজের হাতের ভালবাসা নিয়ে। তাঁর উপরে বিশ্বাস করুন। তাঁর উপরে

নির্ভর করুন। আর সেই মুহূর্তে আপনি জীবন পাবেন। তিনি আপনার পাপের ক্ষমাদান করবেন ও আপনাকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করবেন।

আজকে এই অংশে আমরা যীশুর চোখের জল নিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেছি। আমরা এখানে তিন প্রকার চোখের জল দেখতে পেয়েছি।

- প্রথমত: আমাদের চোখের জল যখন তিনি দেখতে পান তখন তাঁর চোখেও জল আসে।
- দ্বিতিয়ত: তিনি যা চান যখন আমরা তা করি না তখন তাঁর চোখে জল আসে।
- তৃতীয়ত: সমস্ত মানুষের পাপের জন্য তিনি যখন নিজের দেহে সেই আমাদের শাস্তি তুলে নেন তাঁর সেই কষ্টকর মুহূর্তের কথা স্মরণ করে তাঁর চোখে জল আসে।

এর মধ্যে আমরা হয়তো তৃতীয় চোখের জলের বিষয়টি নিয়ে কখনও কাজ করতে পারবো না কারণ এটি পিতা ও পুত্রের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপার, তাঁর আত্মবলিদানের ব্যাপার জড়িত। কিন্তু দ্বিতীয় চোখের জলের কারণ আমরা আমাদের ভাল জীবন-যাপন দ্বারা যীশুর চোখ থেকে জল মুছে দিতে পারি। তিনি আমাদের জীবন থেকে যা চান সেরকম জীবন- যাপন দ্বারা তাঁর চোখের জল থামিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনের জন্য মঙ্গল ক্রয় করতে পারি। আর প্রথম যে চোখের জলের কারণ উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে আমাদের চোখের জলও জড়িত। আমরা চাই সেই রকম চোখের জল যেন যীশুর চোখে সব সময়

থাকে। কারণ সেটা আমাদের পাপের জন্য নয় কিন্তু আমাদের অনুভূতি দিয়ে যীশুর চোখে জল নামিয়ে নিয়ে আসা– আর তাতে আমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত আছে– আমাদের জীবনে বড় আশ্চর্য কাজ ঘটে যেতে পারে। আসুন এই কাজটিই আমরা বেশী বেশী করি। আমরাও কাঁদি আর সেই সঙ্গে যীশুকেও কাঁদাই।

জল যদি হতে পারে আংগুর-রস তবে . . .

(যোহন ২:১-১১ পদ)

এই আশ্চর্য ঘটনাটি সত্যিকার অর্থে যীশু খ্রীষ্টের কৃত সমস্ত আশ্চর্য কাজের ভূমিকা মাত্র। আমাদের প্রভু যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে কথা বলেছেন সেসব দৃষ্টান্তের মধ্যে বীজ বাপকের দৃষ্টান্তটি যেমন সমস্ত দৃষ্টান্তের ভূমিকা এই আশ্চর্য কাজটিও তদ্রুপ। এই আশ্চর্য ঘটনাটির মধ্যে প্রভুর কাজের ভবিষ্যতের অনেক কথা লুকিয়ে আছে যা ভবিষ্যতে ঘটবে। যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ হল তাঁর পবিত্র এবং ধর্মীয় শিক্ষার মুদ্রাঙ্ক। পবিত্র বাইবেলের এই ঘটনাটি থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তিনি যখন কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি কিন্তু শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছেন তখনো অল্প কিছু লোক তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। এদের মধ্যে তাঁর মনোনীত বারো জনের যে সবাই ছিলেন তা নয় কিন্তু খুব সম্ভবত, আন্দ্রিয় ও পিতর, ফিলিপ ও নথনিয়েল এবং হয়তো লেখক নিজেই তাদের মধ্যে ছিলেন। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখতে পাই যে, মোশি প্রান্তরে থাকাকালীন সময় যেসব চিহ্নকার্য করেছিলেন তা প্রয়োজনের খাতিরেই করেছিলেন, প্রয়োজনের সময় তিনি মান্না দিয়েছিলেন এবং এই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়েও যীশু খ্রীষ্ট সেই একই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন- তিনি প্রয়োজনের খাতিরে তাঁর অলৌকিকত্বের ভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

বিবাহের এই ঘটনাটি ঘটেছিল আশের গোষ্ঠীর কান্না নামক গ্রামে (যিহোশূয় ১৯:২৮), দেশের এক প্রান্তে, অখ্যাত এক স্থানে। যাদের বাড়িতে এই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল তারা খুব সম্ভবত খ্রীষ্টের সহগোত্রীয় বা আত্মীয় ছিলেন। প্রভু যীশুর মা মরিয়মও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমরা সেখানে মরিয়মের স্বামী যোষেফকে দেখতে পাই না। খুব সম্ভবত ইতিমধ্যেই তিনি মারা গিয়ে থাকবেন। এটা মনে হচ্ছে কারণ পবিত্র শাস্ত্রে আমরা যোষেফের সঙ্গে শেষ বারের মত পরিচিত যখন তাঁরা ১২ বছরের যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে যিরূশালেমের মন্দিরে গিয়েছিলেন। এর পর আর কোন ঘটনাতেই আমরা যোষেফের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাই না।

বিয়ের এই ঘটনায় আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, এই অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে খ্রীষ্ট বিবাহ অনুষ্ঠানকে সম্মান দেখিয়েছেন। তিনি এই অনুষ্ঠানকে আশীর্বাদযুক্ত করেছেন কেবল তাঁর উপস্থিতি দ্বারা নয়, বরং সেই সাথে তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজের দ্বারা। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন যে, এখনো ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের খোঁজ করছেন। এই বিয়ে তাঁর এবং তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে গুপ্ত ঐক্যস্বরূপ, কারণ তিনি এটি পূর্ব থেকেই তাঁর পিতার রাজ্যের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। যখন বিয়ের অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তা ঐশ্বরিক মর্যাদা লাভ করে; বিয়ে এবং বিয়ের ভোজ হল অনুগ্রহের কার্য। বিয়ে সাধারণত ভোজের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হত (আদিপুস্তক ২৯:২২; বিচার ১৪:১০)। এটি ছিল আনন্দ ও বন্ধুত্বের মর্যাদার নিদর্শন এবং অনুষ্ঠানটি পালিত হত ভালবাসার নিশ্চয়তার জন্য।

এই অনুষ্ঠানে শুধু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর মা যোগদান করেন নি কিন্তু তাঁর সঙ্গে শিষ্যরাও অতিথি হয়েছিলেন। সেই বিয়ের ভোজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যেন আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, তাদের সাথে সামাজিকতা রক্ষা করি– তারা হোক দরিদ্র কিংবা নিচু শ্রেণীর।

এই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের মধ্য দিয়ে যীশু দেখিয়েছেন যে, তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর আত্মিক অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং বিয়ের অনুষ্ঠানকে তিনি স্বীকৃতি প্রদান করেন ও আশীর্বাদ করেন। আর এই বিয়ে তখনই মর্যাদা লাভ করবে, যখন তারা প্রভুতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে (১ করি ৭:৩৯)। আমাদের পরিবারে যখন বিয়ের অনুষ্ঠান হয় তখন আমাদের অবশ্যই প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রীষ্টকে বিবাহ্ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত। আমরা তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন। পবিত্র শাস্ত্র বলে যে, “তারা আমাকে ডাকবে আর আমি তাদের উত্তর দেব।”

তিনি বিয়েকে যেভাবে সম্মান দেখান ঠিক একই ভাবে বিয়েতে যা কিছু প্রয়োজন তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। আমরা দেখি যে, বিবাহ ভোজের আয়োজকদের আঙ্গুর-রসের ঘাটতি পড়েছিল (পদ ৩)। যথেষ্ট যোগান থাকা সত্ত্বেও সব রস ফুরিয়ে গিয়েছিল। এটা দেখায় যে, এই জগতে অনেক সময় আমাদের অনটনের অবস্থায় পরতে হয়; যদিও আমরা মনে করি যে, আমাদের প্রাচুর্যের পূর্ণতা রয়েছে তবুও কোন না কোন সময় বা কোন না কোন কারণে তার কমতি হয়। হয়তো সঠিক

পরিকল্পনার অভাবে সেরকমটা হয়ে থাকবে। কিন্তু আঙ্গুর-রসের অকুলানের বিষয়টি প্রভুর মা মরিয়মের নজরে এসেছিল। তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তিও ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি জানতেন সাহায্য করার একজন সহায় তাঁর আছে। প্রভু যীশুর মা আঙ্গুর-রস ফুরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর আত্মীয়কে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁকে অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন, “ওদের আঙ্গুর-রস নেই।”

অনেকে মনে করেন, মরিয়ম যীশুর কাছ থেকে কোন আশ্চর্য কাজ আশা করেন নি, কারণ তখনও খ্রীষ্ট কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি। হয়তো তিনি চেয়েছিলেন খ্রীষ্ট তাঁর যথাসাধ্য এমন কিছু করেন যাতে করে বরের সম্মান রক্ষা পায় এবং পরিস্থিতি শান্ত থাকে। হয়তো মরিয়ম চেয়েছিলেন খ্রীষ্ট যেন পবিত্র ও আত্মিক দিক থেকে মঙ্গলজনক কোন আলাপচারিতার দ্বারা আঙ্গুর-রসের অভাব পূরণ করেন। তবে ঘটনা থেকে দেখা যায় যে, মরিয়ম আসলেই কোন আশ্চর্য কাজ আশা করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট মোশির মত একজন মহান ভাববাদী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি ইস্রায়েলীয়দের অভাবের সময় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করেছিলেন। যেহেতু মরিয়ম যীশুকে খুবই ভালভাবে জানতেন, জানতেন তিনি কে তাই তাঁর কাছে তাঁর একটি বড় এক্সপেক্টটেশন ছিল। তিনি জানতেন যীশু চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন। হয়তো দীর্ঘ ৩০ বছরে এমন অনেক দৃষ্টান্ত মরিয়ম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই যখন বিয়ে বাড়িতে আরও আঙ্গুর-রসের প্রয়োজন হয়েছিল তখন যীশুর মা জগতের প্রধান উৎসের কাছেই আঙ্গুর-রসের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

মরিয়মের এই অনুভব ও সঠিক উৎসের কাছে অনুরোধ করা থেকে আত্মিক যে সব বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে তা হল আমরা যেন কেবল আমাদের নিজেদের অভাব এবং সমস্যার দিকে না তাকাই, বরং সেই সাথে আমাদের বন্ধুদের অভাব ও তাদের কষ্টকর অবস্থা সম্পর্কে জানি, যেন আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। এছাড়া, আমাদের দায়িত্ব হল আমাদের নিজেদের এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের কষ্টকর অবস্থাগুলো প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রীষ্টের কাছে তুলে ধরা। যখন আমরা খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করবো, তখন নম্রভাবে তাঁর কাছে আমাদের সমস্যাগুলো বলবো, নিজেদেরকে তাঁর কাছে তুলে ধরবো এই বিশ্বাস নিয়ে যে, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।

কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে দেখা যায়, মরিয়ম হয়তো বা একটু অবাকই হয়েছিলেন যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনে। তিনি যে ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর সেই কথার মধ্যে তিরস্কারের সুর ছিল। অবশ্য তিনি খ্রীষ্ট হিসাবেই এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর সন্তান হিসাবে নয়। তিনি ময়িমকে "নারী, এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?" এরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেই তাঁকে একরকম তিরস্কারই করেছিলেন যদিও তিনি জানতেন তিনি কি করবেন। তিনি মরিয়মকে 'নারী' বলে সম্বোধন করেছেন, 'মা' বলে নয়। এর কারণ হতে পারে, যে অনুরোধ তাঁকে করা হয়েছিল তা মা ও ছেলে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয় কিন্তু যোগানদাতা খ্রীষ্ট ও তাঁর লোকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। তবে আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন।

প্রভুর এই তিরস্কারের নিশ্চয়ই একটি উদ্দেশ্য ছিল। এটা তাঁর কথা থেকেই বুঝা যায়, “আমার সময় এখনো হয়নি।” খ্রীষ্ট যা কিছু করেছেন এর প্রতিটি কাজের জন্য তাঁর একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল। প্রতিটি কাজ তিনি নির্ধারিত সময়ে এবং উপযুক্ত সময়ে সম্পন্ন করেছেন। এটি ছিল তাঁর সময়নিষ্ঠার এক চমৎকার উদাহরণ। কিন্তু এরকম কাজ সম্পন্ন করার সময় যদিও তখনও হয় নি তবুও সময়ের আগেই তিনি মায়ের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন, কারণ তিনি ভবিষ্যতের এই চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে তখনকার সমস্যাটি যে মিটে যাবে তা নয় কিন্ত তাঁর এই সব নব্য শিষ্যদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত ভিত্তির উপরে দাঁড় করাবে (১১ পদ)। এছাড়া অসময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে আমাদেরকে এখানে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ যখন অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে পতিত হয়, তখন ঈশ্বর তার দুঃখ লাঘব করার জন্য এবং দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য উপস্থিত হন। যখন আমরা ভীষণভাবে সঙ্কটের মধ্যে পড়ি এবং সমাধানের পথ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হই, তখন তাঁর সময় উপস্থিত হয়।

মরিয়ম যীশুকে যে ভাবে জানতেন, সেই জানা থেকে তাঁর মধ্যে এই প্রত্যাশা জাগরিত হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট তাঁর বন্ধুদের এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা দূর করতে সাহায্য করবেন। খ্রীষ্টের তিরস্কার সত্ত্বেও মরিয়ম তাঁর বিশ্বাস থেকে সেখানকার পরিচর্যাকারীদের আদেশ করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তাদের যা করতে বলেন তারা যেন তা-ই করে। তাঁর কথা থেকেই তা পরিস্কার দেখা যায়, “ইনি তোমাদের যা করতে বলেন তোমরা তাই কর” (৫ পদ)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, কোন সন্দেহ না

করে বাধ্য হয়ে যদি আমরা খ্রীষ্টের নির্দেশ পালন করি, তাহলে আমরা অবশ্যই তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারবো। করুণা লাভ করার উপায় হল দায়িত্ব পালন করা। খ্রীষ্ট তাঁর অনুগ্রহে সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে তাদের আঙ্গুর-রসের ব্যবস্থা করলেন। তিনি যা বলেন তার চেয়েও উত্তম কিছু করেন, কখনোই মন্দ কিছু করেন না।

আশ্চর্য কাজটি ছিল জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করা। জলের প্রকৃতি পালটে গিয়ে তা আঙ্গুর-রসের সমস্ত গুণে এবং মানে পরিবর্তিত হল। এই রূপান্তর হওয়াটাই হচ্ছে এখানে খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ। এর দ্বারা খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সৃষ্টিশীলতার বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করলেন। তিনি মানুষের জন্য ভূমিতে আঙ্গুরলতা জন্মাতে দেন, যেন সেখান থেকে মানুষ আঙ্গুর -রস পেতে পারে (গীত ১০৪:১৪-১৫)। প্রতি বছর ভূমি হতে উৎপাদিত আঙ্গুর থেকে রস বের করা হলেও জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় না। তা সত্ত্বেও ভূমির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এই আশ্চর্য কাজের মত আশ্চর্য কোন কাজ ভূমি করতে পারে না। মোশি প্রথম যে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, তা ছিল জলকে রক্তে পরিণত করা। এটি মোশির আইন এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্যে পার্থক্যের ইঙ্গিত দেয়। জলকে রক্তে পরিণত করা হল শাস্তিজনক ব্যবস্থা, যা সুখ ও স্বাচ্ছন্দকে দুঃখ-কষ্ট এবং ভীতির দিকে নিয়ে যায়। অপরদিকে সুসমাচারের অনুগ্রহ হল জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করা। খ্রীষ্ট এর দ্বারা দেখিয়েছেন যে, এই পৃথিবীতে তাঁর যে কাজের ভার রয়েছে তা হল, সমস্ত বিশ্বাসীদের জীবনে আনন্দ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দকে বৃদ্ধি দান করা এবং উন্নত করা এবং তাদেরকে শান্তিতে রাখা। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলছে, "তৃষিত সমস্ত লোক, তোমরা জলের

কাছে এসো এবং বিনা মূল্যে আঙ্গুর-রস ক্রয় কর” (যিশা ৫৫:১)। আরেকটি সত্যিকারের বিষয় আমি আপনাদের চিন্তা করতে বলি– খ্রীষ্ট যদি সামান্য জলকে আঙ্গুর রসে পরিণত করতে পারেন তবে তিনি আপনার জীবনের পাপে পঙ্কিল অবস্থাকে কেন শুভ্রতায় পরিণত করতে পারবেন না? প্রশ্ন রাখছি আপনাদের কাছে, আশা করছি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন।

এই আশ্চর্য কাজের পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো থেকে একটি ছবি আমাদের মনে মধ্যে ভেসে আসে। এখানে দেখা যায় এই আশ্চর্য কাজটি সাধিত হয়েছিল জলের জালার ভেতরে (পদ ৬): “সেখানে যিহূদীদের শুচি হবার রীতি অনুসারে পাথরের ছয়টা জালা বসানো ছিল।” একটি যিহূদী গৃহে সাধারণ রীতি অনুসারেই জলের জালা ব্যবহার করা হত যেন তারা হাত-পা ধোয়ার জন্য তা ব্যবহার করতে পারে। ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম অনুসারে এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসারে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য তারা এ রকম জালার জল ব্যবহার করতো। যিহূদীরা ধর্ম-শিক্ষকদের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী হাত না ধুয়ে কখনো কোন কিছু আহার করতো না (মার্ক ৭:৩) এবং তারা হাত ধোয়ার জন্য প্রচুর জল ব্যবহার করতো। তাছাড়া বিয়ে বাড়িতে প্রচুর লোক সমাগমের কারণেই হয়তো ঐ স্থানে পাথরের ছয়টি জালা রাখা হয়েছিল যেন সকলের জন্য যথেষ্ট জল থাকে। তাদের মধ্যে এই প্রবাদটি প্রচলিত ছিল, যিনি পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি জল ব্যবহার করবেন, তিনি এই পৃথিবীয় প্রচুর ধন -সম্পদ লাভ করবেন।

খ্রীষ্ট এই জালাগুলোকেই আঙ্গুর রস তৈরির কাজে ব্যবহার করেছিলেন। জল ভর্তি জালাগুলো অলৌকিকভাবে আঙ্গুর-রসের জালায় পরিণত হয়েছিল। খ্রীষ্ট এভাবেই সুসমাচারের মধ্যে অনুগ্রহ আনায়ন করেছিলেন, এটি ছিল আঙ্গুর-রসের মত, যা ঈশ্বর এবং মানুষের আনন্দদানকারী। যিহূদী ধর্ম-শিক্ষকগণ ঈশ্বরের আইনকে পরিবর্তন করে মনগড়া আইন প্রতিষ্ঠিত করেছিল; যেমন জলের ব্যবহার, এই আইন ছিল দুর্বল ও হীন উপাদানে ভরপুর। এর আগে হয়তো এই জালাগুলো কখনো আঙ্গুর-রস রাখার কাজে ব্যবহার করা হয় নি। এই জালাগুলো পুরানো আঙ্গুর-রসের সুগন্ধ ধরে রাখার জন্য উপযুক্তও ছিল না। সেই সময়ের যিহূদীরা প্রত্যেকে দু'টি কিংবা তিনটি পিপায় আঙ্গুর-রস রাখত। সাধারণত আঙ্গুর-রস কেবল বিয়ের ভোজে পান করার জন্যই পরিবেশন করা হত না, কিন্তু পরিবেশনের এই আয়োজন ছিল নব দম্পতির প্রতি শুভকামনা জ্ঞাপনের একটি নিদর্শন।

আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্টের নির্দেশমত পরিচর্যাকারীরা জলের জালাগুলো কানায় কানায় পূর্ণ করল (৭ পদ)। ঈশ্বর যেমন তাঁর দাস মোশিকে জল বের করে আনার জন্য পাথরের কাছে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে খ্রীষ্ট সেই পরিচার্যাকারীদের জলের কাছে যেতে আদেশ করেছিলেন আঙ্গুর-রস আনার জন্য। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে কঠিন কোন কিছুই বাধা হতে পারে না এবং ঈশ্বরের আদেশে কোন কাজ সাধিত হওয়া অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়।

আশ্চর্য কাজটি হঠাৎ করে সাধিত হয়েছিল। কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই লোকদের চোখের সামনে এই আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। অনেকে

হয়তো ভাবতে পারেন যে, খ্রীষ্ট সে সময় বের হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে এই জলকে আঙ্গুর-রসে রূপান্তরিত হতে আদেশ করেছিলেন (২ রাজাবলি ৫:১১)। না, তিনি তাঁর জায়গায় স্থির হয়ে বসে ছিলেন, একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। কিন্তু তিনি যা চেয়েছেন, ঠিক সেই মতই সমস্ত কাজ হয়েছিল। খ্রীষ্ট কোন রকম আদেশ-নিষেধ ছাড়াই এই মহৎ এবং চমৎকার কাজ সম্পন্ন করেছেন। কোন কোন সময় খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজের মধ্যে কথা এবং চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা শুধুমাত্র যে সমস্ত মানুষ তাঁর চারপাশে থাকত তাদের বিশ্বাস আনার জন্য তা করা হত (যোহন ১১:৪২)।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পরিচার্যাকারীদের নির্দেশ দিলেন, “এখন জালা থেকে কিছু তুলে ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।” কারণ সেই আঙ্গুর -রস কেবলমাত্র পাত্রে রাখার জন্য কিংবা দেখার জন্য তৈরি করা হয় নি, বরং তা পান করার জন্য করা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সমস্ত কাজ ছিল ব্যবহারের জন্য। মাটির নিচে লুকিয়ে রাখার জন্য তিনি মানুষকে তালন্ত দেন না। তিনি তালন্ত দেন তা কাজে ব্যবহার করার জন্য। তিনি তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই জলকে আঙ্গুর-রসে রূপান্তর করেছিলেন।

যীশু খ্রীষ্টের কথা মতই ভোজের কর্তার কাছে আঙ্গুর-রস উপস্থিত করা হল। অনেকে মনে করেন যে, ভোজের কর্তা ছিলেন একমাত্র প্রধান অতিথি, যিনি সবচেয়ে উঁচু স্তরের আসনে বসেছিলেন। সম্ভবত উপরের ঘরে আলাদা কোন কামরা ছিল এবং সম্ভবত ভোজের কর্তা সেই আসনে বসেছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ভোজের কর্তা

ছিলেন ভোজের পরিদর্শক এবং পরামর্শদাতা। সাধারণত ভোজের জন্য একজন ভোজ পরিচালকের প্রয়োজন হত, কারণ ভোজে অনেক লোক আমন্ত্রিত হত। যখন তারা ভোজের আয়োজন করতো তখন সব কিছু ঐ ভোজের কর্তা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখানে দেখা যায় যে, খ্রীষ্ট যে আঙ্গুর-রস অলৌকিকভাবে যোগান দিয়েছিলেন, তা ছিল শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ঠ মানের। ভোজের কর্তা তা স্বীকার করেছিলেন এবং যা সত্য তিনি তাই বলেছিলেন; কোন কাল্পনিক কথা বলেন নি, নিশ্চিত হয়েই তিনি তা স্বীকার করেছিলেন (৯,১০ পদ)। ভোজের কর্তা নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন যে, তা ছিল উন্নত মানের আঙ্গুর-রস যদিও তিনি জানতেন না সেই আঙ্গুর-রস কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু পরিচর্যাকারীরা জানতো তা কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু তারা তা পান করে এর স্বাদ গ্রহণ করে নি। যিনি স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন তিনি যদি দেখতে পেতেন কোথা থেকে এটি তোলা হয়েছে, অথবা যারা তা তুলেছিল তারা যদি এর স্বাদ গ্রহণ করতো, তাহলে তারা হয়তো ভীষণ আশ্চর্য হত।

ভোজের কর্তার অভিমত অনুসারে ঐ আঙ্গুর-রস ছিল সবচেয়ে উত্তম। সাধারণ আঙ্গুর-রস থেকে এই আঙ্গুর-রস ছিল ‘ঘন ও রক্তবর্ণ’ এবং ‘চমৎকার সুগন্ধযুক্ত’। ভোজের কর্তা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বরকে জানালেন এবং বললেন যে, কেন তিনি এখন পর্যন্ত এমন অসাধারণ এবং উপভোগ্য আঙ্গুর-রস রেখে দিয়েছেন। কারণ তখনকার দিনে আঙ্গুর-রস পরিবেশনের নিয়ম ছিল ভিন্ন রকমের। উত্তম আঙ্গুর-রস পরিবেশনের উত্তম সুযোগ হল ভোজের শুরুর সময়। তখন অতিথিগণ প্রফুল্ল থাকে ও ক্ষুধার্ত থাকে, সে সময় তারা পরিপূর্ণভাবে এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারে; তাছাড়া প্রয়োজনে পরবর্তীতে তারা আরও পান

করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যখন তারা পান করে পরিতৃপ্ত হয়, তখন তাদের ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়। তাই উত্তম আঙ্গুর-রস প্রথমে পরিবেশন করতে হয়, নিম্নমানের আঙ্গুর-রস পরিবেশন করতে হয় সবার শেষে। ভোজের কর্তা ভেবেছিলেন, বর হয়তো তার বন্ধুদের জন্য উত্তম আঙ্গুর-রস আলাদা করে তুলে রেখেছেন। সেজন্য ভোজের কর্তা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, "তুমি ভালো আঙ্গুর-রস এখন পর্যন্ত রেখেছ?" কিন্তু এই উত্তম আঙ্গুর-রসের জন্য তারা কার কাছে ঋণী তা ভোজের কর্তা ও বিয়ে বাড়ির বর কেউই জানতেন না।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যোগানদাতা হিসাবে খ্রীষ্ট এভাবে বিবাহ ভোজের অতিথিদের প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর-রসের যোগান দিয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই পবিত্র শাস্ত্রে পরিমিত আঙ্গুর-রস পান করার জন্য অনুমোদন রয়েছে, বিশেষ করে আনন্দের সময় (নহি ৮:১০)। তবুও সতর্কতা হিসাবে পবিত্র শাস্ত্র এই কথাও আমাদের বলে, "নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো, পাছে উচ্ছৃঙ্খলতায়, মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের দিল ভারগ্রস্ত হয়" (লূক ২১:৩৪)। এই ঘটনা থেকে আমরা এটি ধরে নিতে পারি যে, সেই বিবাহ ভোজে যারা আপ্যায়িত হয়েছিলেন, তারা খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে উত্তম শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্টের উপস্থিতির মাধ্যমে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি তাদের ভয় জাগানো শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিল, যেন তারা কেউ আঙ্গুর-রসের অপব্যবহার না করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মাংস বা পানীয় যা কিছু আমরা গ্রহণ করি তার সবই আমরা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছ থেকে দয়ার দান হিসেবে পেয়ে থাকি। এগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার জন্য এবং এগুলো ব্যবহার করে আনন্দ লাভ করার জন্য আমরা সদাপ্রভুর

কাছে ঋণী। এই জন্য যারা অকৃতজ্ঞ এবং পাপী, তারা ঈশ্বরের দেওয়া দানের অপব্যবহার করে।

পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এটি যীশু খ্রীষ্টের সাধিত প্রথম আশ্চর্য কাজ। তাঁর জন্মগ্রহণ এবং বাপ্তিস্মের সময় তাঁকে ঘিরে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল এবং সমস্ত আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে স্বয়ং তিনি নিজে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য ঘটনা কারণ তিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, ঈশ্বর মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক মহিমা প্রকাশ করলেন। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। এছাড়া তিনি এই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বভাব এবং তাঁর কাজকে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং পরিত্রাতার অনুগ্রহ সমস্ত আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত খ্রীষ্টের মহিমা। এর ফলে খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁর উপরে আরও গভীরভাবে বিশ্বাস আনলো। যাঁদের তিনি ডেকেছিলেন তাঁরা এ পর্যন্ত তাঁর কোন আশ্চর্য কাজ দেখেন নি, কিন্তু তবুও তাঁর শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। এখন তাঁরা তা দেখলেন, তাতে অংশগ্রহণ করলেন এবং এর দ্বারা তাঁদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। লক্ষ্য করুন, প্রথম বিশ্বাস সত্য হলেও তা থাকে দুর্বল। এখন যে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, সেও এক সময় শিশু ছিল; শক্তিশালী খ্রীষ্টানদেরও তদ্রুপ। খ্রীষ্টের মহিমার প্রকাশ হল আমাদের বিশ্বাসের মহা নিশ্চয়তা।

যীশুর কাছে ছুটে আসলেন

(যোহন ৪:৪৬-৫৪ পদ)

যীশু খ্রীষ্ট আবার গালীলের কান্না নগরে যেখানে তিনি জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন (৪৬ পদ) সেখানে আসলেন। সেখানে এসে তিনি দেখতে চাইলেন তাঁর কৃত আশ্চর্য কাজের ফলে সেখানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা। তিনি সেখানে আসলেন যেন তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করতে পারেন এবং সেই জল সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলতে পারেন যা তিনি আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন। সুসমাচারের লেখক আমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এই আশ্চর্য কাজের কথাটি উল্লেখ করেছেন, যেন আমরা খ্রীষ্টের সাধিত সমস্ত আশ্চর্য কাজগুলো মনে রাখি।

যে রাজ-কর্মচারীর ছেলেকে সুস্থ করার ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে তা অন্য কোন সুসমাচারে উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে মথি ৪:২৩ পদে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, সুস্থতার জন্য অনুরোধকারী ছিলেন একজন রাজ-কর্মচারী আর রোগীটি ছিল তার ছেলে। এই রাজ-কর্মচারীকে ল্যাটিন ভাষায় বলা হয়েছে *Regulus* যার অর্থ জমিদার। হয়তো তার বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল, অথবা তার অনেক প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল, অথবা একটি নির্দিষ্ট এলাকা তার শাসনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল– এসব কারণে হয়তো বা তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন এটি ছিল তার পদমর্যাদা। তিনি ছিলেন একজন রাজ

সভাসদ, যিনি রাজার পক্ষে বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতেন। যেখানে এই রাজকর্মচারী বাস করতেন কান্না গ্রাম থেকে সেই কফরনাহূমের দূরত্ব ছিল পনের মাইল। খ্রীষ্ট তখন কান্না নগরে অবস্থান করছিলেন, তাই তিনি তার ছেলের সুস্থতার জন্য পনের মাইল দূরে খ্রীষ্টের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে বিনম্রভাবে অনুরোধ করলেন যেন তিনি কফরনাহূমে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থ করেন (৪৭ পদ)।

এখানে আমরা পুত্রের প্রতি পিতার আবেগপূর্ণ ভালবাসা দেখতে পাই। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়বার পর থেকে তিনি তার সুস্থতার জন্য এমন কিছু ছিল না যা তিনি করেন নি, কিন্তু এতে কোন ফল হয় নি। তাই তিনি স্বয়ং যীশুর কাছে ছুটে আসলেন, শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে। কারণ কোন ডাক্তার ছেলেটিকে সুস্থ করতে পারে নি। একজন ক্ষমতাবান মানুষ হয়েও তার ছেলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসহায়। তাই তিনি খুব বিনম্রভাবে যীশুর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যত মহান ব্যক্তিই হই না কেন আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে আসি, তখন আমাদের অবশ্যই একজন ভিখারীর মতই আসতে হবে এবং আবেদন করতে হবে নিঃস্ব ব্যক্তির মত। এখানেও আমরা সেই একই চিত্র দেখতে পাই।

রাজ-কর্মচারী হয়তো জল থেকে আঙ্গুর রস তৈরির কাহিনী লোক মুখে শুনে থাকবেন, হয়তো শুনে থাকবেন যীশু ইতিমধ্যেই অনেক অসুস্থ লোককে সুস্থ করেছেন তাঁর আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে। হয়তো এর ফলেই তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছিল যে যীশু তাকে বিপদের সময়ে

সাহায্য করতে পারবেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যদিও তার ছেলের অবস্থা খুব শোচনীয় তবুও যীশুকে যদি তার বাড়িতে নিয়ে আসা যায় তবে তিনি ইচ্ছা করলে তাকে সুস্থ করতে পারবেন।

এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতই কাজ করেছিলেন, যা আমরাও করে থাকি। যখন কোন লোক অসুস্থ হয়, তখন যারা তার চিকিৎসা করবে হয়তো তাদের আমরা ডেকে আনি অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে তার কাছে নিয়ে যাই। একই ভাবে তিনি যীশুকে ডেকে আনতে গিয়েছিলেন যেন তিনি তার ছেলেকে সুস্থ করেন। তিনি এটা বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করতে পারবেন। এই জন্য তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, যেন তিনি তার সাথে যান এবং তার বাড়িতে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থতা দান করেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন খ্রীষ্ট তার ঘরে যাবেন এবং তার ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি তার ছেলের সুস্থতার ব্যাপারে অনিশ্চিত ছিলেন। খ্রীষ্ট কিভাবে তার ছেলেকে সুস্থ করেন হয়তো তাও তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। হয়তো তিনি একথা বুঝতে পারেন নি যে, যীশু খ্রীষ্ট চাইলে তিনি তার সংগে না গিয়েও এখান থেকেই তার ছেলেকে সুস্থ করতে পারেন।

কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই রাজ-কর্মচারীর এই আবেদনের প্রেক্ষিতে যীশু তাকে ভদ্রচিত তিরস্কার করলেন (৪৮ পদ)। যীশু তাকে বললেন, "চিহ্ন-কার্য এবং অদ্ভূত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস আনবে না।" যদিও এই সময় তিনি তার ছেলের ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং বহুদূর থেকে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তবুও

খ্রীষ্ট তাকে তিরস্কার করলেন। তিনি তার ছেলের সুস্থতার বিষয়ে কোন কথা না বলে বরং খ্রীষ্ট প্রথমে তাকে তার পাপ এবং দুর্বলতা দেখিয়ে দিলেন– তার বিশ্বাসহীনতা প্রকাশ করলেন যেন তাকে করুণা করার জন্য প্রস্তুত করতে পারেন। কেউ যদি খ্রীষ্টের সাহায্যের আকাঙ্খী হয় তাহলে তাঁর তিরস্কার তাকে নম্রভাবে গ্রহণ করতে হবে।

রাজ-কর্মচারী নাছোড়বান্দার মতই অনুরোধ করতে লাগল (৪৯ পদ): "হে প্রভু, আমার ছেলেটি মারা যাবার পূর্বেই আসুন।" তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করতে পারবেন, কিন্তু মারা গেলে পর জীবন দিতে পারবেন না। আর এই জন্য তিনি বলে উঠলেন, "হে প্রভু, আমার ছেলেটি মারা যাবার পূর্বেই আসুন।" তিনি এমনভাবে অনুরোধ করলেন যেন অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। তিনি হয়তো জানতেন না খ্রীষ্টের ক্ষমতা কেবল দৈহিক রোগ সুস্থতা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু মৃত্যু থেকে জীবন দানেরও বটে। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, এলিয় এবং ইলিশায় মৃত বালককে জীবন দান করেছিলেন। আমাদের খ্রীষ্টের ক্ষমতা কি তাদের চেয়েও কম? লক্ষ্য করুন, রাজকর্মচারীর কথায় কি অস্থিরতা রয়েছে: "দয়া করে আমার ছেলেটি মারা যাবার আগেই আসুন।" যেন সেখানে বিপদ তার সময়কে কেটে নিচ্ছে।

আমরা দেখতে পাই যে, তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট অবশেষে তাকে শান্তির উত্তর দিয়েছিলেন (৫০ পদ): "যাও, তোমার পুত্র বাঁচলো।" খ্রীষ্টের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি উপস্থিত না থাকলেও রোগ থেকে আরোগ্যদান করতে সক্ষম, ভ্রমণের কষ্ট

আরোগ্যদানের কাজকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না। খ্রীষ্ট এখানে রোগীকে কোন কিছুই বলেন নি, কিছুই করেন নি, কোন আদেশ রোগীকে পালন করতে হয় নি, তথাপি আরোগ্য কাজ সাধিত হয়েছে: 'তোমার ছেলেটি বাঁচল।' ধার্মিকতার সূর্যের রশ্মি স্বর্গের সীমানা থেকে আরোগ্যদানের কাজ শুরু করে এবং এর প্রভাব একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে বিতরণ হতে থাকে। সূর্য রশ্মির উত্তাপ থেকে কোন কিছুই লুক্কায়িত থাকতে পারে না। যদিও খ্রীষ্ট এখন স্বর্গে আছেন এবং তার মণ্ডলী এই পৃথিবীতে রয়েছে, তবুও তিনি সুস্থতার আশীর্বাদ স্বর্গ থেকে পাঠাতে পারেন। এই রাজ-কর্মচারীটি চেয়েছিলেন যেন তিনি তার সাথে তার গৃহে যান এবং তার ছেলেকে সুস্থ করেন। খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার সাথে যান নি। আর এই ভাবে খুব দ্রুত সুস্থতার কাজ সাধিত হয়েছিল। এখানে দেখা যায় যে, রাজ-কর্মচারীটি তার ভুল সংশোধন করলেন এবং তার বিশ্বাসকে নিশ্চিত এবং সুদৃঢ় করলেন। আমরা খ্রীষ্টের কাছে যখন কোন কিছু যাচঞা করি তিনি কখনও কখনও হয়তো তা দিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি আমাদের আরও অনেক বেশি উপকার করেন যা আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমরা চাই নিরুদ্বিগ্নতা, কিন্তু তিনি আমাদের উদ্বিগ্নতায়ও ধৈর্যশক্তি দান করেন। লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর কথা দ্বারা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। "যাও, তোমার পুত্র বাঁচলো", এই উক্তির দ্বারা তিনি দেখালেন যে, তিনি তাকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁর ক্ষমতা যাকে খুশি তাকেই জীবিত করতে পারে।

খ্রীষ্ট লক্ষ্য করেছিলেন যে, ছেলের জন্য পিতার অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে এবং এই উক্তির দ্বারা তার স্বাভাবিক ভালবাসা প্রকাশ

পেয়েছে: "আমার ছেলেটি, একমাত্র ছেলেটি মারা যাচ্ছে, দয়া করে সে মারা যাবার আগে তাড়াতাড়ি করে চলুন।" আর এই কারণে খ্রীষ্ট তিরস্কার করা থেকে বিরত রইলেন এবং তার ছেলের সুস্থতার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করলেন, কারণ অসুস্থ ছেলের জন্য একজন পিতার মনের কি অনুভূতি হয় তা তিনি জানেন।

পবিত্র শাস্ত্র বলে, "যীশু সেই ব্যক্তিকে যে কথা বললেন, তিনি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন।" যদিও খ্রীষ্ট তার সাথে গিয়ে তার প্রতি দয়া দেখান নি, কিন্তু রাজ-কর্মচারীটি খ্রীষ্টের সুস্থতার পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি ভেবে দেখলেন যে, এতে তিনি তার কাজে লাভবান হয়েছেন। তিনি কোন চিহ্ন বা আশ্চর্য কাজ দেখতে চান নি কিন্তু বিশ্বাস করেছিলেন যে, আশ্চর্য কাজ সাধিত হবে। তিনি কেবলমাত্র খ্রীষ্টের সর্বদর্শীতায় বিশ্বাস করেন নি কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তার ছেলে আরোগ্য লাভ করবে। যদিও তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় ছেলেকে রেখে এসেছিলেন, তথাপি খ্রীষ্ট যখন বললেন, "তোমার পুত্র বাঁচলো।" আর এখন দাসেরা এসে একই কথা বললো। এখানে দেখা যায় যে, তারাই শুভ সংবাদ লাভ করে যারা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে তাদের আশা অর্পণ করে।

তিনি দাসদের কাছে জানতে চাইলেন ঠিক কয়টার সময় তার ছেলে ভাল হয়ে গেছে (৫২ পদ)। খ্রীষ্টের কথার প্রভাবে তার ছেলে সুস্থতা লাভ করেছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহের জন্য নয়, কিন্তু তিনি তার বিশ্বাসকে নিশ্চিত করার জন্য ইচ্ছুক হলেন যেন যিনি এই আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন, তার কথা সন্তুষ্ট মনে অন্যের কাছে বলতে পারেন,

কারণ এটি ছিল শারীরিক সুস্থতার ঘটনা।

তিনি তার দাসদের জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন্ ঘটিকায় তাঁর উপশম আরম্ভ হয়েছিল?” তারা তাকে উত্তর দিল, “গতকাল সপ্তম ঘটিকার সময়ে তার জ্বর ছেড়ে গেছে।” সময়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে দুপুর একটার সময়। সেই সময় ছেলেটি কেবলমাত্র সুস্থতা লাভ করতে শুরু করে নি, কিন্তু সে হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা লাভ করেছিল। ছেলেটির পিতা বুঝতে পারলেন যে, ঠিক সেই সময়েই যীশু তাকে বলেছিলেন, “তোমার পুত্র বাঁচলো।” এভাবে ঈশ্বরের বাক্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন আমাদেরকে তাঁর পরিমাণদর্শীতা বুঝতে সাহায্য করে। কারণ ঈশ্বর প্রতিদিন পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ করছেন। এখানে দেখা যায় যে, দু’টি বিষয় তার বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য সাহায্য করেছে:

প্রথমত, তাঁর ছেলেটি হঠাৎ সুস্থ হয়েছিল, ধীরে ধীরে বা ক্রমাগতভাবে নয়। তারা সুনির্দিষ্টভাবে সময় উল্লেখ করেছিল *গতকাল*। কেবল গতকালই নয়, কিন্তু গতকাল সাত ঘটিকার সময় তার জ্বর ছেড়ে গেছে। কমে যেতে শুরু করা নয় কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত কাজ করেন না, যাতে রোগীর পর্যবেক্ষণের জন্য এবং ঔষধ প্রয়োগের পর তা কার্যকর হতে সময় লাগে এবং মনে হয় শুধু প্রত্যাশা লাভের মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করে। না, খ্রীষ্ট সেইভাবে কাজ করেন না, তিনি বলেন আর সব কিছুর সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্ট কথা বলেন আর সবকিছুই স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট তার সাথে যে সময়ে কথা বলেছিলেন ছেলেটি ঠিক সেই

সময়ে সুস্থতা লাভ করেছিল: *ঠিক সেই সময়েই*। দু'টি ঘটনার সময় এবং কাজ যখন একই সময় সংগঠিত হয় তাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সুন্দরভাবে যুক্ত হয়। সময়টি লক্ষ্য করুন, বিষয়টি আরও বেশি মহান, কারণ প্রতিটি জিনিস তার নিজ সঠিক সময়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। অনেক আগে ইস্রায়েল জাতি সম্পর্কে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা তাদের মুক্তির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল (যাত্রা ১২:৪১) যে সময়ে পিতরের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছিল সেই সময় তিনি মুক্ত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১২:১২)। মানুষের কাজ স্থানের দূরত্বের কারণে বা সময়ের দেরি ঘটায় কাজে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু খ্রীষ্টের কাজ ঐ রকম নয়। ক্ষমা এবং শান্তি, আনন্দ এবং আত্মিক সুস্থতা যা তিনি স্বর্গ থেকে বলে থাকেন, যখন তিনি তা ইচ্ছা করেন ঠিক তখনই বিশ্বাসীদের আত্মায় কার্যকর হওয়ার জন্য তা ঘটে থাকে।

এই ঘটনায় যীশু খ্রীষ্টের এই আশ্চর্য কাজের একটি সুখময় ফল এবং এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছেলেটির সুস্থতা লাভ ঐ পরিবারে পরিত্রাণ নিয়ে এসেছিল। হয়তো এই কারণেই সেই পরিবারে অসুস্থতা নেমে এসেছিল যাতে পুরো পরিবার পরিত্রাণের আলো দেখতে পায়। প্রথমত আমরা দেখতে পাই যে, ঐ রাজকর্মচারীটি যীশুর উপর বিশ্বাস আনলেন। যীশু যা বলেছিলেন সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি যীশুর উপর বিশ্বাস এনেছেন প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট হিসাবে এবং এখন তিনি তাঁর একজন শিষ্য হলেন। এইভাবে খ্রীষ্টের একটি বাক্যের ক্ষমতা এবং সুস্থতার বিশেষ অভিজ্ঞতা আত্মিক পরিত্রাণ নিয়ে আসে। আত্মা জয় করার জন্য খ্রীষ্টের অনেক পথ জানা আছে এবং জাগতিকভাবে করুণা করার মাধ্যমে

উত্তম বিষয়ের জন্য পথ তৈরি করেন।

এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে, এই আশ্চর্য কাজের ফলে তার পরিবারের সবাই খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস এনেছিল। তারা উপকৃত হয়েছিল, এই আশ্চর্য কাজটি পরিবারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং আশাকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। এই বিষয়টি তাদের প্রত্যেককে প্রভাবিত করেছিল এবং খ্রীষ্ট তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হলেন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয়টি তারা তাঁর কাছে অর্পণ করেছিল; কারণ পরিবারের প্রধানের প্রভাব সকলের উপরে বিস্তার লাভ করেছিল। একটি পরিবারের প্রধান ব্যক্তি তার পরিবারের কাউকে বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে পারেন না বা বিশ্বাসের জন্য বাধ্য করতে পারেন না। কিন্তু যদি বাহ্যিক পক্ষপাতিত্ব দূরে সরিয়ে দিতে পারে তাহলে পরিবারের অন্যদের বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

যেহেতু তিনি একজন রাজ-কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর পরিবারটি ছিল একটি ধনবান পরিবার। কিন্তু যখন তিনি খ্রীষ্টের দলভুক্ত হলেন তখন তিনি তাঁর পরিবারের অন্যদেরকেও খ্রীষ্টের দলভুক্ত করার জন্য নিয়ে এলেন। ছেলেটির অসুস্থতার মাধ্যমে এই পরিবারে অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আমাদের মানসিক এবং শারীরিক দুঃখ কষ্টকে শান্ত করে। এরকম আশ্চর্য কাজ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিবারের জন্য মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে। এই রাজ-কর্মচারী এবং তার পরিবার খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার ফলে কফরনাহূমে পরিচর্যার জন্য এগিয়ে যেতে খ্রীষ্টকে আরও উৎসাহিত করেছিল। যখন

কোন মহান ব্যক্তি সুসমাচারের অনুগ্রহ গ্রহণ করেন, তিনি যেখানে বাস করেন সেই স্থানে সুসমাচার বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

আমরা দেখতে পাই যে, সুসমাচার লেখক এই আশ্চর্য কাজের উপর মন্তব্য করেছেন (পদ ৫৪), যিহূদিয়া থেকে গালীলে আসবার পর যীশু এই দ্বিতীয় আশ্চর্য কাজ করলেন। পূর্ববর্তী পদের উল্লেখ দেখুন (যোহন ২:১১), যেখানে তিনি জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন। ঐ আশ্চর্য কাজকে সুসমাচারের লেখক যীশুর প্রথম আশ্চর্য কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। অল্পকাল পরেই তিনি যিহূদিয়া থেকে ফিরে আসলেন এবং খুব শীঘ্র তিনি দ্বিতীয় আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করলেন। যিহূদিয়াতে তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন (যোহন ৩:২; ৪:৪৫)। যিহূদিয়ার লোকেরা প্রথমে অনেক অনেক আশ্চর্য কাজ দেখেছিল এরপর খ্রীষ্ট গালীলে চলে এলেন এবং এখানে অনেক আশ্চর্য কাজ করলেন। অন্য কোথাও বা যে কোন স্থানে খ্রীষ্ট সমাদর লাভ করতে সক্ষম। লোকেরা ইচ্ছা করলে তাদের নিজেদের ঘর থেকে সূর্যের আলোকে বাইরে রাখতে পারে, কিন্তু তারা পৃথিবী থেকে সূর্যের আলোকে বাইরে রাখতে পারবে না।

নতুন নিয়মে এটি দ্বিতীয় আশ্চর্য কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন ইতোপূর্বে এই একই জায়গায় যে আশ্চর্য কাজ করা হয়েছিল তা আমরা স্মরণ করি। পূর্বের করুণা যেমন আমাদের উপর আরও করুণা লাভের জন্য উৎসাহিত করে তেমনি নতুন করুণা পূর্বের করুণাকে স্মরণ করিয়ে দিতে উদ্দীপ্ত করে। আমরা তার করুণা স্মরণে রাখি বা

না রাখি তিনি আমাদের প্রতি উপযুক্ত সময়ে করুণা বর্ষণ করেন। অন্যান্য সুসমাচারের লেখকগণও গালীলে খ্রীষ্টের আরোগ্য দানের বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন (মথি ৪:২৩; মার্ক ১:৫৪; লূক ৪:৪০) যাতে আমরা খ্রীষ্টে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে পারি।

তাঁর কথায় প্রচণ্ড ঝড় থেমে গেল!!

(gw_ 8:23-27; gvK 4:35-41; jK 8:22-25)

আজকে যে ঘটনাটির বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সেটি হল তিনি কেবল ভূমির উপর বা আকাশের উপর তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা আছে শুধু তা-ই নয় কিন্তু সাগরের উপর তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা রয়েছে। কারণ তিনি আকাশের, ভূমি ও জলের সৃষ্টিকর্তা। দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত কিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে ছাড়া কোন কিছুই সৃষ্টি হয় নি বলে পবিত্র শাস্ত্র আমাদের কাছে ঘোষণা করে।

আজকের বিষয়টিতে আমরা দেখতে পাই যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের তিবিরিয়া সাগরের অন্য পারে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাগরের অন্য পারের অঞ্চলটি ছিল গাদারীয়দের বসবাস। এরা ছিল 'গ্যাদ' উপজাতির লোক এবং ভৌগোলিকভাবে জর্দান নদীর পূর্ব পাশে ছিল এদের অবস্থান। তিনি চেয়েছিলেন যেন সেখানে মন্দতায় আশ্রিত অনুন্নত মানুষদের উদ্ধার করতে পারেন। দুইভাবেই সেখানে যাওয়া যায়। শুকনো পথে এবং জল পথে। তিনি সেখানে যাবার জন্য জল-পথ বেছে নিলেন। হয়তো এ পথে তিনি যেতে চাইলেন কারণ এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের দেখাতে চাইলেন যে, ভূমির মতো সাগরের ওপরও তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা রয়েছে। এই বিশ্বাসটুকু যেন

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে গ্রথিত হয়। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আজ আমরা বিচার করি তবে আমরা যারা তাঁর নামে চলি, তাঁর প্রদর্শিত বিশ্বাসের ধারায় জীবন যাপন করি তারা যখন জল-পথ পাড়ি দেন এবং পথের মধ্যে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন তাদের মনে এই ঘটনাটি যথেষ্টই উৎসাহের সঞ্চার করবে যে, তাদের এমন একজন পরিত্রাতা আছেন। ফলে জল-পথে প্রবল ঝড় উঠলেও তিনি তাদের আকুতি শ্রবণ করে তাদের রক্ষা করবেন।

আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর এই যাত্রায় তাঁর প্রিয় শিষ্যরা তাঁকে অনুসরণ করলেন। যে বারোজন শিষ্যকে তিনি আহ্বান করেছিলেন কেবল তাঁরাই তাঁর এই যাত্রায় সঙ্গী হলেন এবং বাকীরা তীরে থেকে গেলেন।

সমুদ্র পথের এই যাত্রায় আমরা দেখতে পাই যে, শিষ্যদের ওপর কঠিন বিপদ এবং অনিশ্চয়তা নেমে এল। তাঁরা খ্রীষ্টের বলা সত্যিকারের বিপদের মুখোমুখি হলেন– তাঁরা ঝড়ের কবলে পড়লেন। বাস্তবিকই এই ঝড়ের প্রচণ্ডতা ছিল ব্যাপক। তাঁর শিষ্যরা হয়তো মনে করেছিলেন খ্রীষ্ট যেহেতু তাঁদের সাথে আছেন সেহেতু তাঁদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকবে; কোনও ঝড় আসবে না। কিন্তু এখানে আমরা পুরো ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। এটি আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, আমরা যীশু খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে অবস্থান করলেও আমরা এই পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবেই ঝড়ের মুখে পড়বো। তাঁর মণ্ডলীর উপর ঝড় ধেয়ে আসবে (যিশা ৫৪:১১)।

ঘটনাটিতে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, খ্রীষ্ট এই সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। দৃশ্যপটটি সত্যিই আমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে। পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্টের সমস্ত জীবন ছবির মত সাজানো হয়েছে। সেখানে অনেক বাস্তব চিত্র ও ছায়া চিত্র আছে কিন্তু কোথাও আমরা তাঁকে ঘুমাতে দেখি না। আমরা সব সময়ই তাঁকে কাজ করতে দেখি। কিন্তু এখানে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। হয়তো তিনি সত্যিকার অর্থেই ক্লান্ত ছিলেন। কারাগারের ভেতর পিতরও এভাবে ঘুমিয়ে ছিলেন (প্রেরিত ১২:৬)।

কিন্তু এখানে সম্ভবত খ্রীষ্ট তাঁর এই ঘুমের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকা ১২ জন শিষ্য এবং পরবর্তীতে মণ্ডলীর জীবনকে বিশেষভাবে কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তাঁর এই ঘুমের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাসের গভীরতা পরখ করে দেখতে চেয়েছিলেন। কিংবা হতে পারে তিনি তাঁদের বিশ্বাসে ঘাটতি দেখতে পেয়েছিলেন। দুর্বল বিশ্বাসের শিষ্যরা যদিও সাগরে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন তবুও তাঁরা সেসময় সাগরের উত্তাল অবস্থা দেখে ভয় পেয়েছিলেন এবং নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রভুকে জাগিয়ে তুললেন।

তাঁরা প্রার্থনার ভাষায় তাঁকে জাগিয়ে তুললেন, 'প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন, আমরা যে মরলাম।' তাঁদের মনে এই বিশ্বাস ছিল, প্রভু তাঁদের বাঁচাতে পারেন আর তাই তাঁরা তাঁর কাছে আকুতি জানালেন। পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কাজই ছিল– আমাদের রক্ষা করা। পবিত্র শাস্ত্র বলে 'যারা সদাপ্রভুকে ডাকবে তারাই রক্ষা পাবে' (প্রেরিত ২:২১)। যারা বিশ্বাসে অনন্ত জীবনের প্রতি আগ্রহী হয় খ্রীষ্ট তাদের তাঁর রক্ত দিয়ে

নিজের করে নেন। ফলে, বিনম্র আত্মবিশ্বাসে তারা তাঁর কাছে জাগতিক সমস্যার জন্য নিজেদের সমর্পণ করে। যারা বাঁচতে চায় এবং সেজন্য প্রভুর কাছে আকুতি জানায় খ্রীষ্ট তাদের রক্ষা করেন; কারণ তিনি মহান রাজা ও উদ্ধারকর্তা।

শিষ্যদের কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছিল; তাঁরা এমন একজনের মতো প্রার্থনা করছিলেন যে, তাঁরা এখনই তার উত্তর চান। তাঁরা প্রাণ-ভিক্ষা চাইছিলেন কারণ তাঁরা নিশ্চিত জানতেন এই সাগরে নৌকাডুবি হলে তাঁরা সবাই প্রাণে মারা যাবে। বর্তমান যুগে ঠিক একই ভাবে আমাদেরও প্রার্থনার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং যীশুতে স্থির থাকতে হবে। নিশ্চিত বিশ্বাসে প্রার্থনা করতে হবে যে, তিনি এই প্রার্থনায় সাড়া দেবেন।

এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, শিষ্যদের ডাকে তিনি সাড়া দিলেন। তিনি একজন সতেজ মানুষের মতই জেগে উঠলেন। চার্চের ওপর যখন ঝড় আসে তখন খ্রীষ্ট এভাবে ঘুমিয়ে থাকলেও ভক্তগণের প্রার্থনায় নিরূপিত সময়ে চার্চের সাহায্যে তিনি জেগে ওঠেন। তিনি শিষ্যদের বললেন, ‘কেন তোমরা ভয় পাচ্ছ, ওহে অল্পবিশ্বাসীরা?’ শিষ্যেরা যে তাঁদের প্রার্থনায় তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছেন সেজন্য তিনি তাঁদের দোষী করলেন না বরং দোষী করলেন এই কারণে যে, তাঁরা অতিমাত্রায় ভয় পেয়েছিলেন। খ্রীষ্ট প্রথমে তাঁদের অল্প বিশ্বাসের জন্য সমালোচনা করলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর অনুগ্রহ দানের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের অল্প বিশ্বাসের কারণে বকা দেন তারপর সাহায্য করার জন্য এগিয়ে

আসেন।

বিশ্বাসীদের ভয় তাঁর অপছন্দ। তিনি চান না তাঁর শিষ্যেরা ভয় পাক বরং ভয়কে জয় করুক। ভয় তো পাবে পাপী লোকেরা। তাঁর লোকেরা ভয় পাবে কেন? জীবনে যত ঝড়ই উঠুক না কেন তাঁরা জানে প্রভু তাঁদের সংগে সংগে আছেন।

তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, তাঁদের বিশ্বাসের জোর কম। আমাদের অনেকের বিশ্বাস এই রকম দুর্বল। সত্যিকার অর্থেই কোন বাধা বা সমস্যা এলে তা টলে যায়। আমরা দেখতে পাই যে, ঝড়ের কবলে পড়ে শিষ্যেরা চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। তাঁদের মাঝে ঈর্ষা ছিল, কৃতকর্মের প্রভাব ছিল, মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ছিল, এবং যীশু খ্রীষ্টের সার্বক্ষণিক সংগী হওয়ার পরও বিশ্বাসের শিকর গভীরে প্রবেশ করে নি। যীশু খ্রীষ্ট তাঁদের সেই কমজোরী অবস্থা দেখতে পেয়েছিলেন। ঝড়ের সময় শিষ্যদের ভয় এবং তাদের বিশ্বাসহীনতা খ্রীষ্টকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই তিনি তাঁদের ধমকের সুরেই বলেছিলেন, "তোমাদের বিশ্বাস এত কম কেন?"

ঘটনাপ্রবাহে দেখা যায় যে, নৌকাটিকে তলিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং তাঁর শিষ্যদের নির্ভরতা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি বা-তাসকে ধমক দিলেন। এর আগে তিনি অনুগ্রহের ঈশ্বর ও হৃদয়ের রাজা হিসেবে শিষ্যদের ধমক দিয়েছিলেন; কারণ তিনি তাঁর উম্মতদের সংশোধনের পথে নিয়ে আসতে চান। আর এখানে তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর ও পৃথিবীর রাজা হিসেবে বাতাসকে ধমক দিলেন; কারণ তিনি

আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আন্তরিক। এটি সেই শক্তি যা সমুদ্রের গর্জনকে নীরব করে দেয় এবং সব ভয় ও কোলাহলকে থামিয়ে দেয়।

এখানে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হল কত সহজে কাজটি সাধিত হলো– কেবল একটি কথার দ্বারা। তিনি স্বর্গের পিতার কাছে প্রার্থনা করেন নি বা ঝড় থেমে যাবার জন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ করেন নি বা শলোমনের নামে ধমকও দেন নি। মোশি একটি লাঠি দ্বারা জলকে দু'ভাগ হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যিহোশূয় ব্যবস্থার সিন্দুক দ্বারা নদীর জল দুই ভাগ করে শুকনো পথের সৃষ্টি করেছিলেন, আর এলিয় ভাববাদী চাদর দ্বারা জর্দান নদী দুই ভাগ করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তা করলেন কেবল মুখের কথায়, ধমক দিয়ে। দেখুন সৃষ্টজগতের সবকিছুই তাঁর হুকুমের দাস। এই অনুপম সত্য একাধারে তাঁর সম্মান ও তাঁর সাথে যারা চলে তাদের আনন্দের বিষয়ে বলে।

তাঁর ধমক খেয়ে তখন সবকিছু খুব শান্ত হয়ে গেল। সাধারণত ঝড়ের পরও জলে তার আলোড়ন থেকেই যায় এবং সেই আলোড়ন থামতেও সময় লাগে। কিন্তু খ্রীষ্টের কথায় কেবল ঝড় থেমেই গেল না উপরন্তু এর সমস্ত রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থেমে গেল। আমরা দেখতে পাই এই ঘটনায় শিষ্যেরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন (২৭ পদ)। তাদের মনের মধ্যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। সেই প্রশ্ন ছিল ভয় ও সম্মান মিশ্রিত। তাদের প্রশ্ন ছিল, 'ইনি কি রকম লোক!' তারা সাগরে অনেক পথ চলেছেন এবং কখনওই এমনটা দেখেনি যে, ঝড় থেমে যাওয়ার পর দ্রুতই সবকিছু এমন শান্ত হয়ে যায়। এই চিহ্ন-কাজে তাদের বিস্মিত

হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ তারা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিল যে, এটি একটি আশ্চর্য কাজ এবং তা ঈশ্বরই তাদের জন্য তা করেছেন।

এই বিস্ময়ের ঘটনায় তাদের বিশ্বাসের জোর বৃদ্ধি পেয়েছিল। খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান মিশ্রিত ভয়ে এক প্রশংসাসূচক ভাষা তাঁদের মুখ থেকে বের হয়ে এসেছিল, 'ইনি কী রকম লোক!' আমাদের মনে রাখতে হবে পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন অনন্য; তাঁর সবকিছুই প্রশংসার যোগ্য। তাঁর মত এত জ্ঞানী, শক্তিমান, বন্ধুসুলভ আর কেউ নেই। তাঁদের এই বিস্ময়ের কারণ ছিল 'এমনকি বাতাস ও সাগরও তাঁর কথা শোনে'! খ্রীষ্ট এখানে সাগর ও বাতাসের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্য তাঁর শিষ্যদের দ্বারা প্রশংসিত হলেন। অনেকে আছেন যারা রোগ সারিয়ে তুলতে সক্ষম, কিন্তু বাতাসকে নিজের বশীভূত করতে পারে এটি সত্যিই দুর্লভ। দায়ূদ গীতসংহিতায় বলেছেন যে, 'ঈশ্বর তাঁর ভাণ্ডার থেকে বাতাসকে বের করে আনেন' (গীত ১৩৫:৭) এবং যখন তা বেরোয় তখন তিনি সেই 'বাতাসকে তাঁর মুঠোয় ধরেন' (হিতোপদেশ ৩০:৪)। একমাত্র তিনিই তা করতে পারেন। যীশু খ্রীষ্টের এই কাজের মধ্য দিয়ে এই সত্যের সংগেই আমাদের সংযোগ ঘটায়। সাগরকে শান্ত করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট প্রমাণ করলেন যে, তিনিই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আদেশেই জল চলে যায় (গীত ১০৪:৭,৮), তা ফিরে আসে এবং এখানে এখন তাঁর ধমকে সেই জল নিমিষে শান্ত হয়ে গেল।

মানুষের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টিভঙ্গী

(মথি ৫:১-৩ পদ)

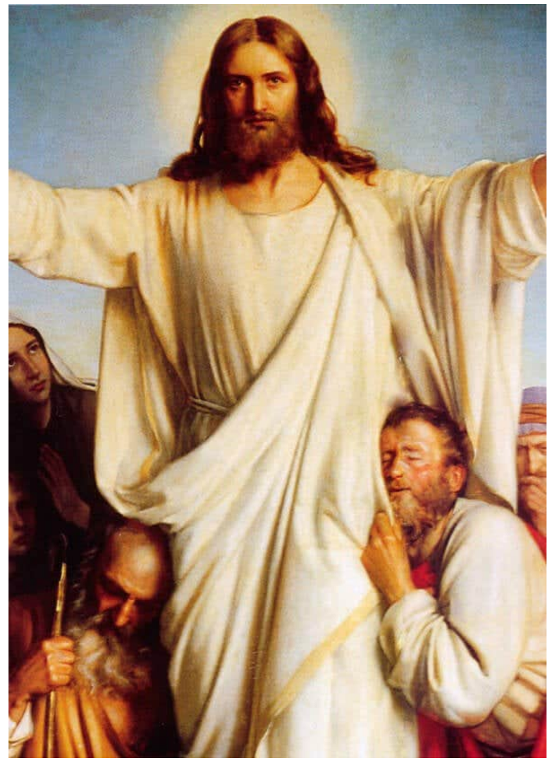

যীশু খ্রীষ্ট মানব জাতির হৃদয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন এই কারণে যে, তিনি মানুষকে এবং তার প্রয়োজন কি তা বুঝতে পারতেন এবং তার প্রয়োজন অনুসারে তিনি সাড়া দিতেন। তিনি জানতেন কি তাদের প্রয়োজন, কেন তাদের প্রয়োজন এবং কিভাবে সেই প্রয়োজনের অভাবকে মেটানো যায়। আজ থেকে যে বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটি তেমনই একটি বিষয় যা নতুন নিয়মের একটি বিখ্যাত অংশ হয়ে উঠেছে কারণ এই অংশের মধ্য থেকে আমরা দেখতে পাই যীশু খ্রীষ্ট মানুষের প্রয়োজনকে লক্ষ্য রেখে এমন একটি শিষ্য-মণ্ডলী গঠন করতে চেয়েছিলেন যারা বৃহত্তর পরিসরে মানুষের পরিচর্যায় নিজেদের বিলিয়ে দেবেন। তাঁরা তা করেছিলেন অর্থাৎ প্রভুর শিক্ষা তাঁরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার কাজ করেছেন আর তাঁরা তা করেছেন বলেই আজ আমরা দু'হাজার বছর পরেও যীশু খ্রীষ্টের নামে পরিচিত হতে চাই ও তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ লাভ করার জন্য আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হই।

ইতিহাসে এমন খুব কমই দেখা যায়, যেখানে খুব কম কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার অর্থ অনেক গভীর। বরং এর উল্টোটাই দেখা যায়– কথা অনেক কিন্তু অর্থ কম। পবিত্র শাস্ত্রের যে অংশটুকু নিয়ে আমরা

আজ আলোচনা করছি সেখানে অল্প কথা বটে কিন্তু এর ওজন পর্বতের মতই বিশাল। যীশু খ্রীষ্টের পাহাড়ে দত্ত শিক্ষা খুবই শক্তিশালী যেখানে ঈশ্বরের সত্যিকারের শিষ্যদের এক বর্ণনাময় ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এই পাহাড়ে দত্ত শিক্ষার মধ্যে মানব জীবনের মহিমাময় আশার কথা নিহিত আছে এবং বিশ্বাসীদের এমন পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে যে, পুরস্কার শুধু যে বর্তমান জগতের তা নয় কিন্তু তা অনন্তকালীনও বটে। আমাদের আজকের শাস্ত্রপাঠে দেখতে পাওয়া যায় যে, যীশু একটি মহা জনতা দেখতে পেলেন (১-২ পদ)। লেখা আছে, "তিনি অনেক লোক দেখে পর্বতে উঠলেন; আর তিনি বসলে পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি মুখ খুলে তাঁদেরকে এই উপদেশ দিতে লাগলেন– ... ।"

যীশু একটি বৃহৎ জনতার প্রতি চেয়ে দেখলেন। প্রায়শই তিনি এরকম জনতা দেখলে করুণাবিশিষ্ট হয়ে উঠেতেন। মথি ৯:৩৬ পদেও আমরা এমনটি দেখতে পাই। কিন্তু এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, পাহাড়ে দত্ত যীশু খ্রীষ্ট এই শিক্ষা কোন বৃহৎ জনতাকে দেন নি যারা তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করছিল কিন্তু এই শিক্ষা তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। "অনেক লোক দেখে" যীশু খ্রীষ্ট করুণাবিশিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মমতা জেগে উঠেছিল তাদের করুণ অবস্থা দেখে ও তাদের প্রয়োজন দেখে। তিনি জানতেন যে, তিনি নিজে তাদের কাছে এখন যেতে পারেন না, তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে বসেছিলেন, যেন তাঁরা এই বিশাল জনতার পরিচর্যা করতে পারেন। প্রশ্ন জাগে তিনি কত সময় তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পর্বতের উপর ছিলেন? এক দিন? এক সপ্তাহ? বা কয়েক সপ্তাহ? কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রে মাত্র বলা

হয়েছে যে, তিনি পাহাড় থেকে নামলেন এবং লোকেরা তাঁর পশ্চাত অনুসরণ করতে লাগল (মথি ৮:১)।

আজকের আলোচনার আলোকে আপনাদের মাথায় কয়েকটি চিন্তা দিতে চাই। আশা করি এসব চিন্তাগুলো আপনারা আপনাদের কর্মক্ষেত্রে, আপনার পরিচর্যা ক্ষেত্রে বা মণ্ডলীতে শিষ্য-গঠনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবেন।

চিন্তা ১: বৃহৎ জনতার পরিচর্যা করার জন্য দু'টি মূল উপকরণের প্রয়োজন ছিল

(১) *করুণাবিষ্ট হওয়া: অনেক লোক দেখে...;* আমরা যে লোকদের পরিচর্যা করতে চাই তাদের প্রতি আমাদের চোখ খোলা রাখা প্রয়োজন। তাদের প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখা পরিচর্যাকারীর মানায় না। আপনি একটি দলকে যখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের প্রতি আপনার চোখ খোলা রাখা দরকার এই কারণে নয় যে, আপনি তাদের শাসন করবেন কিন্তু চোখ খোলা রাখবেন যেন লোকদের ও তাদের প্রয়োজন কি তা দেখতে পাওয়া যায়। কারণ প্রয়োজন জানতে পারলেই তা মেটানোর জন্য অগ্রসর হওয়া যায়।

পবিত্র শাস্ত্রে দেখা যায় যে, আমাদের প্রভু করুণাবিশিষ্ট হতেন যখন তাদের দেখতে পেতেন। কারণ তিনি তাদের প্রয়োজন কি তা দেখতে পেতেন। বলা হয়েছে, "কিন্তু অনেক লোক দেখে তিনি তাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, কেননা তারা ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল, যেন রাখালবিহীন ভোড়ার পাল" (মথি ৯:৩৬)।

করুণাবিষ্টি হওয়া ঐশ্বরিক চরিত্রের অংশ। করুণাবিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর ভিতরের ঐশ্বরিক চরিত্রকেই আমরা দেখতে পেতাম। যে মানুষকে তিনি নির্মাণ করেছেন, যে অব্রাহামের বংশকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, যে প্রজাবর্গকে নিজের প্রজা বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাদের কষ্ট দেখে, তাদের প্রয়োজন উপলব্দি করে তিনি করুণাবিষ্ট হতেন। পুরাতন নিয়মে, যিশাইয়ের কিতাবে মহান সদাপ্রভুর বিষয়ে তেমনিই বলা হয়েছে। সেখানে লেখা আছেঃ "তাদের সকল দুঃখে তিনি দুঃখিত হতেন, তাঁর উপস্থিতির দূত তাদেরকে পরিত্রাণ করতেন; তিনি তাঁর প্রেমে ও তাঁর স্নেহে তাদেরকে মুক্ত করতেন এবং পুরাকালের সমস্ত দিন তাদেরকে তুলে বহন করতেন" (যিশা ৬৩:৯)।

(২) *শিষ্য-গঠন:* এই ছোট্ট অংশটি থেকে আমরা আরেকটি বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, একাকী সমস্ত কাজ শেষ করা যায় না। আমাদের সম্মুখে কার্যক্ষেত্র অনেক বড় এবং সেই তুলনায় কার্যকরী লোক কম। এজন্য অন্যদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি দলকে তৈরি করা প্রয়োজন যেন সুসমাচারের মহান কাজে, গ্রেইট কমিশনের কাজে তারা সাহায্য দিতে পারে। প্রভু স্বর্গে আরোহন করার পূর্বে তিনি তাঁর শিষ্যদের এই মহান আদেশ দিয়েছিলেন, "অতএব তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র-আত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও; আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করেছি, সেসব পালন করতে তাদেরকে শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমেন যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৯-২০)।

এই কাজ একার কাজ নয় কিন্তু অনেকের। আর সেজন্য শিষ্য-গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরী। প্রেরিত পৌল এই সত্য বিশ্বাস করতেন ও তাঁর জীবনে তা প্রয়োগ করতেন। তিনি তাঁর যুবক শিষ্য তীমথিকে এই কথা বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি শিষ্য-গঠনের কাজ যত্নের সঙ্গে পালন করেন। তিনি তাঁকে বলেছেন, "আর অনেক সাক্ষীর মুখে আমার যেসব শিক্ষার কথা শুনেছ, সেসব এমন বিশ্বস্ত লোকদেরকে দাও, যারা অন্য লোকদেরকেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে" (২ তীমথিয় ২:২)।

চিন্তা ২: শিষ্য-গঠন প্রক্রিয়ার কাজের স্থান নির্বাচনের সীমারেখা

আলোচ্য শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখতে পাই তিনি শিষ্য-গঠনের কাজে একটি পাহাড়ের উঁচু স্থানকে বেছে নিয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করছিল বিশাল একটি জনতা। হয়তো সেই উঁচু স্থানে সকলের যাওয়া সম্ভবও ছিল না। আর তিনি মাত্র ছোট্ট একটি দলকেই প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিলেন। যে বিষয়টির উপর আমাদের জোর দেওয়া প্রয়োজন তা হল প্রচার করা ও শিক্ষা দেওয়া শুধুমাত্র মণ্ডলীর চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কিন্তু যেখানেই লোক দেখতে পাওয়া যায়– পাহাড়ে, সাগর পারে, রাস্তাঘাটে, বাড়িতে– যে কোন জায়গায়, সমস্ত জায়গায় প্রচার করা ও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র যিহূদীতের সিনাগগে শিক্ষা দেন নি কিন্তু যেখানে লোকের সমাগম হয়েছে সেখানেই তাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

চিন্তা ৩: একটি ছোট্ট দলকে বৃহৎ দলের জন্য প্রস্তুত করা

লোক বা জনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একটি ছোট শিষ্য বা শিষ্যের

দল মহান সুসমাচার প্রচারের কাজ বা গ্রেইট কমিশন শেষ করা খুবই কঠিন কাজ। আমাদের প্রভুর মিশন-কাজ হল লোকদের শিক্ষা দেওয়া কিন্তু আমাদের প্রভুর মেথড বা পদ্ধতি হল শিষ্য গঠন করা। একটি ছোট দলকে নানা রকম প্রশিক্ষণ দান করা প্রয়োজন যেন তারা বৃহৎ জনতার পরিচর্যায় সাহায্য করতে পারে। পৌল যেমন নিজে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতে পছন্দ করতেন তেমনি তিনি সেই সব শিষ্য প্রস্তুত করেছিলেন যারা অন্যদের শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করতে পারতেন। আজকার দিনেও আমাদের জন্য এই পদ্ধতি খুবই জরুরী। আমাদেরও ছোট্ট ছোট্ট দল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা দরকার যেন তারা আবার অন্যদের প্রস্তুত করতে পারেন। এতে করে একটি বলয় সৃষ্টি হবে এবং গ্রেইট কমিশনের কাজ এগিয়ে যাবে, যেমন প্রভু আমাদের আদেশ করেছেন, “অতএব তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও; আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করেছি, সেসব পালন করতে তাদেরকে শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমিই যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি” (মথি ২৮:১৯-২০)।

এছাড়া দেখুন, “পরে তিনি দর্বীতে ও লুস্ত্রায় উপস্থিত হলেন। আর দেখ, সেখানে তীমথি নামে এক জন শিষ্য ছিলেন; তিনি এক জন বিশ্বাসী যিহূদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তার ছিলেন পিতা গ্রীক; ... পৌলের ইচ্ছা হল, যেন সেই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে গমন করেন; আর তিনি ঐ সমস্ত স্থানেও যিহূদীদের জন্য তাঁকে নিয়ে তাঁর ত্বক্‌ছেদ করলেন; কেননা তাঁর পিতা যে গ্রীক, তা সকলে জানতো।” (প্রেরিত ১৬:১, ৩)।

“আর অনেক সাক্ষীর মুখে আমার যেসব শিক্ষার কথা শুনেছ, সেসব এমন বিশ্বস্ত লোকদেরকে দাও, যারা অন্য লোকদেরকেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে” (২ তীমথিয় ২:২)।

আজ খ্রীষ্টান নেতাদের একসঙ্গে আহ্বান করা হচ্ছে যেন তারা ছোট ছোট দল করে বিশেষ শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তোলেন ও সুসমাচার অভিযাত্রায় বা গ্রেইট কমিশনের জন্য তাদের প্রস্তুত করেন। মথি কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বলেছেন যে, তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে আসলেন (১)। কিন্তু মার্ক ও লূক বলেছেন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের একত্রে ডাকলেন তাদের প্রশিক্ষণ দেবার ও প্রস্তুত করার জন্য (মার্ক ৩:১৩; লূক ৬:১৩)।

চিন্তা ৪: প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুত করার জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন

প্রশিক্ষণের জন্য কিছু মৌলিক জিনিসের প্রয়োজন, যেমন– একটি স্থান, একটি সময় ও একটি শিক্ষা-বিষয় (ম্যাসেজ)। পবিত্র শাস্ত্রে যেভাবে বলা হয়েছে তিনি পাহাড়ে উঠলেন.... তিনি বসলেন ...। মনে হয় এখানে বলা হয়েছে যে, যীশু ইচ্ছা করেই এই স্থান ও সময়টি বেছে নিয়েছিলেন এই প্রশিক্ষণ কাজের জন্য। তিনি পরিকল্পনা করেই এসব করেছিলেন। যীশু ব্যক্তিগতভাবেই এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন যে প্রস্তুতির প্রয়োজনকে আমরা প্রায়শই অবহেলা করে থাকি।

আমরা আমাদের পবিত্র শাস্ত্র পাঠে যে অংশ থেকে পাঠ করেছি এবং পরবর্তী যে কয়েকটি শিক্ষামালায় পাঠ করতে যাচ্ছি তা হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেই বিখ্যাত অংশ যাকে আমরা ‘দি গ্রেইট সারমন অফ দি মাউন্ট’ বলে থাকি। এই শিক্ষাগুলো তিনি তাঁর শিষ্যদের দান

করেছিলেন তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলবার জন্য। আজকের পাঠে বিশেষ করে আমরা আলোচনা করেছি প্রথম তিনটি পদ যেখান থেকে আমরা মূলত চারটি চিন্তা আবিষ্কার করতে পেরেছি যে চিন্তাগুলো বা পয়েন্টগুলো আমরা আমাদের প্রচার তৈরিতে কাজে লাগাতে পারব। আপনারা যখন শিষ্য-গঠন কাজে বা মণ্ডলীতে শিক্ষা দেবার কাজে এই অংশ থেকে প্রচার তৈরি করবেন আমি বিশ্বাস করি তখন এই পাঠটিকে কাজে লাগাতে পারবেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা

"প্রভুর আত্মা আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, বন্দীদের কাছে মুক্তি, এবং অন্ধদের কাছে দৃষ্টিদান ঘোষণা করার জন্য, নির্যাতিতদেরকে নিস্তার করে বিদায় করার জন্য, প্রভুর অনুগ্রহের বছর ঘোষণা করার জন্য।" (লূক ৪:১৮-১৯)

যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট পরিচর্যাকারী যিনি তাঁর কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত সময়ের সর্বত্তোম ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সারে তিন বছরের পরিচর্যা কাজের দিকে তাকালে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে। যে শাস্ত্রের অংশটুকু পাঠ করেছি তা ছিল তাঁর পরিচর্যা কাজের সময়োপযোগী ঘোষণা যার মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তিনি সেই খ্রীষ্ট যাঁর কথা তাদেরই পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর গ্রামের যারা তাঁকে ছোটবেলা থেকেই চিনতো তাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইতোমধ্যেই তারা তাঁর বিষয়ে যা শুনতে পেয়েছে তা সত্যি।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ শুরু হয়েছে। এটি তাঁর সারে তিন বছরের পরিচর্যা কাজের শুরু মাত্র। মাত্র দেড়-দুই মাস আগে তাঁর বাপ্তিস্ম হয়েছে। লোকেরা যাঁকে ভাববাদী বলে মানে সেই যোহন ভাববাদী তাঁকে বাপ্তিস্ম দিয়েছেন আর

তাঁর বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। শুধু তিনি নন কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর স্বর্গ থেকে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সেই মুহূর্তে আকাশ খুলে গিয়েছিল আর স্বর্গ থেকে তাঁর মশীহত্বের ঘোষণা স্বয়ং ঈশ্বর দিয়েছিলেন। অনেক লোকের চোখের সামনেই এই ঘটনা ঘটেছিল। এর পর দীর্ঘ ৪০ দিন প্রান্তরে তাঁর পরীক্ষা হয়েছে। সেই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন। এর পর তিনি নাসরতে ফিরে এসেছেন।

আমরা সবাই জানি তিনি জাতিতে যিহূদী ছিলেন। যিহূদী নিয়ম অনুসারেই তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। সমাজের একটি অংশ হিসাবে তিনি নিয়মিত সিনাগগে বা সমাজ-গৃহে যেতেন ও এর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর কার্যক্রমের অংশস্বরূপ আ-জও তিনি সমাজ-গৃহের সভায় মিলিত হয়েছেন।

সেই সময়ের রীতি অনুযায়ী সমাজগৃহ পরিচালিত হত। আমরা জানি না কেন যীশুকে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করবার জন্য আহ্বান করা হল– আহ্বান করা হল পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার জন্য। হয়তো আগে থেকেই সমাজ-গৃহের নেতা তা ঠিক করে তাঁক আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন এবং তিনি সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করার কথা দিয়ে রেখেছিলেন। নয়তো বা পবিত্র-আত্মার আবেশেই তাঁকে ডাকতে বাধ্য হয়েছিল। হয়তো যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে পবিত্র-আত্মার অভিষেকের কথা তাঁর গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পরেছিল যেখানে লোকেরা আকাশ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেয়েছিল। হয়তো যীশু খ্রীষ্টের কোন আশ্চর্য কাজের কথা ইতিমধ্যেই তাঁর গ্রামের সমাজগৃহের নেতাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পরেছিল। তাই তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল।

যে কারণেই হোক, তারা তাঁকে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতে ও ব্যাখ্যা করতে আহ্বান জানাল। আর যীশু খ্রীষ্ট এই সুযোগটি তাঁর নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাঁর বাপ্তিস্মের পরে কোন সমাজগৃহে এটাই তাঁর প্রথম প্রচার-বাণী। তাঁর হাতে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকখানা দেওয়া হল। সেই সময় কোন বই আকারে কোন পুস্তক ছিল না। তখন ভাববাদীদের পুস্তক বা পবিত্র লেখাগুলোকে স্ক্রোল আকারে রাখা হত। সেজন্য যিশাইয়ের শাস্ত্রের মত একটি বড় পুস্তক অনেকগুলো স্ক্রোলে ভাগ করা হতো। যে স্ক্রোলটি তাঁকে দেওয়া হল সেই স্ক্রোল থেকে তিনি সেই স্থান খুঁজে বের করলেন যেখানে তাঁর পরিচর্যা কাজের সম্পর্কে লেখা আছে।

আমরা অনেকেই জানি যে, যিশাইয়ের পুস্তকখানি হল পুরাতন নিয়মে মধ্যে যেন নতুন নিয়ম। এই একটি মাত্র পুস্তক যেখানে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি লেখা আছে। পুরো পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে যত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তারচেয়ে বেশি রয়েছে শুধু যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকে। সেজন্য এটিকে পুরাতন নিয়মে নতুন নিয়ম বলা হয়ে থাকে।

আমরা শাস্ত্রের পঠিত অংশে দেখতে পাই যে, পুস্তকখানি তাঁর হাতে দেওয়া হল। না, তিনি খুলে সেই জায়গা বের করলেন না যেখানে তাঁর জন্মের কথা, ইম্মানূয়েলের কথা, কুমারীর গর্ভে তাঁর জন্মের কথা লেখা আছে। না, তিনি সেই জায়গাও বের করলেন না যেখানে তাঁর রাজ্যের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সেই অংশও বের করলেন না যেখানে তার মৃত্যুর এক পরিস্কার ছবি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সেই জায়গাটি বের করলেন যেখানে তাঁর পরিচর্যার কথা এবং পরিচর্যা

শুরু করার কথা ভবিষ্যদ্বাণী আকারে রয়েছে।

তিনি স্ক্রলটি খুলেই পাঠ করতে শুরু করলেন। আমরা অনেকেই মনে করি তিনি ঐশ্বরিক ছিলেন বলে পড়াশুনা বা পড়তে পারাটা এমনিই হয়েছিল বা তাঁর পড়াশুনা শিখতে হয় নি। কিন্তু আসলেও কি তাই? তিনিও সাধারণ ছাত্রদের মতই পড়াশুনা করে অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিলেন। হয়তো প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান তার ঘর থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে তৎকালীন সমাজগৃহগুলো যিহূদী জাতির স্কুলের চাহিদা মিটাত এবং ইস্রায়েলীয় ছেলেমেয়েদেরকে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হত। এছাড়া যীশু খ্রীষ্টের সময়ে কিছু কিছু যিহূদী সম্প্রদায় ছিল যারা নির্জন জায়গায় গিয়ে একটি কমিউনিটি গড়ে তুলত স্বতন্ত্র বসবাস করার জন্য যেন জগতের অপবিত্রতা তাদের স্পর্শ করতে না পারে। এসব কমিউনিটিগুলোতে স্কুলের মতই ব্যবস্থা ছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে পুরাতন নিয়ম ও তাদের ব্যাখ্যা পুস্তকগুলোর সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করত। যদিও ১২ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের কোন ইতিহাস আমাদের জানা নেই, তাই অনেকে মনে করেন তিনি এমন কোন ধর্মীয় স্কুলে বা মঠে গিয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন বলেই আমরা তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কোন ইতিহাস বা ঘটনা জানতে পারি না। অনেকে মনে করেন সেখানে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং শিক্ষা দেবার কাজ শুরু করেন।

যাহোক, আমরা দেখতে পাই যে, তিনি পাঠ করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর সমাজগৃহে উপস্থিত হওয়া লোকদের কাছে পাঠ করলেন– "প্রভুর আত্মা আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য; তিনি

আমাকে প্রেরণ করেছেন, বন্দীদের কাছে মুক্তি, এবং অন্ধদের কাছে দৃষ্টিদান ঘোষণা করার জন্য, নির্যাতিতদেরকে নিস্তার করে বিদায় করার জন্য, প্রভুর অনুগ্রহের বছর ঘোষণা করার জন্য।”

পাঠ করার পর তিনি ঘোষণা দিলেন যে, এই কথা আজ তাঁর মধ্যে পূর্ণ হল। তিনি বললেন, ‘প্রভুর আত্মা আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন’। আমরা জানি যে, তিনি পবিত্র-আত্মার আবেশে জন্মগ্রহণ করেছেন– পবিত্র আত্মায় তাঁর অভিষেক ও বাপ্তিস্ম হয়েছে। সুতরাং এটি খুবই সত্যি কথা যে, পবিত্র আত্মা তাঁর মধ্যে অবস্থিতি করেন। আজ তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে তাঁরই সমাজ-গৃহে নিজের মুখে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি ঘোষণা করছেন যে, তিনি কি জন্য এসেছেন– তিনি কি কাজ করতে যাচ্ছেন। তিনি বললেন যে, তিনি এসেছেন দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য।

এখানে দু’টি বিষয় চিন্তা করার আছে– দরিদ্র ও সুসমাচার। সুসমাচার কার জন্য? হ্যাঁ, দরিদ্রদের জন্য। প্রশ্ন জাগে, সুসমাচার কি? আমাদের জীবনে যেসব বিষয় অভিশাপ হয়ে আসে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘোষণাই হল সুসমাচার। কেন সুসমাচার দরিদ্রদের জন্য প্রয়োজন। পবিত্র শাস্ত্র বলে সুসমাচার প্রয়োজন আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য। আর এই পাপই আমাদের দরিদ্র করে রাখে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে আমরা সবাই দরিদ্র, উলঙ্গ, ভিখারী, তাই আমাদের সকলেরই সুসমাচার প্রয়োজন যেন আমরা অনন্ত জীবন পাই– পাপ থেকে অনন্ত পরিত্রাণ পাই। যীশু আমাদের সকলকেই তা দিতে চান। আজ এই সিনাগগে তিনি ঘোষণা করলেন যে, যিশাইয় ভাববাদী যে

খ্রীষ্টের বিষয়ে এই কথা বলেছেন তিনিই সেই খ্রীষ্ট এবং আজ পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্ণ হল।

তিনি বললেন যে, তিনি অভিষিক্ত বন্দিদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করার জন্য। কারা এই বন্দি? রাজা হেরোদ ও রোমীয় সম্রাট যাদের বন্দি করে রেখেছেন তারা? প্রকৃত অর্থে এই জগত সংসারে আমরা অনেকভাবেই বন্দি আছি। শুধু যারা জেলে আছে তারাই বন্দি নয়। আমরা আমাদের গর্বের কাছে, অহংকারের কাছে, দর্পের কাছে, নানা রকম পাপ-স্বভাবের কাছে বন্দি হয়ে আছি। আমরা নানা রকম নেশার কাছে– অর্থ, সোনারূপা, চাকচিক্য, বিলাসিতা ইত্যাদির কাছে বন্দি হয়ে আছি। যীশু খ্রীষ্ট সেখান থেকে আমাদের মুক্ত করতে চান। আমরা অনেক রোগ-শোকে বন্দি হয়ে আছি– বন্দি হয়ে আছি নানা রকম কুসংস্কারে। আমরা এখনও অনেক অশিক্ষা, কুশিক্ষায় ও কুসংস্কারে বন্দি হয়ে আছি। যীশু আমাদের সেখান থেকে মুক্ত করতে চান। তিনি আমাদের এসব থেকে স্বাধীন করতে চান।

যীশু বলেছেন যে, প্রভুর আত্মা তাঁকে অভিষেক করেছেন আমাদের কাছে দৃষ্টিদান ঘোষণা করার জন্য। আমাদের অনেকেরই দৈহিক অন্ধত্ব আছে বটে। যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজের সময় অনেককে সেই অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আজ আমাদের যাদের চোখ আছে তারাও অনেক রকমভাবে অন্ধ। এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের অনেকেরই মনের চোখ অন্ধ, আমাদের হৃদয়ের চোখ অন্ধ, আমাদের জ্ঞানের চোখ অন্ধ। এই অন্ধত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দরকার। যীশুকে ঈশ্বর অভিষেক করেছেন যেন তিনি এইসব অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারেন। ঈশ্বরের পুত্র এই জগৎ সংসারে এসেছেন

যেন আমাদের জাগতিক ও আত্মিক অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যের আলো– প্রেমের আলো দেখাতে পারেন। আজকে এই বিশ্বে যীশুর নামে হাজারো প্রতিষ্ঠান কাজ করছে যেন পৃথিবীতে যে অন্ধত্ব আছে তা ঘুচিয়ে যীশুর নামে তারা আলো জ্বালাতে পারে।

তিনি বলেছেন, তিনি নির্যাতিতদের নিস্তার করতে এসেছেন। ঈশ্বর যীশুকে অভিষেক করেছেন যেন নির্যাতিতরা নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ধনীদের দ্বারা, সমাজপতিদের দ্বারা, ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা, দাসত্ব প্রথার দ্বারা বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হত। যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে মুক্ত করার জন্য অভিষেক পেয়েছেন। আজকে আমাদের সমাজ জীবনে মানুষ অনেকভাবে নির্যাতিত। যীশু খ্রীষ্ট তাদের সকলকে মুক্ত করতে চান।

শেষতঃ তিনি বলেছেন যে, তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন প্রভুর অনুগ্রহের বছর ঘোষণা করার জন্য। এই অনুগ্রহের বছর হল ঋণ ক্ষমা করার বছর। এ সময় দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এ সময় বন্ধকি বা ক্রয়কৃত ভূমি আগের মালিককে ফেরত দেওয়া হয়। এই সময়টি তাদের জীবনে ফিরে আসত ৭০ বছর পর পর। যীশুকে অভিষেক করা হয়েছে সেই অনুগ্রহের বছর ঘোষণা করার জন্য।

ঈশ্বরের কাছে লোকেরা পাপের ঋণে আবদ্ধ। মানুষ মানুষের কাছে দাসত্বে আবদ্ধ। আমাদের জীবনরূপ ভূমি শয়তানের হাতে চলে গেছে। আজ যীশু চান তা আমাদের ফিরিয়ে দিতে। তিনি আমাদের মুক্তি দিতে চান। পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে চান। তাঁর অনুগ্রহ তিনি

আমাদের দিতে চান। আজ সবাই প্রচার করে খ্রীষ্টান বানাতে চায়, বাপ্তিস্ম দিয়ে সেই কাজ শেষ করতে চায়। কিন্তু বাস্তব লোকদের বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে চায় না। কিন্তু যীশু বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান দিয়েছেন। এই কাজ করার জন্যই তিনি অভিষেক পেয়েছেন এবং তিনি আমাদের মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অভিষেক দিয়েছেন।

আজ যীশু স্বশরীরে এই পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে নেই। মণ্ডলীকে তিনি এই দায়িত্ব দিয়েছেন যেন আমরা সুসমাচার প্রচার করি, মুক্তি ঘোষণা করি, অন্ধদের দৃষ্টি দেই এবং নির্যাতিতদের নিস্তার করি এবং পরিত্রাণ ঘোষণা করি। আজ আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে হবে। প্রভুর শক্তি যাচঞা করতে হবে যেন পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অভিষেক করেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এসব পরিচর্যার দায়িত্ব পালন কর-ার জন্য। তাই আসুন, প্রভুর লোক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে আসি প্রভুতে সমর্পিত হই।

সদাপ্রভু আপনার জীবনে নতুন কিছু করতে চান

“সেই সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা আগের সমস্ত কাজ মনে করো না, পুরানো সমস্ত কাজকর্মের কথা আলোচনা করো না। দেখ, আমি একটি নতুন কাজ করবো তা এখনই অঙ্কুরিত হবে; তোমরা কি তা জানবে না? এমন কি, আমি মরুভূমির মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।” (যিশাইয় ৪৩:১৮,১৯)

ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসের একটি দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে ইস্রায়েলীয়দের জন্য ভাববাদী যিশাইয়ের পুস্তকখানি লেখা হয়েছিল। তারা চারদিক থেকেই খুব মন্দ সময়ের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিল। যা কিছু তারা সারা জীবন ধরে রাখতে পারবে বলে তারা ভেবেছিল এবং দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে ফিরে আসবার জন্য প্রায় ব্যকুল হয়ে পড়েছিল। ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদের জীবনে শান্তি, উন্নতি ও আশার আলোর যে আশীর্বাদ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার সবকিছুই তারা হারিয়েছিল। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সদাপ্রভু যা যা করতে চান তার ওপর একটি নতুন দর্শন এবং একটি নতুন আগ্রহ খুঁজতে ইস্রায়েলীয়দেরকে প্রেরণা দিয়েছেন। ঈশ্বরের সেই একই বাক্য এই নতুন বছরে আমাদের সকলের জন্য একই সত্য বয়ে নিয়ে আসে।

ঈশ্বরের আপনার জীবনে যে নতুন কাজটি করতে চান সেটিকে গ্রহণ করার প্রথম ধাপটি হল: আপনার মনোযোগ পরিবর্তন করা– পেছনে

তাকানো বন্ধ করা, সামনের দিকে তাকাতে শুরু করা (১৮ পদ)। সেই সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "তোমরা পূর্বকার সমস্ত কাজ মনে করো না, পুরাতন সমস্ত ক্রিয়া আলোচনা করো না।" যদি আপনি অবিরামভাবে পেছনের দিকে তাকাতে থাকেন তবে আপনি দেখতে পাবেন না যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন। যদি কখনও আপনি খ্রীষ্টে নতুন পথে চলতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে আপনি কখনো অতীতের বিজয়গুলোর ওপর নির্ভর করে নিজেকে ধরে রাখতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে যে, সদাপ্রভু বলেছেন, "তোমরা পূর্বেকার সমস্ত কাজ মনে করো না।" আমরা জানি যে, ইস্রায়েলীয়দের জীবনে অতীতে অনেকগুলো বিজয় ছিল:

- দাসত্বের জীবনের অবসান ঘটিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে আসা
- কনান দেশ জয় করা
- শক্তিশালী যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করা
- নিজেদের দেশে একটি বিছিন্ন অবস্থার মধ্যেও বেঁচে থাকা

কিন্তু যদিও এখন তারা খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে আর তাদের আগের বিজয়গুলো তাদেরকে মুক্ত করার জন্য কিছুই করতে পারেনি। এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে বের হয়ে আসবার জন্য তাদের একটি নতুন কাজ, একটি নতুন আশ্চর্য ঘটনা, একটি নতুন বিজয়ের প্রয়োজন ছিল। অতীতে ঈশ্বর আপনার জন্য কি করেছেন সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটি হতে হবে: এই মুহূর্তে ঈশ্বর আপনার জীবনে কি করছেন? তিনি এখন কি করতে চান? এই মুহূর্তে সেই উত্তম বিষয়টি কি যেটি আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের কাছ থেকে আশা করেন?

দ্বিতীয়ত, যদি খ্রীষ্টে নতুন পথে চলতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, আপনি আপনার অতীতের পরাজয়গুলো দিয়ে আপনার মনকে যদি আচ্ছন্ন করে রাখেন তবে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন না। যদি আপনি পুরাতন সমস্ত কিছুর কথা ভাবতেই থাকেন তবে সামনের দিকে পথ চলার শক্তি পাবেন না।

আমরা জানি যে, বিভিন্ন সময়ে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরকে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট করেছিল। ঈশ্বর প্রতিটি সময়ে তাদের ভাল জিনিস দিয়ে আ-শীর্বাদ করতেন, কিন্তু এর বদলে তারা তাঁর প্রতি তাদের অবাধ্যতা, মন্দতা প্রকাশ করতো:

- ঈশ্বর তাদের মন্দির দিলেন, তাতে তারা তাঁকে মূর্তি পূজা করল
- ঈশ্বর তাদের সত্য দিলেন, তারা সেই সত্যকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করল এবং সেইভাবে জীবনযাপন করতো।
- ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর দশ আজ্ঞা দিলেন, সেই আদেশ না মেনে তারা তাদের ইচ্ছামত জীবনযাপন করতো।
- ঈশ্বর তাদের সম্পদ দিলেন, তারা সেগুলো দিয়ে গরীবদের অপব্যবহার করতো।
- ঈশ্বর নিজেকে তাদের কাছে দিলেন, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান ছাড়া কিছুই দিল না।

ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন আশীর্বাদ পাবার যোগ্য ছিল না। তবুও তিনি তাদের ভালবাসতেন এবং তিনি একান্তভাবে তাদের মধ্যে একটি পরিবর্তন এনে সাহায্য করতে চাইলেন। ঈশ্বরের বার্তাটি

লক্ষ্য করুন: “তোমরা আগের সমস্ত কাজ মনে করো না, পুরানো সমস্ত কাজকর্মের কথা আলোচনা করো না। দেখ, আমি একটি নতুন কাজ করবো ... ।”

এখানে ঈশ্বর তাদেরকে তাদের অতীতের পাপ কাজের জন্য দোষারোপ করেন নি, কারণ তারা তাদের অতীতের কোন কিছুই পরিবর্তন করতে পারতো না। এর বদলে ঈশ্বর তাদেরকে আশার আলো দেখালেন। তিনি একটি কার্যকরী কথা বললেন: তোমাদের অতীতের কাজ সকল মনে করো না– আমি তোমাদের একটি সুযোগ দিচ্ছি আবার নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য।

এসময়ে পবিত্র শাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের কথা মনে পড়ে। পদটি হল যিশাইয় ৫৫:৭ পদ। “দুষ্ট তার পথ, অধার্মিক তার সঙ্কল্প ত্যাগ করুক; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরে আসুক, তাতে তিনি তার প্রতি করুণা করবেন; আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসুক কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করবেন।” যদি আপনি আপনার আত্মিক জীবনে কোথাও কোন আশা পেতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আপনি গতকালের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন না।

ইস্রায়েলীরা তাদের ইতিহাসে অনেক আত্মিক আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সেই প্রথমে মিশর থেকে বের হয়ে আসা, লোহিত সাগর পার হওয়া, কেনান দেশ জয় করা, যিরূশালেমে মন্দির তৈরি করা, এমনকি ইস্রায়েল তাদের কাজকর্মে এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের হাত কিভাবে তাদের পরিচালনা করেছে তার সাক্ষী তারা হয়েছিল। তথাপি ঈশ্বর তাদের জন্য যা কিছু করেছেন তার জন্য তাঁর প্রতি

তাদের সেই বিশ্বাস তাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য কিছুই করতে পারেনি। তাদের পুরাতন বিশ্বাস তাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতির সমস্যাগুলো থেকে উদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাদের নতুন বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল, একটি নতুন দর্শনের দরকার ছিল যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কিছু করতে পারতেন। বিশ্বাসের একটি নতুন অংশ তাদের প্রয়োজন ছিল যেটা আগের সব বিজয়কে ছাড়িয়ে যেত। ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছ থেকে প্রতিনিয়তই তাদের শক্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজন ছিল। সেজন্য দায়ূদ পবিত্র গীত ৮৫:৬-৮ পদে বলেছেন: "তুমিই কি আবার আমাদের সঞ্জীবিত করবে না, যেন তোমার লোকেরা তোমাতে আনন্দ করে? হে সদাপ্রভু , তোমার অটল ভালবাসা আমাদেরকে দেখাও, আর তোমার পরিত্রাণ আমাদের প্রদান কর। ঈশ্বর সদাপ্রভু যা বলবেন, আমি তা শুনব।"

ঈশ্বর আপনার জীবনে যে নতুন কাজটি করতে চান সেটিকে গ্রহণ কর-ার দ্বিতীয় ধাপটি হল: আপনার মনোনিবেশ স্পষ্ট করা– ঈশ্বর আপনার জীবনে যা করতে চান তা আবিষ্কার করা। পবিত্র শাস্ত্র বলে, "তোমরা আগের সমস্ত কাজ মনে করো না, পুরানো সমস্ত কাজকর্মের কথা আলোচনা করো না। দেখ, আমি একটি নতুন কাজ করবো তা এখনই অঙ্কুরিত হবে; তোমরা কি তা জানবে না? এমন কি, আমি মরুভূমির মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।"

উপলব্ধি করার হিব্রু শব্দ হল 'yada' যার মানে হল দেখার মাধ্যমে জানা, তত্ত্বাবধান, স্বীকৃতি, সত্যতা স্বীকার, সচেতন হওয়া, বুঝতে পারার মাধ্যমে জানা, ইত্যাদি। আপনি আপনার জীবনের দিকে

তাকালে কি দেখতে পান? আপনি কি সম্ভাবনা অথবা সমস্যা দেখতে পান? লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কি বলেছেন: "আমি মরুভূমির মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।"

ইস্রায়েলীয়দের একটি পছন্দকে বেছে নিতে হয়েছিল। তারা তাদের অতীতের দিকে এবং তাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর দিকে তাকাতে পারতো অথবা ঈশ্বর তাদের জীবনে যা করতে চেয়েছিলেন তার দিকে মনোনিবেশ করতে পারতো। আমরা দেখতে পাই তাদের সামনে ছিল পথ বনাম প্রান্তর এবং নদী বনাম মরুভূমি।

ঈশ্বর আপনার জীবনে যা করতে চান তা আবিষ্কার করতে হলে, আপনার নিজেকে অবশ্যই সেই ভাবে দেখতে হবে যেভাবে ঈশ্বর আপনাকে দেখেন। যদিও ইস্রায়েল অনুভব করেছিল যে তারা যে সকল শাস্তি পাচ্ছে তার যোগ্য তারা ছিল কারণ তারা সেভাবেই পাপপূর্ণ জীবনযাপন করতো। এমনকি তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বর তাদের জন্য আর বেশি কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু তারা ভুল ছিল!!!

আপনি ভাবতে পারেন আপনার অতীতের পরাজয় আপনার জীবনকে একটি মরুভূমিতে পরিণত করেছে কিন্তু সদাপ্রভুর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে আপনার জীবন একটি নদীতে পরিবর্তিত হতে পারে। নতুন নিয়মের রোমীয় ৮:১,২ পদে বলা হয়েছে: "অতএব এখন, যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনদাতা পবিত্র আত্মার যে নিয়ম, তা আমাকে পাপ ও মৃত্যুর নিয়ম

থেকে মুক্ত করেছে।” কলসীয় ১:২১,২২ পদে বলা হয়েছে, “আর এক সময়ে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরবর্তী ছিলে এবং তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের মনে শত্রুভাব ছিল ও তোমরা দুষ্কর্ম করছিলে, তোমাদের তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করলেন, যেন তোমাদেরকে পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ করে নিজের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন।”

আপনার জীবনে ঈশ্বর কি চান তা আবিষ্কার করার জন্য আপনাকে আপনার জীবনের সম্ভাবনাগুলোকে অবশ্যই দেখতে হবে যেভাবে ঈশ্বর সেগুলোকে দেখেন। তিনি বলেন, “আমি মরুভূমির মধ্যে পথ করে দেব ...”। ঈশ্বর আপনার জীবনের মরুভূমিময় জায়গাগুলোকে আশীর্বাদের এবং প্রাচুর্যের ভূমিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। ঈশ্বর মানুষের একটি শুকিয়ে যাওয়া ব্যর্থ জীবনকে তুলে নিতে পারেন এবং তাকে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং অনুগ্রহপূর্ণ জীবনে রূপান্তরিত করতে পারেন। পৌল ২ করিন্থীয় ৩:১৭,১৮ পদে বলেছেন: আর প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেখানে স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর মহিমা আয়নার মত প্রতিফলিত করতে করতে মহিমা থেকে মহিমা পর্যন্ত যেমন তা প্রভু থেকে, অর্থাৎ আত্মা থেকে হয়ে থাকে, তেমনি সেই প্রতিমূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হচ্ছি।” ঈশ্বর আপনার জীবনে যে নতুন কাজটি করতে চান সেটিকে গ্রহণ করার সর্বোচ্চ ধাপটি হল নিজেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কাছে উৎসর্গ করা। ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তাঁর মন প্রস্তুত করেছেন তাঁর লোকদের জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তিনি ইস্রায়েলকে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে বের করে আনার জন্য এবং আশীর্বাদের ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য

পরিচালনা করবেন। কিন্তু এটা তাদের ওপর নির্ভর করেছিল যে, ঈশ্বর তাদের কাছে যে প্রস্তাব করেছিলেন তা তারা পালন করবে কিনা। যদি তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করতো, ঈশ্বর তাদের যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করতো, তাহলে তারা তাদের বন্দীদশার মধ্যেই নিজেদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত। পবিত্র শাস্ত্র বলে, "দেখ আমি এক নতুন কার্য করব, তা এখনই অঙ্কুরিত হবে; তোমরা কি তা জানবে না? এমন কি, আমি প্রান্তরের মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।" ঈশ্বর এর মধ্যেই একটি নতুন নির্দেশনা এবং একটি নতুন উদ্দেশ্য আপনার জীবনের স্থাপন করেছেন– আপনি কি তাঁকে অনুসরণ করবেন?

আসুন দায়ূদ পবিত্র গীত ৯৫:৭,৮ পদে যা বলেছেন তার দিকে মনযোগ দিই। তিনি বলেছেন: "কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর, আমরা তাঁর চরাণির প্রজা ও তাঁর হাতের মেষ। আহা! আজই তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোন! নিজ নিজ অন্তর কঠিন করো না, যেমন মরীবায়, যেমন মরুভূমির মধ্যে মঃসার দিনে করেছিলে।"

আমাদের সকল পাঠকবর্গ, আমাদের সকল খ্রীষ্টান বিশ্বাসীবর্গকে আমাদের আহ্বান, আসুন আমরা পেছনের সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে বিশ্বাস ও নতুন আশা নিয়ে সামনের পথে চলতে অগ্রসর হই। নিশ্চয়ই ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের এক উন্নত জীবন, এক মহিমাময় জীবন দান করবেন যাতে তিনি নিজেই মহিমান্বিত হবেন। তবে সিদ্ধান্ত আপনার যদি আমরা ঈশ্বরের অবারিত আশীর্বাদ লাভ করতে চাই। নতুন পথে, নতুন জীবনে, নতুন আত্ম-বিশ্বাসে আসুন আমাদের সময়গুলোকে কাটাই। আমেন।

যুগে যুগে ঈশ্বর যাদের আহ্বান করেন তাঁর সেবা করার জন্য . . .

“তিনিই আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করেছেন।” (২ তীমথিয় ১:৯)

“কিন্তু যিনি আমাকে আমার মায়ের গর্ভ থেকে পৃথক করেছেন এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করেছেন।” (গালাতীয় ১:১৫)

সৃষ্টির পর থেকেই এটা লক্ষ্যণীয় যে, ঈশ্বর মানুষের মধ্য দিয়ে কাজ করেন ও মানুষের জন্য কাজ করেন। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি যুগে যুগে তাঁর বাছাই-করা লোককে তুলে ধরেন যেন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। যে সমস্ত লোকদের তিনি বেছে নেন তারা যে সমাজে বিশেষ কেউ প্রথমত তা পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু তাঁর মনোনয়ন ও তাঁর কাজে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি কাঙ্খিত মানুষে রূপ নেন। লোক-সমাজে তিনি বিখ্যাত কেউ হয়ে উঠেন আর তখন আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই সেই মানুষটি বিশেষ কাজের জন্য ঈশ্বরের আহ্বানপ্রাপ্ত লোক ছিল।

আহ্বান সম্পর্কে আমাদের অনেক অস্পষ্টতা আছে। এই অস্পষ্টতা অনেক কাল ধরেই চলে আসছে। এর মূল কারণ হল এটাকে চোখে দেখা যায় না। এ যুগে এটা বেশিরভাগ সময়েই উপলব্ধির ব্যাপার আর আমরা অনেক সময়ই এই উপলব্ধিকে আমাদের ইহজাগতিক সুবিধার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি।

একটা বিষয় ভেবে দেখবেন আজকাল যারা প্রভুর ক্ষেত্রে কাজ করতে আকৃষ্ট হয় তাদের বেশীরভাগই অন্য কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না বলেই তারা প্রভুর কাজ করার আহ্বান পেয়েছেন বলে ভান করেন। কারণ এর মধ্য দিয়ে সে সহজেই একটা আর্থিক সংস্থানের সমাধান করতে সক্ষম হয়ে উঠেন। আর সহজ কাজ পেয়ে গেলে কেউ সাধারণত কষ্টের কাজ, মেধার কাজ, সৃষ্টির কাজ করতে চান না। আর আমাদের দেশে যেখানে কাজের স্বল্পতা রয়েছে সেখানে এই ধরনের বিষয়গুলো বেশি প্রকট হয়ে উঠে। আহ্বান সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণাও আমাদের মধ্যে আছে। পবিত্র শাস্ত্রের দু'একটি পদ বা দু'একটি ঘটনাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে চেষ্টা করি– বিশেষ করে যখন আমাদের আহ্বান নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে। আমরা পবিত্র শাস্ত্রে সমন্বিত শিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটা আলোকপাত করতে চাই না– যেখান থেকে একটি সত্যি ও স্বচ্ছ শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের অবস্থানকে পরিষ্কার করতে পারি।

আজকের আলোচনায় আমরা মোটামুটি একটি ধারণা দিতে চেষ্টা করব যেন আহ্বান সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা আমরা লাভ করতে পারি।

আহ্বান কি?

অক্সফোর্ড ডিকশনারীর ভাষায়: একটি বিশেষ কাজের বা দায়িত্বের জন্য জোরালো ইচ্ছা বা অনুভূতি, বিশেষ করে যা আপনি অন্য ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য করতে চান। পবিত্র বাইবেলের ভাষায়: আমরা ঈশ্বরের আহ্বান সম্পর্কে তিনটি বাক্যে প্রকাশ করতে পারি:

- বিশেষ কাজের জন্য সদাপ্রভু যখন কোন ব্যক্তিকে ডাক দেন, বেছে নেন।
- ঈশ্বর তাঁর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাক দেন।
- ঈশ্বর তাঁর দয়া গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেন।

পবিত্র বাইবেলের যে সব ব্যক্তিবর্গকে ঈশ্বর আহ্বান করেছিলেন:

পবিত্র শাস্ত্রে আহ্বানের অনেক ঘটনাই দেখা যায়। এই সমস্ত আহ্বানের মধ্যে ভাববাদী হিসাবে কাজ করার জন্য আহ্বান, রাজা হিসাবে কাজ করার জন্য আহ্বান, যুদ্ধ করে শাস্তি দেবার জন্য আহ্বান অন্যতম। এরপর জাতির মধ্যে সেবামূলক, ধর্মীয় এবং জাতীয় জাগরণের কাজের জন্য আহ্বান দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু আহ্বানের উদাহরণ দেওয়া গেল।

- **অব্রাহামের আহ্বান-** একটি নতুন দেশ দেবার আহ্বান, অনেক জাতির আদিপিতা করার আহ্বান এবং অনেকের আশীর্বাদের শিরম-ণি হবার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের আহ্বান পেয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি বিশ্বাসের আদিকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

- **মোশির প্রতি আহ্বান-** একটি জাতির মুক্তির জন্য আহ্বান, ফরৌণের বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য এবং একটি জাতির পিতা হবার জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। পরিশেষে তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ও ফৌরণের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। পরিশেষে এই ইস্রায়েল জাতি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা দেশে একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে বাস করতে শুরু করে।
- **ইস্রায়েলকে একটি জাতি হিসাবে** আহ্বান করেছিলেন। এই আহ্বান কোন বিশেষ ব্যক্তিবিশেষের জন্য করা হয় নি কিন্তু সামগ্রিক অর্থে একটির জাতির জন্য করা হয়েছে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন এই জাতি সমগ্র বিশ্বের জাতিদের মধ্যে একটি মডেল হয় এবং তারা সমস্ত জাতির মধ্যে একটি পুরোহিতের জাতি হয়।
- **হারোণের বংশকে** আহ্বান করা হয়েছিল যেন তারা ইস্রায়েল জাতির লোকদের পুরোহিত হয়ে তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন।
- **হুরের পুত্র বৎসেললকে** আহ্বান করা হয়েছিল বিশেষ কিছু সূক্ষ্ম কাজ করার জন্য যেন তিনি আবাস-তাম্বু ও মন্দিরের বিশেষ ডিজাইন-কাজ, বিশেষ কারুকাজ করেন ও অন্যদের পরিচালনা দেন।
- **শমূয়েলকে আহ্বান** করা হয়েছিল যেন তিনি পুরোহিত এলির পরবর্তীতে পুরোহিতের কাজ করতে পারেন ও ইস্রায়েল জাতিকে একজন উপযুক্ত বিচারকর্তা হিসাবে নেতৃত্ব দিতে পারেন ও ইস্রায়েলীয়দের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব গঠন করতে পারেন। তিনি প্রথম রাজার অভিষেক করেছিলেন এবং ঈশ্বরের মনের মত

মানুষের অভিষেক করেছিলেন যেন তিনি ইস্রায়েলীয়দের নেতৃত্ব পদে আরোহণ করেন।

- **শৌলকে আহ্বান** করা হয়েছিল যেন তিনি ইস্রায়েলীয়দের প্রথম রাজা হন।
- **দায়ূদকে আহ্বান** করা হয়েছিল যেন তিনি তাঁর মনের মত মানুষ হন, রাজা হিসাবে খ্রীষ্টের পূর্বপুরুষ হন।
- **শলোমনকে আহ্বান** করা হয়েছিল যেন তিনি মন্দির নির্মাণ করতে পারেন। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের জন্য একটি শান্তির রাজ্য, সমৃদ্ধির রাজ্য দান করেছিলেন।
- **ভাববাদী যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেলকে** আহ্বান করা হয়েছিল যেন তাঁরা ঈশ্বরের বাক্য ইস্রায়েলীয়দের কাছে পৌঁছে দেন ও তাদের ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেন। তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়ে তা করেছিলেন।
- **ভাববাদী যোনাকে আহ্বান করা হয়েছিল** যেন তিনি অ-যিহূদী জাতির কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেন। যদিও তিনি তা করতে প্রথমে রাজী হন নি, কিন্তু ঈশ্বর এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যে, তিনি তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এভাবে নীনবী শহর ঈশ্বরের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং লোকেরা তাদের পাপময় জীবন থেকে মন পরিবর্তনের সুযোগ পায়।
- **ঈশ্বর খ্রীষ্টকে আহ্বান করেছেন** যেন তিনি পরিত্রাণের কাজ সাধন করেন। যদিও ঈশ্বর নিজেই মানুষের রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে এসে এই পদের কাজ নিজেই সম্পন্ন করেছেন যেন মানুষ সত্যিকার অর্থেই মুক্ত হয়, স্বাধীন হয় এবং পাপ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে

সত্যিকারের মানুষে রুপান্তরিত হয়।

- **খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদের আহ্বান করেছেন** যেন তাঁরা পরিত্রাণের বাণী প্রথমে যিরূশালেম, যিহূদিয়া, শমরিয়া ও পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন।
- **প্রেরিত পৌলকে আহ্বান** করা হয়েছিল যেন সারা অ-যিহূদী বিশ্ব পরিত্রাণের বাণী শুনতে পায়।

উপরোল্লিখিত উদহারণগুলো যুগ যুগান্তরের কয়েকটি মাত্র। আরও হাজারো ব্যক্তি, রাজ্য ও প্রতিষ্ঠান আছে যাদের ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান করেছেন ও ব্যবহার করেছেন। আজও তিনি সেই একই কাজ করে চলেছেন। আর সেজন্যই ঈশ্বরের আহ্বানের গতিপ্রকৃতি আমাদের ভাল করে জানা দরকার যেন আমরা আমাদের ভুল থেকে সরে আসতে পারি।

যাকে ঈশ্বর আহ্বান করেন তাঁকে তিনি সেই কাজের জন্য প্রস্তুতও করেন। পবিত্র শাস্ত্রে দেখা যায় যে, যুগে যুগে সেই সত্য আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রে একটি মূল নীতি পাওয়া যায় ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে। বলা হয়েছে যে, যদি ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা লাভ করে তবে বুঝতে হবে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে আর যদি তা পূর্ণতা লাভ না করে তবে বুঝতে হবে যে, যে লোক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে সে তার মনগড়া কথা বলেছে। আহ্বানের ক্ষেত্রে ঠিক একই কথা বলা যায়। যিনি আহ্বান করেন তিনি হলেন ঈশ্বর বা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। ঈশ্বর যদি তাঁর কোন বিশেষ কাজের জন্য আমাদের আহ্বানই করে থাকেন তবে সেই কাজ করবার জন্য তিনি আমাদের প্রস্তুত করে তুলবেন। শুধু তাই নয়, সেই কাজের জন্য যত ধরনের

সাহায্য দরকার তিনি সেই সাহায্য যুগিয়েও দেবেন। সেটা যত বড় কাজই হোক বা যত ছোট কাজই হোক। আমি যদি নিশ্চিতভাবেই বুঝে থাকি যে, একটি বিশেষ কাজের জন্য আমার আহ্বান আছে তবে আপনি নিশ্চিত জানুন যে, সেই কাজের জন্য শক্তি ও সামর্থ ঈশ্বরের কাছ থেকে অবশ্যই আসবে। আর যদি না আসে তবে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, এটি আপনার হৃদয়ের ভাবনা ছিল– প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের আহ্বান ছিল না। নিম্নের ঘটনাগুলো থেকে আমরা জানি যে, ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য কিভাবে তাঁর লোকদের প্রস্তুত করেছিলেন ও ব্যবহার করেছিলেন।

- মোশিকে মিসর দেশে প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল যেন তিনি ভবিষ্যতে তাঁর নিজের জাতিকে মুক্ত করে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যেতে পারেন।
- শলোমনের জন্য বিশাল ধন-সম্পদ জোগাড়জন্ত করা হয়েছিল যেন তিনি ঈশ্বরের থাকবার স্থান প্রস্তুত করতে পারেন।
- প্রেরিত পৌলকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রস্তুত করা হয়েছিল যেন ভবিষ্যতে অ-যিহূদীদের মধ্যে প্রচার কাজ ও মণ্ডলী গঠনের কাজ করতে পারেন।

ঈশ্বর একজন খ্রীষ্টানকে কেন আহ্বান করেন? নতুন নিয়মে আমরা দেখতে পাই:

- ঈশ্বর তাঁর প্রিয় লোক হবার জন্য আহ্বান করেন। রোমীয় ১:৭
- ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহ্বান করেন। রোমীয় ৮:২৮
- খ্রীষ্টের সংগে যোগাযোগ বা সহভাগিতা লাভের জন্য আহ্বান

করেন। ১ করিন্থীয় ১:৯

- যারা এখনও বন্দী তাদের স্বাধীন হবার জন্য আহ্বান করেন। ১ করিন্থীয় ৭:২২
- উপযুক্ত হয়ে চলবার জন্য আহ্বান করেছেন। ইফিষীয় ৪:১
- পরিত্রাণ পাবার জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের মহিমার ভাগী হবার জন্য আহ্বান করেছেন। ২ থিষলনীকীয় ২:৪
- পবিত্র হবার জন্য আহ্বান করেছেন। ১ পিতর ১:১৫
- খ্রীষ্টের মত চলবার জন্য আহ্বান করেছেন। ১ পিতর ২:২১
- ভক্তিপূর্ণ জীবন কাটাবার জন্য আহ্বান করেছেন। ২ পিতর ১:৩

ঈশ্বর কাদেরকে আহ্বান করেন? যুগে যুগে আমরা দেখেছি যে, তিনি তাঁর মনোনীত লোক, যাদের তিনি তাঁদের জন্মের আগেই বা মাতৃগর্ভ থেকে বেছে রেখেছেন, বিশেষ বিশেষ সময়ে চিহ্নিত করেছেন, তাদের তিনি তাঁর বিশেষ কাজ করার জন্য আহ্বান করে থাকেন। এই রকম লোকদের তিনি বিশেষ কোন পরিবেশে বড় করে তোলেন, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে যোগ্য করে তোলেন এবং এক বিশেষ সময়ে তাদের আহ্বান করেন নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য। আমরা দেখতে পাই সেই কাজে তারা ফলবান হন এবং এক বিশাল সময় ধরে তাদের কাজের ফলে লোকদের জীবন উপকৃত হয় এবং আমাদের প্রভু গৌরাবান্বিত হন।

কেন ঈশ্বর আহ্বান করেন? আমরা দেখতে পাই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ঈশ্বর আহ্বান করেন। বিশেষ করে মণ্ডলীর যুগে এই

কাজের ক্ষেত্র অনেক বড় এবং এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য যুগে যুগে লোকদের তৈরি করেছেন এবং তারা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সুখবর বয়ে নিয়ে গেছেন। অনেকে এই কাজ করতে করতে সাক্ষ্যমর হয়েছেন এবং এই সাক্ষ্যমরের মধ্য দিয়েও প্রভু গৌরবান্বিত হয়েছেন।

পুরাতন নিয়মের আহ্বান ও নতুন নিয়মের আহ্বানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

পুরাতন নিয়মে আহ্বানকে দেখা যায় নেতৃত্ব দেবার জন, রাজা হবার জন্য, যুদ্ধ করার জন্য ভাববাদী হবার জন্য, দক্ষতাসম্পন্ন কাজ করার জন্য, ইত্যাদি। আর নতুন নিয়ম বা নতুন নিয়মের আহ্বান পুরোটাই সুখবরকে উপলক্ষ্য করে। সারা পৃথিবীর লোকদের মুক্তির লক্ষ্যে, গ্রেইট কমিশনের লক্ষ্যে, ঈশ্বরের রাজা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি যুগে যুগে লোকদের তুলেছেন, প্রস্তুত করেছেন এবং কাজে লাগিয়েছেন। যুগের ইতিহাসে আমরা এর লক্ষ লক্ষ প্রমাণ পাই। এর মধ্যে আছে– নিপিরিত মানুষের মুক্তি, যারা নানা রকম বন্দীত্বের মধ্যে আছে তাদের মুক্তি, যারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আছে, যারা নানা রকম দুঃখ-দুর্দশায় আছে তাদের মুক্তি এবং তাদের মুক্ত করে সুখবরের কাছে নিয়ে আসা, যাতে তারা প্রভুর দত্ত পরিত্রাণ গ্রহণ করতে পারে।

এজন্য সুখবর প্রচার, মণ্ডলী গঠন, এবং এজন্য যে সব সাপোর্ট বেইজড কাজ আছে তা করার জন্য আহ্বান আমরা লোকদের জীবনে দেখতে পাই। যাদের তিনি আহ্বান করেছেন তাদের তিনি যোগ্য করেও তুলেছেন এবং আহ্বান প্রাপ্তগণ তাদের জীবন দিয়ে সেই

আহ্বানের মূল্য দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য দিয়ে প্রভু গৌরবান্বিত হয়েছেন।

প্রভু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে বেছে নিয়েছেন যাঁরা এই মণ্ডলীর যুগে বারো রকমের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা তাদের জীবনে তাঁদের আহ্বানকে বুঝতে পেরেছেন যে এই আহ্বান প্রভুর কাছ থেকে এসেছে এবং তাঁরা তাঁদের সব কিছু ফেলে আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। এই বারো জন প্রেরিত সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন।

যাদের প্রভু আহ্বান করেন তাদের প্রয়োজন মিটাবার দায়িত্ব কার? আমরা অনেক সময়েই প্রভু আমাদের অমুক কাজে আহ্বান করেছেন এই কথা বলে অন্যের কাছে সেই কাজের প্রয়োজন মিটাবার ভার চাপিয়ে দেই বা একজন থেকে অন্যজনের কাছে সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খুঁজি। কিন্তু প্রভু যখন কাউকে আহ্বান করেন তখন এর জন্য যে রিসোর্স প্রয়োজন তা দেবার দায়িত্ব প্রভুর। আমাদের প্রভুর কাছেই তা চাইবার দরকার এবং আমি নিশ্চিত যে, তিনি তা অবশ্যই দিবেন, কারণ তিনি সেই কাজে আমাদের প্রেরণ করেছেন। কিন্তু যদি তিনি তা না দেন তবে আমি আবারও বলছি যে, প্রভু ডেকেছেন বলে আমি যা বিশ্বাস করেছিলাম তা ছিল আমার অন্তরের ছলনা। প্রকৃত অর্থে প্রভু আমাকে তা করতে বলেন নি।

- পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের পাঠিয়েছেন এবং তাদের কোন অভাব হয়েছে বলে দেখা যায় নি।
- যাদের যুদ্ধে পাঠিয়েছেন তাদের শক্তির কোন অভাব হয় নি।
- তিনি শিষ্যদের পাঠিয়েছেন এবং তাদের কোন অভাব হয় নি।

♦ তিনি পৌলকে পাঠিছেন তাঁর কোন অভাব হয় নি।

প্রভু নানা রকম কাঠামো তৈরি করেছেন যার মধ্য দিয়ে যাদের তিনি আহ্বান করেন তাদের জন্য ব্যবস্থা করে থাকেন যাতে যেজন্য আহ্বান করা হয়েছে সেই কাজ চলতে থাকে।

উপসংহার: যে কোন বড় কাজের পিছনে মহান ঈশ্বরের আহ্বান দেখা যায়। যে কাজগুলো যুগের যুগের যুগ টিকে থাকে এবং সেই সব কাজের মধ্য দিয়ে যিনি কাজ করেন তিনি নন কিন্তু আমাদের প্রভু গৌরবান্বিত হন। যে কাজে প্রভু গৌরবান্বিত হন না সেই কাজ যতই বড় কাজ হোক না কেন তা প্রভুর আহ্বানে হয় নি এবং তাতে প্রভুর শক্তিও পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের কাজে প্রভু গৌরবান্বিত হোন এটাই আমাদের বড় প্রার্থনা। আমেন।

সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টিকর্তার তত্ত্বাবধান: মানুষের প্রতি তাঁর মনোযোগ ...

“আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্মিত আকাশমণ্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারা নিরীক্ষণ করি, (বলি), মানুষ কি যে, তুমি তাকে স্মরণ কর? মানুষ সন্তানই বা কি যে, তার তত্ত্বাবধান কর?” (গীতসংহিতা ৮:৩,৪ পদ)

সাভার ট্রোজেডি আমাদের সকলের মনকেই সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। মানুষের জন্য মানুষের আকুতি, উদ্ধার তৎপরতায় সাধারণ মানুষ সহ সর্বস্তরের লোকের অংশগ্রহণ সত্যিই যেন আমাদের মৃত মনুষ্যবোধকে আবার একটুকু জাগিয়ে দিয়ে গেল। টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন আমাদের চোখের জল আর বুকের হাহাকার এক হয়ে গেল।

এত কিছুর পরও আমরা একরাশ আশা নিয়ে বেঁচে থাকি। আবার ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয়ে সব কিছু নিয়ে অগ্রসর হই এবং কালের পরিক্রমায় হয়তো সব কিছু ভুলে গিয়ে থাকি। এসব দেখে সত্যিই প্রশ্ন উঠে সত্যিই কি আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কোন মনোযোগ আছে? তিনি কি

সত্যিই আমাদের জন্য কোন চিন্তা করেন? আমরা হয়তো সাধারণভাবে কোন চিন্তা না করেই বলে থাকি, ঈশ্বর কি এই দূর্ঘটনাকে থামিয়ে দিতে পারতেন না? পারতেন না কি এতগুলো জীবন রক্ষা করতে? আবার অনেকে হয়তো আমরা ভাগ্যের লিখন বলে সমস্ত দায়ভার ঈশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকেই এই দূর্ঘটনার জন্য দায়ী করে থাকি।

শলোমনের কথা থেকে আমি শুধু এতটুকুই বুঝি, যখন তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বর মানুষকে সরল করেই সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষ তার কাজ-কর্ম দ্বারা নিজেদের জটিল করে তুলেছে। এর মানে আমরাই আমাদের সমস্ত কাজের জন্য দায়ী– ঈশ্বর নন। আমাদের লোভ, আমাদের অন্যায়, আমাদের স্বার্থপরতা, অন্যায্যতা, একে অন্যের প্রতি প্রেমহীনতা আমাদের সত্যিকার অর্থেই জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। আমরাই আমাদের উপর বর্ষিত সমস্ত শাস্তির জন্য দায়ী– ঈশ্বর নন।

যাহোক, আজকে আমরা যে শাস্ত্রের অংশটুকু ধ্যান করছি তা কয়েক হাজার বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল যখন পুস্তক সাধারণ লোকদের কাছে ছিল না, আজ যেমন আমাদের অনেকের হাতে আছে। সে সময় মাত্র রাজাদের কাছে এবং মহাপুরোহিতদের কাছে পবিত্র শাস্ত্র ছিল। এছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখনকার নতুন নিয়ম, গীতসংহিতা ও ভাববাদীদের পুস্তকের অনেক পুস্তকও সেই সময় লেখা হয় নি। কিন্তু তবুও লোকেরা ঈশ্বর সম্বন্ধে জানত। মুখে মুখে যে সব শিক্ষা চলে আসছিল বা প্রচলিত ছিল ধর্মশিক্ষকগণ তা দিয়েই লোকদের শিক্ষা দিতেন। এছাড়া তাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে

অভিজ্ঞতা অর্জিত হত তা-ই ছিল তাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরোণের একমাত্র পথ।

দায়ূদ যদি এই গীতটি লিখে থাকেন তবে কোন রকম সন্দেহ ছাড়াই এই কথা বলতে হয় যে, তিনি তাঁর যুবক কালের– তাঁর রাখাল জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বলছেন। তাঁর রাখাল জীবনে যখন তিনি তাঁর পিতার ভেড়ার পাল দেখাশুনা করতেন, তাদের বেথেলহামের পাহাড়ী এলাকায় সেই ভেড়ার পাল চড়াতেন তখন প্রায়ই তিনি মাটির বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ-ভরা তারার দিকে চোখ রেখে তাদের বিশালতায় হারিয়ে যেতেন। সেই মাটির বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর উপরে সীমাহীন আকাশে বিশ্বভ্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকাতেন এবং পূর্ব দিকের পরিস্কার আকাশের দিকে চেয়ে সৃষ্টিকর্তার কথা ভাবতেন। তিনি স্বীকার করতেন যে, ঐ যে মহাকাশ যেখানে চাঁদ ও আকাশের তারারা আছে সে সবই ঈশ্বরের হাতের সৃষ্টি (৩ পদ), তিনি সেই মহাকাশের বিশালত্ব ও সেই সকলের সৃষ্টিকর্তার মহিমা উপলব্দি করে মনের অজান্তেই চিৎকার করে বলে উঠতেন যে, "মানুষ এমন কি যে, তুমি তাকে স্মরণ কর? মানুষের সন্তানই বা কি যে, তুমি তার তত্ত্বাবধান কর?"

যদি সেই তিন হাজার বছর আগে রাখাল বালক দায়ূদের প্রতিক্রিয়া এরকম হয় তবে এই যুগে যখন আমরা মহাকাশ, সৌর জগত, গ্যালাক্সি, নানা গ্রহ-উপগ্রহ যেগুলো কোটি কোট আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি তখন দায়ূদের মত আমাদের আরও কত না গভীরভাবে এই রকম কথা বলা উচিত। যদি একজন

সৃষ্টিকর্তা যাঁকে আমাদের ঈশ্বর বলি সেই মহান সৃষ্টিকর্তা এসব কিছু– যা আমরা দেখতে পাই এবং যা কিছু আমরা দেখতে পাই না তার সব কিছু সৃষ্টি করে থাকেন তবে কত ভক্তিভরেই না তাঁকে আমাদের উপাসনা করা দরকার। আর এটা কত না মহৎ বিষয় যে, সেই মহান ঈশ্বর আমাদের সংগে সম্পর্ক রক্ষা করতে চান– আমাদের ভালবাসতে চান।

আজকে যখন আমরা সেই অসীম স্বর্গলোকের, গ্যালাক্সি ও নানা রকম তারকারাজিকে একজন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হিসাবে দেখতে পাই আর তাদের সৃষ্টিকর্তা অসীম ঈশ্বরের সংগে আমাদের নিজেদের তুলনা করি তবে নিজেদের কত ক্ষুদ্রই না মনে হয়, তাই নয় কি? শুধু আমাদের উপরের জগতে যা আছে তা-ই নয় কিন্তু সূর্যের নিচে এই পৃথিবীতে যে সব জিনিস আছে যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করছি তাদের বিষয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কত মহান– কত গভীর তাঁর জ্ঞান!
আমরা যদি সবচেয়ে ক্ষুদ্র জিনিষ একটি সর্ষে দানা সম্বন্ধে চিন্তা করি তাতেও অবাক না হয়ে পারি না। সর্ষে দানা এত ছোট যে আমরা তাকে কোন জিনিষের মধ্যেই গণনা করি না। অথচ এই কথা ভাবলে অবাক লাগে যে, এতটুকু সর্ষে দানা বর্তমান ইনফরমেশন টেকনোলজির একটি শক্তিশালী হার্ডডিস্কের চেয়েও হাজারগুণ ক্ষমতাবান। এতটুকু একটু সর্ষে দানার মধ্যে আছে তার নিজস্ব জেনারেটিভ পাওয়ার, সৃষ্টিশীল গুণ। যেখানে সমস্ত ইনফরমেশন রক্ষিত আছে যে, এটি তার অনুকূল পরিবেশ পেলে সেই ছোট দানা ফুটে গাছ হবে এবং সেই গাছে আবার সেই একই ধরণের জীবন্ত

হার্ডডিস্কের মত হাজারো বীজ হবে। অর্থাৎ এর সৃষ্টি থেকে মরণ পর্যন্ত সমস্ত ইনফরমেশন এটির মধ্যেই লুক্কায়িত আছে। অথচ আজ এই বিজ্ঞানের যুগে যখন বিজ্ঞানকে ভীষণ শক্তিশালী মনে করা হচ্ছে সেই বিজ্ঞান এতটুক একটি সর্ষে দানা সৃষ্টি করতে পারে না যেখানে এই পরিমান ইনফরমেশন ও জেনারেটিভ পাওয়ার থাকবে। এসব কথা স্মরণ করেই নতুন নিয়মের একজন লেখক, পৌল বলেছেন, “ঈশ্বরের ধন অসীম। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কত গভীর! তাঁর বিচার ও তাঁর সমস্ত কাজ বোঝা অসম্ভব” (রোমীয় ১১:৩৩)।

হ্যাঁ, আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, ঈশ্বরের ধন গণনা করা যায় না, তাঁর জ্ঞান কারও সংগে তুলনা করা যায় না, তাঁর পথ আমাদের জ্ঞানে ধারণ করা যায় না। যখন এই গীতটির লেখক স্বীকার করেছেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি চন্দ্র, সূর্য ও অগণনীয় তারাকারাজির তুলনায় আমরা মানুষেরা অতিমাত্র ক্ষুদ্র, এমন কি, গণনার বাইরে তখন তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, “আমরা মানুষেরা কি যে, তুমি তার তত্ত্বাবধান কর?”

তিনি যখন এই প্রশ্ন করেছেন তখন তিনি তার উত্তর আশা করেন নি কারণ এটি রিটোরিক্যাল কোশ্চেন। এর উত্তর সকলেরই জানা। আর তা হল হ্যাঁ, সত্যি তিনি মানুষের বিষয়ে ভাবেন– সত্যি তিনি তাদের বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন– তাদের যত্ন নেন। আর এটাই হল সুখবর যা আজ আমরা ধ্যান করছি– তিনি মনুষ্য জাতির যত্ন নেন- তত্ত্বাবধান করেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ আছে যে, ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের যত্ন নিতে চান। এমন কি, তিনি আমাদের মধ্যে আমাদের সংগে বাস করতে চান তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে– আমাদের যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে। নতুন নিয়মের মধ্যে আরও গভীর প্রমাণ আছে যে, ঈশ্বর মানুষের প্রতি যত্নশীল, বিশেষ করে যারা তার উপর নির্ভর করে তাদের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁর তত্ত্বাবধান কেমন তা আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে যখন তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের মধ্যে ছিলেন। আমাদের প্রভুর পরে তিনি তাঁর এই যত্নশীল পরিচর্যা তাঁর ভক্তগণ ও মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে করে যাচ্ছেন। সেজন্য আমরা দেখতে পাই পিতর তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, "তোমাদের সব চিন্তা-ভাবনার ভার তাঁর উপর ফেলে দাও, কারণ তিনি তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন" (১ পিতর ৫:৭)।

এরপরেও কোন কোন সময় এটি খুবই প্রশ্নবোধক হয়ে উঠে– প্রশ্ন উঠে যে, সত্যিই কি ঈশ্বর আমাদের যত্ন নেন? সুনামী যখন ১৩টি দেশে আঘাত করে তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? এছাড়াও, লোকেরা যখন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়, দারিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়, মনুষ্য সৃষ্ট নানা রকম দূর্ঘটনার শিকার হয় তখন ঈশ্বর কোথায় থাকেন? এই রকম প্রশ্ন বার বার আমাদের মনে উদয় হয়। আমার মনে হয় একজন মানুষ হিসাবে এই রকম প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা জানি, বেশীরভাগ সময়ে মানুষ নিজেই মানুষের ধ্বংস ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রধান কারণ হয়। মানুষ প্রকৃতিকে নিজের হাতে ধ্বংস করছে। প্রাকৃতিক নিয়মে যা কিছু হবে বলে ঠিক করা আছে আমরা তাকে বাঁধা দেই আমাদের কর্মকাণ্ড

দিয়ে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দিয়ে আমরা প্রাকৃতিক প্রতিশোধকে আমন্ত্রণ জানাই আর আমাদের উপর দিয়ে বয়ে যায় নানা রকম বিপর্যয়।

আমাদের দেশের কাথাই ভাবুন। সাভারের ট্রাজেডির কথাই ভাবুন। যদি দালানটি সঠিকভাবে বানাত, দারান-কাঠো বানাবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সঠিক মাত্রায় দিত তবে কি এই ট্রাজেডি হত? নিশ্চয়ই না। চার তলার ফাউণ্ডেশনে যদি ৮ তলা না বানাত তবে কি এই পরিণতি হত? তবে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কে? সে কি আমরা নই? যে হারে অনয়িম করছি, যে হারে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করছি এবং তাতে পৃথিবীতে যে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে যে ভয়াবহ পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এর জন্য কি ঈশ্বর দায়ী? নিশ্চয়ই না। এর সব দায়-দায়িত্ব আমাদের। আমরাই আমাদের ধ্বংসকে ডেকে নিয়ে আসি।

বরং অন্যভাবে এই কথা বলা যায় যে, একজন বিশ্বাসী হিসাবে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর সত্যিই মানুষের প্রতি যত্নশীল। মানুষ যখন বিপদে পরে তখন তিনি উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসেন তাঁর নানা এজেন্টের মধ্য দিয়ে। আমরা দেখছি তা সব সময়ই ঘটছে। কোন না কোন সাহায্য কোন না কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এগিয়ে আসছে। তখন আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাই যখন দেখি ঈশ্বরের লোকেরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে তাদের সাহায্যের হাত নিয়ে আর ভালবাসার মন নিয়ে। সুনামীর মত ভয়াবহ দুর্যোগের সময় লোকেরা তাদের সর্বস্ব দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ঈশ্বর এরকম ভালবাসা করাই

মানুষের অন্তরে স্থাপন করতে চান যেন তারা মানুষের কথা ভাবে ও তাদের যত্ন নেয়।

হ্যাঁ, এরকম একটি হৃদয় আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চান– আমাদের মধ্যে স্থাপন করতে চান যেন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে আমরা তাঁর যত্নকারী এজেন্ট হতে পারি।

প্রিয় পাঠক, আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের একজন লোক হিসাবে আমাদের একটি বড় দায়িত্ব আছে মানুষকে জানানো যে, সত্যি ঈশ্বর আমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন– আমাদের বিষয় নিয়ে ভাবেন– আমাদের তত্ত্বাবধান করেন। তিনি আমাদের প্রেমময় ঈশ্বর। আমাদের সবারই উচিত তাঁকে জানা এবং তাঁর ছায়া তলে আশ্রয় নেয়া।

ঈশ্বরের সহকর্মী

"ভাল, আপল্লো কি? আর পৌলই বা কি? তারা তো পরিচারকমাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ– যেমন প্রভু এক এক জনকে তাঁর কাজ দিয়েছেন। আমি রোপণ করলাম, আপল্লো জল সেচন করলেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে থাকলেন। অতএব রোপক কিছু নয়, সেচকও কিছু নয়, ঈশ্বরই বৃদ্ধি দিয়ে থাকেন। আর রোপক ও সেচক উভয়েই এক এবং যার যেমন নিজের শ্রম, সে তেমনি নিজের বেতন পাবে। কারণ আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী; তোমরা ঈশ্বরেরই ক্ষেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।" (১ করিন্থীয় ৩:৫-৯)

ঈশ্বরের সহকর্মী! এ এক অতি বড় কথা– তাই নয় কি? যিনি এই বিশ্ব -ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, যিনি শুধু প্রাণী জগত নয়, এমন কি গ্রহ-নক্ষত্রেরও জন্ম দেন ও মৃত্যু ঘটান তাঁর সহকর্মী হওয়া, এ এক বিশাল পাওনা কি নয়? তবুও পবিত্র শাস্ত্রে সেই ব্যক্তিকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছে যারা মণ্ডলী নির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন– যারা সুখবরের বীজ বপন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের মণ্ডলীতে একটি কথা প্রচলিত আছে, যার অন্য কাজ করবার ক্ষমতা নেই সেই সুখবর প্রচারের কাজ করে। অন্য কথায় বলতে গেলে যারা মণ্ডলী-মিশনে কাজ করে প্রায়শই তাদের অন্য কোন কাজ করবার ক্ষমতা বা দক্ষতা নাই বলেই তারা এই পেশায় আসে– সহজ কাজ করতে। অবশ্য আমাদের মনে এই সব ধারণার জন্ম হওয়ার যে কোন প্রেক্ষাপট নেই, তা নয়। কথাগুলো অনেকাংশে সত্যিও বটে তবে পূর্ণ সত্য নয়। হয়তো আমাদের দেশের বিদেশী মিশনারী সমাজ এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবন-

প্রণালী দেখে অনেকের এরকম ধারণা জন্মেছে। কিন্তু যারা এক্ষেত্রে সত্যিই পরিশ্রম করেন– দৃঢ় বিশ্বাসে এগিয়ে যান, খ্রীষ্টের বাণী নিজের জীবনের মায়া না করে অন্যের কাছে তুলে ধরেন কাজে ও কথায়, তারা সত্যি ঈশ্বরের সহকর্মী।

আমরা অনেকেই এক জেনারেশন বা দুই জেনারেশন হল প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি এবং সামাজিক ভাবে খ্রীষ্টান হিসাবে জীবন যাপন করছি। আমরা অনেকেই অনেক বছর যাবৎ প্রভুকে জানতে পেরে, তাঁর সুখবর শুনে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি যেন তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারি। কিন্তু আমরা জানি আমরা নিছক এমনিই স্রোতের টানে ভেসে আসি নি। কারো না কারো কাছে আমরা পরিত্রাণের সুখবর শুনেছিলাম। আমাদের জীবনে কারো না কারো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচর্যার প্রভাব রয়েছে। আমরা অনেকেই শুধু যীশুর কাছে এসে বা তাঁর পরিত্রাণ গ্রহণ করে ক্ষান্ত হই নি, কিন্তু আমরা যেমন পরিত্রাণের বাণীতে পরিপুষ্ট হয়েছি তেমনি অন্যকে পরিপুষ্ট করবার কাজ করছি। আমরা অনেকেই এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছি এবং পরিচর্যার জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে গমন করছি– সেই অভিজ্ঞতা আত্মিক, জাগতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়। এসব অভিজ্ঞতা প্রতিদিন আমাদের পরিপুষ্ট করছে এবং আমরা যে পরিচর্যার কাজ বেছে নিয়েছি সেই কাজে আমাদের আরো ধারালো করে তুলছে। আমরা যে অংশটি নিয়ে আজ ধ্যান করেছি সেখানে অনেকগুলো মূল্যবান বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। প্রভুর ধার্মিকতা-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন তিনি মণ্ডলীকে বেছে নিয়েছেন, তেমনি অনেককে অনেক দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্ববান করেছেন। তিনি কাউকে বীজ রোপক,

কাউকে জল সেচকের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা এসব সুন্দরভাবে করলেও আমাদের এই কর্মের বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বর নিজের হাতে রেখেছেন।

একজন কাজ করলে সে বেতন পাবার উপযুক্ত। যারা সুসমাচার প্রচার করেন পবিত্র শাস্ত্র বলে সেই সুসমাচার থেকেই তাদের জীবন চলবার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগৃহীত হবে– ঠিক যেমন শস্য মাড়াই কালে কোন গরুর মুখে জালতি বাঁধে না। তবে এ কাজ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে হবে। এর মানে যিনি এই কাজ করতে চাইবেন তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের আহ্বানপ্রাপ্ত হতে হবে। যদি তিনি ঈশ্বরের আহ্বানপ্রাপ্ত হন তবে এটা নিশ্চিত যে, তার জীবন-জীবিকা পরিচালনার জন্য সমস্ত কিছু ঈশ্বর যুগিয়ে দেবেন, যেমন তিনি মরুভূমিতে মান্না যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

আজকাল অনেকেই যোগাযোগ করেন একটি প্রচারকের চাকুরি পাওয়ার জন্য। আমি প্রায়শই তাদের প্রশ্ন করি, আপনি কি এই কাজে ঈশ্বরের আহ্বান পেয়েছেন? চাকরিটা পাবার জন্য অথবা সাপোর্ট পাব-ার আশায় অনেকেই হ্যাঁ সূচক কথা বলে থাকেন। আমি সাধারণত তাদের বলে থাকি, নেমে পড়ুন, শুরু করুন, কেন বসে আছেন। উত্তর আসে, কোন সাপোর্ট নাই যে ভাই।

আমি পুনরায় বলি, কেন, এই না বললেন, আপনি ঈশ্বরের আহ্বান পেয়েছেন? ঈশ্বর কি তাঁর কর্মীকে বেতন দিতে অসমর্থ? যদি তিনি অসমর্থ হন তবে কেন তাঁর কাজ করতে চান? যে বেতন দিতে পারে

তার কাজ করুন। কারণ কাজ তো বেতনের জন্য করি। তখন কিছুটা আমতা আমতা সুর তার মুখে শোনা যায়।

আমি এই কথা বলি, কাউকে যদি ঈশ্বর কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য আহ্বান করে থাকেন তবে সেই কাজ সম্পাদন করার যে ব্যয়ভার তা ঈশ্বরই যুগিয়ে দিয়ে থাকেন। তিনি তা যুগিয়ে দিতে সমর্থ। আমাদের এই বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। আহ্বান অনুসারে আমাদের কাজ করে যাওয়া উচিত। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে হাত বাড়িয়ে সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণরূপে মেটাবেন। আমরা হয়তো চিন্তাও করতে পারব না কিভাবে, কেমনভাবে, কোত্থেকে তিনি তা করবেন। তবে তিনি তা করবেন তা নিশ্চিত। তিনি কোনভাবেই ঋণী থাকেন না। সুতরাং যারা সত্যিকার অর্থেই তাঁর আহ্বান পেয়েছেন সুখবর প্রচার করার জন্য অথবা অন্য যে কোন পরিচর্যা-কাজ করার জন্য সামনে পশ্চাতে না তাকিয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কাজে ঝাপিয়ে পড়ুন। ঈশ্বর যেমন আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন একইভাবে আপনার কাজেও অনেক ফসল আসবে।

যারা ঈশ্বরের আহ্বান পেয়ে ঈশ্বরের পরিচর্যা ক্ষেত্রে কাজ করছেন ঈশ্বর তাদের কিছু টাইটেল বা উপাধি দিয়েছেন: তারা

- ঈশ্বরেরই সহকার্যকারী;
- ঈশ্বরেরই ক্ষেত,
- ঈশ্বরেরই গাঁথনি।

প্রথমত: প্রভু তাঁর আহ্বানপ্রাপ্তদের একেক জনকে একেক রকম কাজ

দিয়েছেন, যেমন বীজ রোপক, জল সেচক। আমার ভাবতে ভাল লাগছে যে, প্রভুর কাছে আসবার পর তিনি বিশেষ বিশেষ কাজে আমাদের আহ্বান করে থাকেন। তাঁর ধার্মিকতা-রাজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে আমরা কেউঃ সুখবর প্রচারের কাজ করছি, মণ্ডলী স্থাপনের কাজ করছি, শিষ্য-গঠনের কাজ করছি, আবার কেউ মণ্ডলীকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছি। অবশ্য আরও অনেক কাজ ও অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে তাঁর লোকেরা কাজ করছেন। কিন্তু আমাদের সবাইকে প্রেরিত পৌল বলছেন, কেউ 'রোপক', কেউ 'সেচক', আবার অন্যান্য চিঠিতে আরেকটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন তা হল 'গাঁথক'। তিনি এইভাবে আমাদের কাছে বিনতি জানিয়েছেন, "অতএব প্রভুতে বন্দী আমি তোমাদের কাছে এই বিনতি করছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ তার যোগ্যরূপে চল" (ইফিষীয় ৪:১)। আমরা কেউ পৌলের মত কাজ করছি, আবার কেউ আপোল্লোর মত কাজ করছি। কেউ বীজ বুনছি, কেউ চারার যত্ন করছি। বড় কথা হল আমরা কাজ করছি– ঈশ্বরের জন্য কাজ করছি, ঈশ্বরের সহকর্মী হিসাবে।

আমরা কাজ করছি আমাদের সাধ্যমত, আমরা যতটুকু শক্তি পেয়েছি সেই অনুসারে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কর্মক্ষেত্রে আমাদের কর্মের বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিদাতা স্বয়ং সদাপ্রভু ঈশ্বর নিজে। তিনি নিজের হাতেই এই দায়িত্ব রেখেছেন। তিনিই বৃদ্ধি দিয়ে থাকেন, এবং বৃদ্ধি দিতে থাকেন। কখন? যখন কেউ রোপণ করেন, কেউ সেচন করেন।

অনেক সময় আমরা আমাদের কাজ নিয়ে অহংকার করি– পরিচর্যাকারীরাও তাদের কাজের, সাইজের, মিনিষ্ট্রির অর্থ-সম্পদের

এবং কত বড় চার্চের বা মণ্ডলী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সেই সব বিষয় নিয়ে অহংকার করে। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের অহংকার করার মত কিছু নেই। কারণ এর যা কিছু তা যিনি করেন তা আমরা নই কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর। কিন্তু আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে যে, তাঁর আহ্বান অনুসারে আমাদের কাজের বেতন পাব। কাজ অনুসারে বেতন পাব কারণ তিনি জানেন যে, জীবন-সংসার চলবার জন্য আমাদের বেতনের প্রয়োজন আছে। তবে এখানে ঠিক কর্মফলের কথা বলা হয় নি কিন্তু পরিচর্যা কাজে যে পরিমাণে পরিশ্রম করছি তার ফলের কথা বলা হয়েছে। এই ফলকেই এখানে গাঁথুনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই গাঁথুনি যদি হয় সোনা, রূপা, বহুমূল্য পাথর, কাঠ, খড় ও নাড়া দিয়ে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ প্রকাশিত হবে। কারণ বিচারের দিনই তা প্রকাশ করবে, কেননা সেই দিনের প্রকাশ আগুনের মধ্য দিয়েই হবে; আর প্রত্যেকের কাজ যে কি রকম, সেই আগুনই তার পরীক্ষা করবে। যে যা গেঁথেছে, তার সেই কাজ যদি থাকে, তবে সে বেতন পাবে। বিশেষ করে তারা যে যেরকম কাজ করছেন সেই রকম বেতন তারা প্রভুর কাছ থেকে পাবেন সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আজকের শাস্ত্রের অংশে তিনটি ফ্রেইজ তিনি আমাদের জন্য ব্যবহার করেছেন: সহকার্যকারী, ক্ষেত ও দালান। আজকে সকালে এই কথা ভাবতে ভাল লাগছে যে, আমরা সকলে ঈশ্বরের কার্যকারী, তাঁর সহকর্মী, একই লক্ষ্যে কাজ করছি, আমরা *গডস্ ফেলো ওয়ার্কার।* পৃথিবীর এই সময়ে পৌল নেই, বার্নবাও নেই কিন্তু আমি আপনি আছি

এবং আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জন্য ঈশ্বর আমাকে ও আপনাকে তাঁর সহকর্মী হবার জন্য অভিষেক করেছেন। তাঁর কাজের জন্য আমাদের অভিষেক করা হয়েছে যেন মুক্তির সুসমাচার ঘোষণা করি। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের জন্যই এই কথা বলে– তিনি আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য; তিনি আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, বন্দীদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করতে; অন্ধদের কাছে দৃষ্টিদান ঘোষণা করার জন্য; নির্যাতিতদেরকে নিস্তার করে বিদায় করার জন্য; প্রভু যে বিনামূল্যে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন তা ঘোষণা করার জন্য।

এই জন্যই আমরা তার সহকর্মী, তাঁর ফেলো ওয়ার্কার। আমরা সকলে ঈশ্বরের জন্য এক সাথে কাজ করছি এবং আত্মার পরিত্রাণের জন্য আমরা কাজ করে চলেছি; আর আমাদের ঈশ্বর জানেন যে, তারা তাঁর জন্য যে কাজ করে যাচ্ছে তা মোটেও বৃথা যাবে না।

দ্বিতীয়ত: তিনি বলেছেন আমরা ঈশ্বরের ক্ষেত, you are God's field। ঈশ্বর বলেছেন আমরা তাঁর ক্ষেত, বলেন নি আমরা কাঁটাবন, পাথুরে জমি, আগাছাযুক্ত পতিত জমি, কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত মানে শতভাগ সুন্দর জমি যেখানে শতভাগ ফসল উৎপন্ন হয়। এজন্যই তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, জমি হিসাবে প্রস্তুত করেছেন, সার দেওয়া অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করেছেন যেন এখানে শতভাগ ফসল উপন্ন হয়। আজকে আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, আমরা যে পরিচর্যায় নিয়োজিত আছি ঈশ্বরের ক্ষেত হিসাবে সেখানে শতভাগ ফসল উৎপন্ন হচ্ছে– আমাদের প্রাপ্ত দায়িত্ব অনুসারে। আমরা কেউ বিশ্বাস জন্মাচ্ছি,

কেউ ভালবাসার বৃদ্ধি ঘটাচ্ছি, কেউ মুক্তির বীজ রোপন করছি আর শতভাগ ফসলের আকাঙ্খা করছি। আমরা কেউ সুসমাচার প্রচার করছি, কেউ শিক্ষা দিচ্ছি, কেউ সেবার কাজ করছি, কেউ নেতৃত্বের কাজ করছি, কেউ সংগঠক হিসাবে কাজ করছি, কেউ আশীর্বাদের চ্যানেল হিসাবে কাজ করছি, কেউ আশীর্বাদের চ্যানেলের সঙ্গে অন্যদের যুক্ত করে দিচ্ছি– ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই একটি ভাল ভূমি বা ক্ষেত হিসাবে কাজ করছি যেন শতভাগ ফসল উৎপন্ন হয়।

তৃতীয়ত, আরেকটি ফ্রেইজ আমাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে: God's building - ঈশ্বরের গাঁথুনি বা দালান। আমরা ঈশ্বরের থাকবার জায়গা যেখানে তিনি বাস করেন। প্রকাশিত বাক্যে দেখা যায় যে, যীশু আমাদের মধ্যে থাকতে চান। যোহন বলেছেন যে, তিনি মানুষ হলেন যেন আমাদের মধ্যে বাস করেন। পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছিল যে, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করবেন। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর থাকবেন। আমরা সেই দালান নির্মাণ করছি, অর্থাৎ মানুষ প্রস্তুত করছি যার মধ্যে আমাদের প্রভু বাস করবেন। ঐ পৃথিবীতে তিনি আমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করছেন আর এই পৃথিবীতে আমরা তাঁর থাকবার জায়গা প্রস্তুত করছি। সত্যিই আমার এ কথা ভাবতে ভাল লাগছে। জানিনা পাঠক হিসাবে আপনি কিভাবে নিচ্ছেন।

আমরা একথা পরিষ্কারভাবেই জানি যে, যীশু খ্রীষ্টের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করবার জন্যই আমরা কেউ সুখবর প্রচার করছি, কেউ শিক্ষকের কাজ করছি, কেউ আত্মিক ও জাগতিক উন্নয়নের কাজ করছি, কেউ মন্ডলী স্থাপনের কাজ করছি। আমরা সবাই একই লক্ষ্যে কাজ করছি–

যেন মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আবাস হয়। আর একথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, যখন মানুষ ঈশ্বরবিহীন অবস্থায় থাকে তখন তার অনেক কিছু প্রয়োজন হয় কিন্তু ঈশ্বর যখন মানুষের মধ্যে থাকেন তখন তার সমস্ত প্রয়োজন ঈশ্বর মিটিয়ে থাকেন।

আজকের পবিত্র শাস্ত্রের বাণীর আলোকে কয়েকটি প্রশ্ন আপনাদের চিন্তায় দিতে চাই: আমরা ঈশ্বরের উপযুক্ত সহকর্মী বা সহকার্যকারী হয়েছি তো? আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কাজ করছি তো? আমার সব কাজের মধ্যে ঈশ্বর আছেন তো? আমরা ঈশ্বরের ক্ষেত তো? ক্ষেত হয়ে থাকলে কেমন ক্ষেত? উর্বর, নাকি কাঁটাবন, নাকি পাথুরে জমি। আমার মধ্যে ঈশ্বর তাঁর বীজ বপন করে খুশি তো? আমরা ঈশ্বরের উপযুক্ত ঘর তো? তিনি আমার মধ্যে বাস করে আমার সহভাগিতা তিনি পাচ্ছেন তো? আমাকে নিয়ে তিনি আরামে আছেন তো? ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তি জীবনে, মণ্ডলীক জীবনে, সমাজ জীবনে থাকতে চান।

আমরা যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসীদের নিয়ে নিয়ে এমন একটা সমাজ সৃষ্টি করতে চাই যেখানে ঈশ্বর বাস করবেন। আর আমরা তাঁর সঙ্গে শান্তিতে থাকব। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে দয়া দান করুন। আমেন।

মল্কীষেদক ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট

“এই “শালেমের রাজা মল্কীষেদক, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুরোহিত, যিনি, অব্রাহাম যখন রাজাদের হারিয়ে দিয়ে ফিরে আসলেন, তিনি তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন”, এবং অব্রাহাম তাঁকে “সমস্ত জিনিসের দশ ভাগের এক ভাগ” দিলেন। প্রথমে তাঁর নামের তাৎপর্য হল, তিনি “ধার্মিকতার রাজা”, পরে “শালেমের রাজা”, অর্থাৎ “শান্তিরাজ”; তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশাবলিও নেই, আয়ুর আদি বা জীবনের অন্ত নেই; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের মত; তিনি চিরকালের পুরোহিত” (ইব্রীয় ৭:১-৩ পদ)।

যীশু খ্রীষ্টকে আমরা সবাই জানি কারণ তিনি মাত্র ২০০০ বছর আগে এই পৃথিবীতে ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আমরা পঞ্চপুস্তক, গীতসংহিতা, ভাববাদীদের পুস্তক ও নতুন নিয়মে দেখতে পাই। এছাড়া আমরা যারা খ্রীষ্টান, আমাদের বিশ্বাসের মধ্যমণিও তিনি আর সেকারণেই আমাদের তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে হয়। তাঁকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা আমাদের মণ্ডলীর উপাসনা-সভাগুলোতে হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যে মহা-পুরোহিতের কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করছি তাঁর ঘটনা সুদূর অতীতে– অব্রাহামের সময়কালে।

আমরা সকলেই জানি যে, যীশু খ্রীষ্টের অনেকগুলো টাইটেল আছে।

এই সমস্ত টাইটেলগুলো উচ্চারণপূর্বক আমরা তাঁর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করে থাকি। তাঁর সেই সমস্ত টাইটেলগুলোর মধ্যে একটি টাইটেল হল তিনি আমাদের "মহাপুরোহিত" যিনি নিজের রক্ত নিয়েই মহা-পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছেন যেন তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন।

কিন্তু পুরাতন নিয়মে আরেক জনকে মহা-পুরোহিতের কথা বলা হয়েছে যিনি মোশির ব্যবস্থার মহাপুরোহিতীয় কার্যবলির পূর্বের– যিনি যীশু খ্রীষ্টের মত একইভাবে মোশির ব্যবস্থার নিয়মের বাইরে ছিলেন। এমন কি মোশির আইন-কানুন দেবার আগেই তিনি মহাপুরোহিত বলে খ্যাত হয়েছেন এবং নতুন নিয়মে যীশু খ্রীষ্টের মহা-পুরোহিতের পদের আলোচনা করতে গিয়ে ইব্রীয় পত্রের লেখক বেশ সুন্দর ভাবেই সেই মহা-পুরোহিতের কথা বলেছেন যার সংগে যীশু খ্রীষ্টের মিল রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে কে এই মহাপুরোহিত ছিলেন যার সঙ্গে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তুলনা করা হয়েছে? আজকের আলোচনায় আমরা সেই মহাপুরোহিত সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

প্রকৃত অর্থে আমরা সেই মহাপুরোহিত সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানি না। পবিত্র শাস্ত্রে খুব অল্পই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে। হ্যাঁ তিনি ছিলেন মল্কীষেদক। দায়ূদ তাঁর গীত ১১০:৪ পদে এই মল্কীষেদকের কথা তুলে ধরেছেন যখন তিনি খ্রীষ্টের মহাপুরোহিতত্বেও কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেছেন: "সদাপ্রভু শপথ করলেন, অনুশোচনা করবেন না, তুমি অনন্তকালীন পুরোহিত, মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে।"

অবশ্যই আমরা মল্কীষেদকের সম্পর্কে বলতে গেলে এক প্রকার অন্ধকারেই রয়েছি। আমরা তাঁর সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি আদিপুস্তক ১৪ অধ্যায়ে অব্রাহামের এক যুদ্ধ জয়ের সম্পর্কীত ঘটন-াবলীতে। সেখানে আমরা দেখতে পাই অব্রাহাম তাঁকে যুদ্ধে লুট করে আনা ধন-সম্পত্তির দশ ভাগের একভাগ তাঁকে দিয়েছিলেন এবং মল্কীষেদক অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

আজকের এই আলোচনায় আমরা তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পাব, যাতে করে এই মল্কীষেদক আমাদের কাছে আরও জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতে পারেন। পবিত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে অনেকে তাঁকে একজন স্বর্গদূত বলে কল্পনা করে থাকে, অন্যরা বলে থাকে তিনি কোন এক পবিত্র আত্মা ছিলেন কিন্তু তাঁর বিষয়ে যে সমস্ত মতামত আমরা পেয়ে থাকি তা আমাদের বিবেচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার খোরাক হিসাবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। পবিত্র শাস্ত্রের চিন্তাবিদগণ তিন জন ব্যক্তিকে মল্কীষেদকের ব্যক্তিত্বের সাথে সবচেয়ে মানানসই বলে মনে করেছেন:-

১) অধিকাংশ যিহূদী ধর্মীয় সাহিত্যিক মনে করে থাকেন যে, মল্কীষেদক ছিলেন নোহের পুত্র সামের পুত্র, যিনি ছিলেন তাঁর বং-শধরদের রাজা এবং পুরোহিত, যা পূর্বপুরুষ প্রথার পরিবর্তে প্রচলিত হতে শুরু করে। কিন্তু এটি সম্ভব নয় যে, তিনি এভাবে তাঁর নাম পরিবর্তন করবেন। পাশাপাশি আমাদের এমন কোন ইতিহাস জানা নেই যে, তিনি কনান দেশে কখনো বসবাস করে ছিলেন। অথচ আমরা যে মহা-পুরোহিতের কথা বলছি তিনি শালেমের রাজা ছিলেন।

২) অনেক খ্রীষ্টান সাহিত্যিক মনে করে থাকেন যে, তিনি স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, যিনি অব্রাহামের বিশেষ সৌভাগ্য লাভের জন্য স্বশরীরে হাজির হয়েছিলেন তাঁর সামনে এবং তিনি অব্রাহামকে তাঁর এই 'মল্কীষেদক' নাম উল্লেখ করেছিলেন, যা খ্রীষ্ট হিসেবে বেশ মানানসই, বিশেষ করে যোহন ৮:৫৬ পদে বলা হয়েছে: "অব্রাহাম তাঁর দিন দেখেছিলেন এবং আনন্দ করেছিলেন।" এই মতামতের প্রেক্ষিতে অনেক কথা বলা যেতে পারে এবং এখানে যা বলা হয়েছে তা হয়তো বা কোন সাধারণ মানুষের মতের সাথে নাও মিলতে পারে, কিন্তু তাহলে খ্রীষ্টকে তাঁর নিজের প্রতীক হিসেবে রূপ ধারণ করাটা বেশ অবাক হওয়ার মত বিষয় বলে মনে হবে।

৩) সবচেয়ে সাধারণ মত হল, তিনি ছিলেন একজন কনানীয় রাজা, যিনি শালেমে রাজত্ব করছিলেন এবং তিনি প্রকৃত সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতেন ও তাঁর অনুগত ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের একজন প্রতি-রূপ হিসেবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি সেভাবেই অব্রাহাম কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন।

কিন্তু আজকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো যে, ইব্রীয় পত্রে লেখক তাঁর সম্পর্কে কী বলার চেষ্টা করেছেন এবং কীভাবে খ্রীষ্টকে সেখানে প্রতি-রূপ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে (১-৩ পদ)।

মল্কীষেদক ছিলেন একজন রাজা:

আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টও তাই ছিলেন– এমন একজন রাজা যিনি ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁর স্কন্ধে তিনি শাসনভার অর্পণ করেছেন এবং তিনি তাঁর লোকদের মঙ্গলের জন্যই শুধু কাজ করে

থাকেন।

মল্কীষেদক ছিলেন ধার্মিকতার রাজা:

তাঁর নাম বিশেষভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে তা হচ্ছে ধার্মিকতার রাজা। যীশু খ্রীষ্ট একজন ন্যায়বান এবং ধার্মিক রাজা– তিনি তাঁর উপাধিতে ন্যায়বান এবং তিনি তাঁর শাসন কাজে ধার্মিক। তিনি আমাদের ধার্মিকতার প্রভু; তিনি সকল প্রকার ধার্মিকতা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি চিরস্থায়ী ধার্মিকতা বয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি ধার্মিকতা ও ধার্মিক মানুষকে ভালবাসেন এবং অনৈতিকতা ও অধার্মিকতা ঘৃণা করেন।

মল্কীষেদক ছিলেন শালেমের রাজা:

যার অর্থ শান্তির রাজা; তিনি ধার্মিকতার প্রথম রাজা এবং এরপর তিনি শান্তির রাজা। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টও তাই; তিনি তাঁর ধার্মিকতার মধ্য দিয়ে শান্তি এনেছেন, ধার্মিকতা ও শান্তির ফল তিনি আমাদেরকে দান করেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের শান্তির কথা বলেন, শান্তি সৃষ্টি করেন এবং তিনিই আমাদের শান্তি দাতা।

মল্কীষেদক ছিলেন সর্বোচ্চ মহান ঈশ্বরের পুরোহিত:

যিনি বিশেষভাবে তাঁর অ-যিহূদীদের মধ্যে তাঁর এই পুরোহিতের কাজের জন্য যোগ্য ও সক্ষম বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। আমাদের প্রভু যীশুর তাই; তিনি সর্বোচ্চ ঈশ্বরের সবচেয়ে মহান পুরোহিত এবং অ-যিহূদীদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে আসতে হলে তাঁর মধ্য দিয়ে আসতে হবে। এটিই একমাত্র পথ, এই পৌরহিত্যের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের পুনর্মিলন ও ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক

পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হই।

তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশ-তালিকা নেই, আয়ুর আদি বা জীবনের অন্ত নেই:

এখানে এই বিষয়টি আক্ষরিকভাবে বুঝলে চলবে না; কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র তাঁকে বিশেষভাবে একজন অবিস্মরণীয় ও অসাধারণ মানুষ হিসেবে দেখিয়েছে, যার কোন বংশ তালিকা আমাদেরকে দেওয়া হয় নি, যাতে করে তিনি যীশু খ্রীষ্টের একজন যোগ্য প্রতিরূপ হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হতে পারেন, যিনি এমন একজন মানুষের মত হবেন যার কোন পিতা নেই, যিনি ঈশ্বরের মত হবেন যার কোন মাতা নেই; যার পৌরহিত্যের কোন বংশ তালিকা নেই, তিনি তাঁর কাছ থেকে অন্য কোন সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য উত্থিত হন নি, কিংবা তাঁর কাছ থেকে অন্য কোন সত্ত্বার জন্ম হবে না, বরং তিনিই ব্যক্তি হিসেবে চিরকাল অক্ষুন্ন থাকবেন।

অব্রাহাম উত্তম উত্তম লুটদ্রব্য নিয়ে ফেরার পথে তার সাথে দেখা করেছিলেন এবং তিনি অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন:

এই ঘটনাটি উল্লিখিত রয়েছে আদিপুস্তক ১৪:১৮ পদে। তিনি অব্রাহাম ও তার দাসদেরকে আপ্যায়ান করার জন্য রুটি ও আঙ্গুর রস দিয়েছিলেন, কারণ তারা সকলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাদেরকে তা দিয়েছিলেন একজন রাজা হিসেবে এবং একজন পুরোহিত হিসেবে তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এভাবেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিভিন্ন আত্মিক প্রয়োজনের সময় তাঁর লোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন। তিনি তাদেরকে সঞ্জীবিত করে

তোলেন, তাদেরকে নতুন শক্তি দেন ও তাদেরকে আশীর্বাদ করেন।

অব্রাহাম মল্কীষেদককে সমস্ত কিছুর দশ ভাগের এক ভাগ দিয়েছিলেনঃ
এর অর্থ হচ্ছে, লেখক যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সে অনুসারে, সকল লুটদ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ। আর অব্রাহাম এই কাজ করেছিলেন তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে, মল্কীষেদক তাদের জন্য যা করেছিলেন তার জন্য, কিংবা বলা যায় এটি ছিল একজন রাজা হিসেবে মল্কীষেদকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশের নিদর্শন, কিংবা এ যেন ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ প্রকাশের জন্য পুরোহিতের কাছে নিয়ে আসা উপহার। আর এভাবেই যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে যত ধন সম্পদ এবং সুখ ও ঐশ্বর্য লাভ করেছি তার জন্য আমাদের উচিত তার প্রতি আমাদের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার উপহার ঘোষণা করা। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁকে আমাদের রাজা হিসেবে সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা ও অধীনতা স্বীকৃতি জানাতে হবে এবং আমাদের সকল দান ও উপহার তার হাতে উপস্থাপন করতে হবে, তাঁকে আমাদের নিজেদের উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও সমস্ত অধীনতা প্রকাশ করতে হবে।

এই মল্কীষেদক ছিলেন মনুষ্যপুত্রের মতই এবং তাঁকে এক চিরকালীন পুরোহিতত্ব দান করা হয়েছিলঃ
তিনি ঈশ্বরের পুত্রের মত এক প্রতিচ্ছবি ধারণ করেছিলেন যা ছিল ধার্মিকতা ও পবিত্রতার চিহ্ন এবং তিনি এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে একজন অমর মহাপুরোহিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের এক প্রাচীনতম প্রতিরূপ, যিনি পিতার একমাত্র ও একজাত পুত্রের প্রতীক

ছিলেন এবং যিনি এক অনন্তকালীন পুরোহিতের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন।

অনেক দিক থেকেই এই মল্কীষেদককে নতুন নিয়মের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলে যায় তাই আমরা বলতে পারি যে, তিনি ছিলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ছায়া এবং প্রতীক আর যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকৃত পুরোহিতের রূপ প্রকাশিত হয়েছে যেন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই। কারণ আমরা খ্রীষ্টের মহাপৌরহিত্বের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহের চুক্তির অধীন হয়েছি, যা ঘটে থাকে সুসমাচার অনুসারে, কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা পূর্ণ হই। আমেন।

পক্ষপাতিত্ব !! আমাদের সমাজ কোন্ পথে হাঁটছে?

“হে আমার ভাইয়েরা, আমাদের যীশু খ্রীষ্টের উপর– মহিমাময় প্রভুর উপর– তোমাদের যে বিশ্বাস তা যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। কেননা যদি তোমাদের সমাজ-গৃহে সোনার আংটি হাতে দিয়ে ও সুন্দর কাপড়-চোপড় পরে কোন ব্যক্তি আসে এবং ময়লা কাপড় পরা কোন দরিদ্রও আসে, আর তোমরা সেই সুন্দর কাপড়-চোপড় পরা ব্যক্তির মুখ চেয়ে বল, ‘আপনি এখানে উত্তম স্থানে বসুন,’ কিন্তু সেই দরিদ্রকে যদি বল, ‘তুমি ওখানে দাঁড়াও, কিম্বা আমার পায়ের কাছে বস,’ তা হলে তোমরা কি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ করছো না এবং মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারকর্তা হচ্ছো না? হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা শোন, সংসারে যারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাদেরকে মনোনীত করেন নি, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয় এবং যারা তাঁকে প্রেম করে, তারা যেন অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী হয়? কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রকে অসম্মান করেছ। ধনবানেরাই কি তোমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করে না? তারাই কি তোমাদেরকে টেনে নিয়ে বিচার-স্থানে যায় না? যে উত্তম নাম তোমাদের উপরে কীর্তিত হয়েছে, তারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না?” (যাকোব ২:১-৭ পদ)

প্রেরিত যাকোব প্রাথমিক মণ্ডলীর ইতিহাসে একটি শক্তিশালী নাম। বলা হয়ে থাকে, তিনিই প্রথম মণ্ডলীর প্রথম বিশপ। তিনি সিবদিয়ের

পুত্র যাকোব নন; কারণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া যিহূদীদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগেই হেরোদ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। বরং তিনি ছিলেন আলফেয়ের পুত্র যাকোব, যিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞাতি ভাই যাকে প্রেরিত পৌল একজন 'স্তম্ভ' বলে আখ্যায়িত করেছেন (গালা ২:৯)।

এখানে প্রেরিত যাকোব তৎকালীন সময়ের অত্যন্ত গুরুতর একটি অপরাধের কথা উল্লেখ করছেন। সেই অপরাধটি হল পক্ষপাতিত্ব করা। তিনি এখানে দেখিয়েছেন এই পক্ষপাতিত্বের কারণে মানুষ কি ধরনের পাপে পতিত হয়, কিভাবে এই পক্ষপাতিত্ব প্রথম যুগে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে দুষ্টক্ষতের মত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পরবর্তীতে তা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী ও সমাজকে দুঃখজনকভাবে বিভক্ত করে দেয়। লক্ষ্য করুন, উল্লিখিত পদগুলোর প্রথম অংশেই আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, 'হে আমার ভাইয়েরা, আমাদের যীশু খ্রীষ্টের উপর – মহিমাময় প্রভুর উপর – তোমাদের যে বিশ্বাস তা যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়" ১ পদ।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রেরিত যাকোব খ্রীষ্টানদের একটি কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের কথা ব্যক্ত করেছেন। পক্ষপাতিত্ব কিভাবে একজন মানুষের বিশ্বাসকে স্পর্শ করে তা কলুষিত করে তা তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। খ্রীষ্টানরা এমন বিশ্বাস ধারণ করে ও সেই বিশ্বাসের প্রভাবে পরিচালিত হয় যেখানে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে না, কারণ খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টের বিধান ও তাঁর তত্ত্বাবধানের অধীনে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে।

আমরা যারা খ্রীষ্টান আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু যীশু

খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করি, সেজন্য আমাদের মধ্যে পার্থিব সম্পদের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নয়। আমাদের উচিত মানুষের ধন সম্পদের হিসাব না করে, কে গরীব আর কে ধনী তা না দেখে বরং আত্মিক দিক থেকে কে গরীর বা কে ধনী তা বিচার করা উচিত। যীশু খ্রীষ্টের গৌরব ও মহিমা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের কোন অবস্থাতেই কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা কারও সাথে আপোষ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে যদি আমরা কোন মানুষের মুখাপেক্ষা করি, তাহলে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুতর পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই পক্ষপাতিত্বের পাপ সম্পর্কে এখানে উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে (২,৩)। পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশে সমাজগৃহ বা সিনাগগ বলতে বোঝানো হয়েছে এমন একটি সমাগম স্থল যেখানে মণ্ডলীর সদস্যরা উপস্থিত হন আমাদের প্রভুর উপাসনা করার জন্য ও তাঁর ধন্যবাদ প্রশংসা করার জন্য যা আজকের দিনে আমরা মণ্ডলীতে করে থাকি। এছাড়া, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত, বা কোন অপরাধের বিচার করা হত। তৎকালীন সমাজে যিহূদীদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে এ কথার উল্লেখ ছিল যে, একজন গরীব ও একজন ধনী ব্যক্তি যখন এক সাথে কোন বিচারের জন্য আসবে, তখন ধনী ব্যক্তিকে বসতে বলে গরীব লোকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা বা আরও নিচু কোন স্থানে বসতে বলা যাবে না, বরং উভয়কে সম মর্যাদা সম্পন্ন আসনে বসাতে হবে। কাজেই এই অংশে প্রেরিত যাকোব অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে এই

সত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি যাদের কাছে লিখেছেন তারা সকলেই যিহূদীদের মধ্য থেকেই খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছিল। এই পত্রখানি মূলত তাদের উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছিল। যিহূদীদের মতই খ্রীষ্টানদেরও নিজস্ব সমাজগৃহ বা মণ্ডলী ছিল, যেখানে ধর্মীয় আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হত। সেখানে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হত ও অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করা হত। এখানে আমরা যা লক্ষ্য করতে পারি তা হল:

- প্রত্যেক শ্রেণী-পেশার মানুষের মাঝে ঈশ্বরের নিজের লোকেরা রয়েছে, যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই পুরানো ও ছেড়া পোশাক পরে তাদের আর্থিক অনটনের কারণে। আবার অনেকেরই তাদের পার্থিব ধন সম্পদের অভাব নেই এবং তারা সাধারণত দামী দামী পোশাক পরতে অভ্যস্ত।
- ধর্ম পালন ও আত্মিকতার ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবের কোন ব্যবধান নেই, তারা উভয়েই এক কাতারে দাঁড়াবে কারণ তাদের সৃষ্টিকর্তা একজন এবং তাঁর চোখে তারা উভয়ই সমান। মানুষের ধন-সম্পদ তাকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয় না, আবার মানুষের দারিদ্রতা তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরেও ঠেলে দেয় না। ঈশ্বর কারও মুখাপেক্ষা করেন না, তাই আমাদেরও কারও সাথে পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়।
- খ্রীষ্টান সমাজে পার্থিব প্রতিপত্তি ও সম্পদের ভিত্তিতে মানুষকে সম্মান করার বিপক্ষে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাকোব এখানে কর্কশ আচরণ বা বিশৃঙ্খলাকে উসকে দিচ্ছেন না। আমাদেরকে অবশ্যই সমাজের

প্রত্যেকটির মানুষের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হবে। কিন্তু এই সম্মান দেখানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে সীমা মেনে চলতে হবে, যেন মণ্ডলীতে ধার্মিকতা বজায় থাকে।

- স্বর্গীয় সিয়োনের নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে সব সময় এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, মন্দ ব্যক্তি আমাদের চোখে ত্যাজ্যনীয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে সে আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র। যদি কোন গরীব লোক ভাল মানুষ হয়, তাহলে তার গরীব অবস্থার জন্য তাকে আমরা সম্মানিত করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করতে পারি না। আবার যদি কোন ধনী ব্যক্তি মানুষ হিসেবে মন্দ হয়ে থাকে, তার শরীরে যদি খুব জমকালো কোন পোশাক থাকে এবং আকাশছোঁয়া ধন-সম্পত্তি থেকে থাকে, তারপরও আমাদের উচিত নয় তার এই সকল পার্থিব সম্পদ ও প্রতিপত্তির জন্য তাকে কোন বাড়তি সম্মান দেওয়া বা তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

আজকের আলোচিত ৪,৫ পদে আমরা দেখি এই পাপ কতটা গুরুতর। মুখাপেক্ষা বা পক্ষপাতিত্ব করা একটি অন্যায় ও অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাই, যিনি সুখবরের মধ্য দিয়ে গরীবদেরকে বেছে নিয়েছেন তাঁর রাজ্যের জন্য এবং তাদেরকে তিনি সম্মানিত করেন ও উন্নত করেন। প্রভু যীশু তাঁর সুসমাচার নিয়ে গরীবদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন আর অন্যদিকে তিনি বলেছেন ধনীদের পক্ষে স্বর্গে যাওয়ার চেয়ে সূচের ছিদ্র দিয়ে বরং উটের যাওয়া সহজ।

পাক পুস্তক আমাদের বলে, ‘আমরা কি তাহলে নিজেদের মধ্যে

ভেদাভেদ করছি না?’ এখানে যে প্রশ্নটি রাখা হয়েছে তা প্রত্যেক মানুষের বিবেকের জন্য করা হয়েছে, যেন প্রত্যেকে নিজেকে যাচাই করে দেখে। আমরা কি সত্যিই নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ বা পক্ষপাতিত্ব করি না? সেই ভেদাভেদ করতে গিয়ে আমরা কি মিথ্যা ধারণা বা নীতির বশবর্তী হচ্ছি না এবং সেই মিথ্যার দ্বারা চালিত হচ্ছি না? এই পক্ষপাতিত্ব কি আমাদেরকে ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করছে না? আমাদের বিবেক কি আমাদেরকে বলে না যে, আমরা অপরাধী? আমরা যদি শত ধার্মিকতা রক্ষা করে চলি, কিন্তু কারও না কারও ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করি, তাহলে আমাদের ধার্মিকতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

মানুষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তায় ও মননে মন্দতা ও অন্যায্যতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মন্দতার কারণে যেমন মানুষের চিন্তা-চেতনা, মানসিক অবস্থা ও কাজ কলুষিত হয়, ঠিক সেভাবেই মন্দতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মানুষ অন্যদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। এতে আমরা মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারকর্তা হয়ে পড়ি। অর্থাৎ, আমরা এই সকল মন্দ চিন্তাধারা ও অসৎ বিবেচনাবোধ নিয়ে মানুষকে বিচার করি। আমরা যে পর্যন্ত না আমাদের পক্ষপাতিত্বের প্রতি মদদ দেওয়া অন্তর্হিত চিন্তাধারা খুঁজে পাই, সে পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই তা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আমরা দেখব যে, সেসব চিন্তা অত্যন্ত মন্দ।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা গোপনে আত্মিক অনুগ্রহের বদলে বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করে থাকি এবং যেসব জিনিস দেখা যায় না সেগুলোর

বদলে যেগুলো দেখা যায় সেগুলোর দাম বেশি দিয়ে থাকি। আমাদের মন্দ সুপ্ত চিন্তা-ভাবনাগুলো প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের অন্তরের বিকৃত পাপগুলোকে কখনোই স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। ফলে আমাদের জীবনে আমাদের নিজেদের অপরিণামদর্শী কাজের ফলাফল আরও মন্দ হয়ে দেখা দেয়, কারণ আমাদের অন্তরের চিন্তার কল্পনা মন্দ (আদিপুস্তক ৬:৫)।

পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে মানুষের প্রতি এভাবে পক্ষপাতিত্ব করে সম্মান প্রদর্শন করা অত্যন্ত গুরুতর পাপ, কারণ এর ফলে আমরা নিজেদেরকে সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাই "সংসারে যারা গরীব, ঈশ্বর কি তাদেরকে মনোনীত করেন নি? কিন্তু তোমরা সেই গরীবকে অসম্মান করেছ" (৫,৬ পদ)। মানুষ সাধারণত যাদেরকে কোন মূল্য দেয় না, বা কোন ধরনের সম্মান দেখায় না, তাদেরকেই ঈশ্বর স্বর্গের উত্তরাধিকারী করেছেন এবং মহিমান্বিত প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাদের বাহ্যিক রূপ এতটাই অনাকর্ষণীয় যে, আমরা অনেক সময় তাদের দিকে ফিরেও তাকাই না যেমনটা যীশুর বলা গল্পে লাসারের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আমরা যারা নিজেদেরকে 'ঈশ্বরের সন্তান' বলে মনে করি এবং তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করি, তাদের জন্য কি এই বিষয়টি এক মারাত্মক অন্যায্য কাজ নয়? আমাদের চলার পথে সব সময় একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। আমরা এই পৃথিবীতে যত গরীব লোককে দেখব, তারা সকলেই ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত। তাদের দারিদ্রতা কোন মতেই এই নির্বাচনকে ব্যাহত করতে পারে না।

মথি ১১:৫ পদে গরীবদের কাছে সুখবর প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর মানুষের ভালবাসা ও অন্তরের ধার্মিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর পবিত্র ধর্ম পালন করতে শিক্ষা দিয়েছেন, কোন বাহ্যিক জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে নয়। এ কারণেই তিনি বেছে নিয়েছেন পৃথিবীর সকল গরীব লোকদেরকে। আবারও আমরা এমনটা দেখি যে, এই পৃথিবীর অনেক গরীব লোকই বিশ্বাসের দিক থেকে অত্যন্ত ধনী। এভাবেই সবচেয়ে গরীব মানুষটি হয়ে ওঠে সবচেয়ে ধনী। আর এই ধন অর্জনের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। যাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ও প্রাচুর্য রয়েছে, তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা খুব স্বাভাবিক যে, তারা যেন ভাল কাজেও ধনী হয়। কারণ যার যত বেশি সম্পদ রয়েছে তার তত বেশি দান ও ভাল কাজ করা উচিত। অপরদিকে এই পৃথিবীতে সম্পদের দিক থেকে যারা গরীব তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে, তারা যেন বিশ্বাসে ধনী হয়। কারণ তাদের ধন যত কম থাকবে, তাদের কাছ থেকে তত বেশি বিশ্বাস আশা করা হবে। তাই তাদের সব সময় আরও মহৎ এক পার্থিব জীবন কাটানোর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিশ্বাসে দিন যাপন করা উচিত।

আমরা যদি আরও লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, বিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা তাদের নামের দিক থেকে ধনী, কারণ তারা প্রত্যেকেই স্বর্গীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী। যদিও তারা হয়তো এই পৃথিবীতে খুব গরীব অবস্থায় দিন যাপন করছেন, কিন্তু তারা এই পৃথিবীর পরে এমন এক ধন লাভ করবেন যা অবর্ণনীয় আনন্দের ও সুখের। যখন কেউ বিশ্বাসে ধনী হয়, তখন তার মাঝে বিরাজ করে স্বর্গীয় ভালবাসা। ভালবাসা দ্বারা যে

বিশ্বাস চালিত হয় তা স্বর্গীয় গৌরবের প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জীবনে বিরাজ করে।

লক্ষ্য করুন, স্বর্গ হচ্ছে একটি রাজ্য। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসা করে তাদের জন্য এই রাজ্যের ওয়াদা করা হয়েছে। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা করা মুকুটের কথা যাকোব ১:১২ পদ থেকে জানতে পারি। সেই মুকুট যেমন জীবনের মুকুট, তেমনি এই রাজ্যও হবে অনন্ত জীবনের রাজ্য। এই সমস্ত বিষয় যদি আমরা এক সাথে ধরে বিচার করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এই পৃথিবীতে যে সকল গরীব মানুষ বিশ্বাসে অত্যন্ত উঁচু স্থানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তারা ঈশ্বরের কাছে কতটা সম্মানিত হবেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে কতটা মর্যাদাপূর্ণ ও সুউচ্চ অবস্থান দান করবেন। এ কারণে তাদেরকে গরীব বলে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি কাজ।

কিন্তু পবিত্র বাক্য আমাদের অভিযোগ করছে যে, 'কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রকে অসম্মান করেছ', পদ ৬। মানুষকে তার পার্থিব সম্পদশালীতার বিচারে সম্মান করলে, অর্থাৎ ধনী ব্যক্তির প্রতি অধিক সম্মান দেখালে ঈশ্বর তা অত্যন্ত মারাত্মক পাপ হিসেবে বিবেচনা করবেন। কারণ সকল প্রকার পাপের মূল হচ্ছে পার্থিব ধন সম্পদের মোহ। এই ধন সম্পদের মোহের ফাঁদে পড়ে খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের তাদের সত্তাকে বিসর্জন দেয় এবং ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে অপর-াধী হিসেবে উপস্থাপন করে।

দেখুন, পৃথিবীর ধন সম্পদ কতভাবেই না মন্দতা ও পাপের জন্ম দেয়, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে ও গরীবদেরকে নিপীড়ন করতে মানুষকে প্ররোচণা যোগায়। 'ধনবানেরাই কি তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে না? তারাই কি তোমাদেরকে টেনে নিয়ে বিচার-স্থানে যায় না? যে উত্তম নাম তোমাদের উপরে কীর্তিত হয়েছে, তারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না?' ৭ পদ। আমরা চিন্তা করলে দেখব, বহুবার মানুষের সম্পদ, ক্ষমতা ও পৃথিবীর প্রতিপত্তির কারণে আমাদের ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি কটুবাক্য নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং আমাদের উপর দিয়ে কত না অত্যাচার-অবিচারের নির্যাতন চলেছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের পাপে বন্দী হয়েছি এবং যে নামের জন্য আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে সেই নামকে আমরা অসম্মানিত করেছি। খ্রীষ্টের নাম অত্যন্ত মহান এক নাম। এই নাম বিশ্বাসী হিসেবে খ্রীষ্টানদের সম্মানকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু যারা সেই সম্মানের যোগ্য, তারাই কেবল সেই আহ্বান লাভ করবে।

পবিত্র শাস্ত্রের সমস্ত বাণীই চিরন্তন যদিও তা অনেক দিন আগে লেখা হয়েছে। প্রেরিত যাকোব পবিত্র-আত্মার বশে যে কথাগুলো তৎকালীন বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন আজও কি আমাদের মধ্যে তা ১০০ শত ভাগ সত্য নয়? আমাদের মণ্ডলীগুলোর কথা ধরুন, সেখানে আমরা কি সেই একই চিত্র দেখতে পাই না? তাহলে আমাদের ধার্মিকতা কোথায়? আমাদের ধার্মিকতা কি সত্যি সত্যি পার্থিব সম্পদের কাছে বন্দি হয়ে রয়েছে? যদি তাই হয় তবে আমাদের সেই বন্ধন থেকে মুক্তি প্রয়োজন। পক্ষপাতিত্ব নামক এই পাপটির হাত থেকে আমাদেরও মুক্তি দরকার যেন সত্যিকার অর্থেই আমরা খ্রীষ্টকে

আমাদের জীবনে ধারণ করতে পারি। প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর সেই শক্তি আমাদের দান করেন। আমেন।

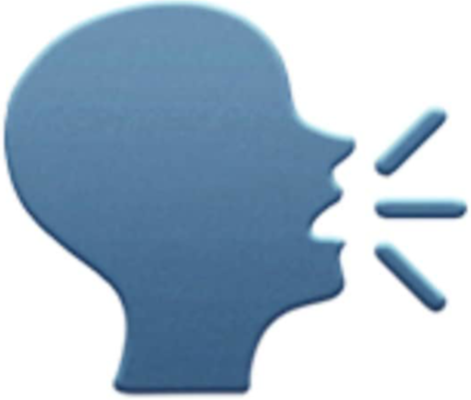

‘জিহ্বা’– অনুগ্রহের উৎস ও ধ্বংসের কারণ

(যাকোব ৩:১-১২ পদ)

জিহ্বা একটি আমাদের শরীরে ছোট্ট অঙ্গ হলেও কিন্তু এর ভূমিকা শুধু আমাদের শরীরে নয় কিন্তু আমাদের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে খুবই ব্যাপক। অবশ্য কোন অঙ্গ ছাড়া আমাদের শরীর খুব একটা ভাল ফাংশন করতে পারবে না সেজন্য সমস্ত অঙ্গ, হোক তা ছোট বা বড়, সম্মানের বা কম সম্মানের কিন্তু তা আমাদের শরীরের জন্য খুবই দরকারী। আমরা সবাই জানি যে, প্যানক্রিয়েট নামক ছোট্ট অঙ্গটি যদিও আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু তা আমাদের শরীর সচল রাখার জন্য কি প্রয়োজনীয় ভূমিকাই না রাখে। আমাদের যাদের ডায়াবেটিক হয়েছে আমরা এই ছোট্ট অদেখা অঙ্গটির গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারিতা হাড়েহাড়ে টের পাই। কিন্তু আজকে আমাদের শরীরে ‘জিহ্বা’ নামক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি নিয়ে একট আলোচনা করতে চাই।

পবিত্র বাইবেলে আমাদের দেখা অদেখা অনেক অঙ্গ নিয়েই অনেক কথা বলা হয়েছে। যেমন, হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক, হাত, পা, কান, চোখ, ও মুখ ইত্যাদি। তেমনি মুখের ভেতরে অবস্থিত জিহ্বা সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন যীশুর বারো জন শিষ্যর মধ্যে প্রেরিত যাকোব।

জিহ্বা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন যে, আমরা যেন

অন্যদের উপরে কর্তৃত্ব বা ওস্তাদি করার জন্য নিজেদের জিহ্বাকে ব্যবহার না করি (১ পদ)। এটা পরিস্কার যে, এখানে আমাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া বা অন্যদেরকে নির্দেশনা দেওয়া, কিংবা খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ধার্মিকতার পথে চলার জন্য শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে না। বরং আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছে যে, আমরা যখন অন্যদের সাথে আচরণ করি তখন আমাদের এমন আচরণ করা উচিত নয় বা এভাবে কথা বলা উচিত নয় যাতে সমপর্যায়ে অন্যদের কাছে এটা মনে না হয় যে, আমরা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করছি। আমাদের উচিত সহ-বিশ্বাসী ভাইদেরকে পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু অন্যের ভাললাগা বা অনুভূতিকে আঘাত করে নিজের মত ও ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। কারণ ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও মেধা দিয়েছেন। তাই তিনি চান যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই আমাদের উচিত নম্রতা ও শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলা। অন্যের সমালোচনা করার বদলে আমাদের উচিত নিজেদেরকে কথায় ও কাজে আদর্শ হিসেবে স্থাপন করা।

বাস্তব জীবনে আমরা অনেক ভাবেই হোঁচট খাই (২ পদ), তবে আমাদের মুখের কথাতে সবচেয়ে বেশি হোঁচট খাই। আর পবিত্র শাস্ত্র আমাদেরকে কথা দ্বারা হোঁচট না খেতে পরামর্শ দিয়েছে। আমাদের যদি নিজেদের ভুল ও অপরাধগুলোকে নিয়ে আরও বেশি করে চিন্তা করি, তাহলে আমরা অন্যদের সমালোচনা তত কম করবো। অন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যখন আমরা তাদের পাপ হিসাব করতে শুরু করি, তখন আর আমরা এই হিসাব করি না যে, আমাদের নিজেদের আরও কত গুরুতর পাপ রয়েছে। যারা নিজেরা অন্যদের বিচার করে তারা

আসলে নিজেদের সাথে ধোঁকাবাজি করে। আমরা সকলেই ঈশ্বরের কাছে দোষী অপরাধী। যারা অন্যদের ভুলত্রুটি দেখে ভ্রু কুঁচকোয়, তারা জানেই না যে, তারা জেনে বা না জেনে ঈশ্বরের চোখে কত অপরাধ করছে। শুধু তাই নয়, হয়তোবা আমরা আমাদের সমালোচনামূলক জিহ্বা ও ভর্ৎসনাসূচক কথা দিয়ে আমরা অন্যদের চেয়ে আরও বেশি পাপ করছি। আমাদের উচিত অন্যদের সমালোচনা ও বিচার করার বদলে আত্মসমালোচনা করা এবং অন্যদের বিষয়ে চিন্তা করার ক্ষেত্রে সদয় হওয়া।

একজন ঈশ্বরভক্ত লোককে তার জিহ্বা দমন করা প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়ে সে নিজেকে একজন ধার্মিক হিসেবে প্রতিপন্ন করে। যার বিবেক জিহ্বার পাপে আক্রান্ত নয় এবং যে নিজেকে এ ধরনের পাপের সকল প্রবণতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, সে একজন ধার্মিক ব্যক্তি এবং তার মাঝে নিঃসন্দেহে প্রকৃত অনুগ্রহের চিহ্নগুলো দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরদিকে যদি কোন লোক নিজেকে ধার্মিক বলে প্রকাশ করে এবং তার নিজের জিহ্বা বলগা দ্বারা বশে না রাখে, তাহলে সেই লোকের ধর্ম অসার। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি কথার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না, সে শুধু যে একজন আন্তরিক বিশ্বাসীই নয়, সেই সাথে সে একজন আধুনিক ও সত্যিকারের ধার্মিক মানসিকতাসম্পন্ন খ্রীষ্টানদের একজন– যে অনুগ্রহে বলীয়ান হয়ে একজন বিশ্বাসী তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, সেই একই অনুগ্রহ তাকে তার সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে শক্তি জোগায়।

পবিত্র শাস্ত্র দুটি বিষয়ের তুলনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি আমাদের কাছে

পরিষ্কার করেছে: প্রথমটি হল 'বলগা'। একটি ঘোড়ার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার মুখে বলগা দেওয়া হয়। এই বলগার মাধ্যমে ঘোড়াকে বাধ্য রাখা যায় ও তাকে ইচ্ছামত ঘুরানো যায় (৩ পদ)। আমাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার এক সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। আমাদের জিহ্বা এই প্রবণতাকে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ করে থাকে। সে কারণে জিহ্বাকে বলগা দিয়ে দমন করতে হবে। গীতসংহিতা ৩৯:১ পদে বলা হয়েছে, "আমি আমার পথে সাবধানে চলবো, যেন জিহ্বা দ্বারা পাপ না করি; যতদিন আমার সাক্ষাতে দুর্জন থাকে, আমি মুখে জাল্‌তি বেঁধে রাখব।" আমাদের জিহ্বা যত বেশি অনিয়ন্ত্রিত হবে, তত বেশি আমাদের উচিত হবে তা দমনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া। নতুবা অনিয়ন্ত্রিত ও বন্য ঘোড়া যেমন আরোহীকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, সেভাবে অনিয়ন্ত্রিত জিহ্বাও আমাদেরকে অমান্য করতে থাকবে। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তা, কথা ও কাজ লক্ষ্য করছেন। তাই আমাদের উচিত সব সময় নিজেদের জিহ্বাকে বশে রাখা। তাহলে আমাদের সমস্ত দেহই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

সঠিক দিকে চালানোর জন্য জাহাজ বা নৌকার প্রয়োজন হয় 'হাল'। সঠিকভাবে হাল ধরলে জাহাজ চালানো সহজ হয়। যদিও জাহাজ অনেক বড় এবং প্রচণ্ড বাতাস সেটি ঠেলে নিয়ে যায়, তবুও সেটিকে একটি ছোট হাল দ্বারা নাবিক তার যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে হয় ফিরাতে পারে, (৪,৫ পদ)। হাল জাহাজের একটি ছোট্ট অংশ, ঠিক তেমনি জিহ্বাও দেহের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অঙ্গ। এই জিহ্বাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে নিজেকে খুব সহজেই বশে রাখা যায়। এই তুলনাগুলোর মধ্যে একটি অদ্ভুত সৌন্দর্য রয়েছে। এটি এই কথা প্রকাশ করে যে, অত্যন্ত ছোট কোন জিনিসও অনেক সময় অনেক

বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে বা প্রভাব ফেলতে পারে। ছোট জিনিসও অনেক বড় বা ভাল কাজ করতে সক্ষম।

অনিয়ন্ত্রিত জিহ্বা আমাদের আত্মিক জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে বিবেচিত হতে পারে যদি আমরা তা সঠিকভাবে ব্যবহার না করি। এ ধরনের জিহ্বাকে দাহ্য পদার্থের মধ্যে রাখা আগুনের একটুখানি ফুলকির সাথে তুলনা করা যায়, যা মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা সৃষ্টি করতে পারে (৫,৬ পদ)। জিহ্বায় এত বেশি পাপ জড়িত থাকে যে, পবিত্র শাস্ত্র তাকে অধর্মের পৃথিবী বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে হয়েছে। কত না অধার্মিকতাকে এই জিহ্বা উসকে দেয়! কত না গুনাহ্‌র আগুন তা প্রজ্জ্বলিত করে! জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ যা দেহের অন্য সকল অঙ্গকে কলুষিত করে তুলতে পারে। এ কারণে জিহ্বার পাপ সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে।

আমাদের অভিজ্ঞতায় এটি সন্দেহাতীত ভাবে বলতে পারি যে, জিহ্বা দিয়ে আমরা যে পাপ করি তা আমাদের সবচেয়ে বেশি পাপী করে তোলে। এই অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গটির কারণেই আমাদের সমস্ত কলুষতাময় আকাঙ্খা, অভিলাষ ও কামনা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এ কারণে রাজা শলোমন বলেছেন, "তুমি তোমার কথার দরুন নিজেকে পাপের মধ্যে ডুবিয়ে দিও না" (উপদেশক ৫:৬)। জিহ্বার কারণে মানুষ অনেক সময় যে সমস্ত কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে পড়ে তা তাদের জন্য হয়ে পড়ে অসহনীয় এবং তা অন্যদেরও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
জিহ্বা আসলে আগুনের মত। এই আগুনে আমাদের সমস্ত বংশধরেরা জ্বলেপুরে মরছে। পৃথিবীতে এমন কোন যুগ নেই, কিংবা জীবনের

এমন কোন পর্যায় নেই যখন মানুষ এই জিহ্বার পাপে তারা আক্রান্ত হয় নি। সেই কারণে যাকোব বলেছেন, "তা নিজে নরকের আগুনে জ্বলে উঠে।" এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, জিহ্বার পাপ পৃথিবীতে নরকের আগুন জ্বালিয়ে তোলে এবং তাতে মানুষকে পোড়ায়, যা মানুষ বুঝতেও পারে না। শয়তানের সূক্ষ্ম চাতুরিতে মানুষের জিহ্বা হয়ে ওঠে নরকের আগুনের শিখা। মানুষ যখন মিথ্যা, অপবাদ, খুন, ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ইত্যাদি পাপগুলোর যে কোন একটিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তা পৃথিবীতে নরকের আগুন জ্বেলে উঠে। পবিত্র আত্মা এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন 'আগুনের জিহ্বার মত'। সে কারণে জিহ্বাকে যখন স্বর্গ থেকে আসা আগুন দ্বারা নির্দেশনা ও চালিত করা হয়, তখন তা ভাল চিন্তা, পবিত্র ভালবাসা ও আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু যখন সেই জিহ্বা নরকের আগুন দ্বারা প্ররোচিত হয়, তখন তা সৃষ্টি করে ক্রোধ, আক্রোশ, ঘৃণা, ঈর্ষা এবং শয়তানের স্বার্থ উদ্ধার করে এমন সমস্ত পাপ। এ কারণে আমরা যেমন আগুন ভয় পাই, সেভাবে মন্দ অভিলাষ, প্রতিযোগিতা, দর্প, ঈর্ষা, মিথ্যা, অপবাদ এবং এ ধরনের সমস্ত পাপগুলোকেও আমাদের ভয় পাওয়া উচিত। কারণ এগুলোর উৎপত্তি আমাদের জিহ্বা ও আমাদের আত্মা থেকেই ঘটে থাকে।

তবে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি ও দৃশ্যত দেখা যায় যে, জিহ্বাকে বশে রাখা একটা ভীষণ কঠিন কাজ। পবিত্র শাস্ত্রও এই কথা বলে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন যে, "কারণ সমস্ত রকম পশু ও পাখি, সরীসৃপ ও সমুদ্রচর জন্তুকে মানুষ দমন করতে পারে ও দমন করেছে; কিন্তু জিহ্বাকে দমন করতে কোন মানুষের সাধ্য নেই; সেটি

অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ" (৭,৮ পদ)। পৃথিবীর অনেক ভয়ংকর প্রাণী সিংহ সহ অন্যান্য অনেক বন্য পশু, বিশেষ করে ঘোড়া ও উটকে মানুষ পোষ মানিয়েছে ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। পাখিরাও মানুষের বশ মানে, এমনকি বিসাক্ত সাপও মানুষের বশীভূত হয়। সমুদ্রে বা নদীতে যত মাছ আছে তাও মানুষের বশীভূত হয়। আমরা দেখতে পাই যে, সিংহরা ভাববাদী দানিয়েলকে আক্রমণ না করে তাঁর পোষ মেনেছিল, কাকেরা ভাববাদী এলিয়কে খাবার এনে দিয়েছিল এবং বিশাল তিমি মাছ ভাববাদী যোনাকে মুখে করে গভীর সমুদ্র থেকে তীরে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু এখানে মানুষের জিহ্বার যে কথা বলা হয়েছে তা বশ করা যায় না। প্রাণীদেরকে বশে আনার কোন কৌশল বা শক্তি দিয়েই জিহ্বাকে বশ মানানো যায় না। এটাকে বশ করার জন্য শুধুমাত্র স্বর্গীয় অনুগ্রহ প্রয়োজন। স্বর্গীয় অনুগ্রহ না পেলে আমরা কখনো আমাদের জিহ্বাকে বশে আনতে পারব না।

পবিত্র শাস্ত্রের পাঠ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জিহ্বাকে বশে রাখার কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং এর জন্য অনেক বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন, এবং এজন্য আমাদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন যেন সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারি। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের সতর্ক করেছে যে, "জিহ্বা একটি অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ।" বন্য প্রাণীকে হয়তো নির্দিষ্ট কোন সীমার মাঝে বন্দী করে রাখা যায়, তাদেরকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চালানো যায়, এমনকি বিষধর সাপকে নিরাপদ করে তোলার জন্য তার বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়া যায়। কিন্তু জিহ্বা কোন নিয়ম-নীতি মানে না এবং তা যে কোন সময় যে কারও প্রতি তার বিষ ছড়াতে পারে। এ কারণে

জিহ্বার প্রতি শুধু যে সতর্কতার সাথে নজর রাখা প্রয়োজন তা নয়, সেই সাথে এর ভয়ঙ্কর প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

একজন ঈশ্বরভক্ত লোকের জিহ্বা মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে– আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগায়। একজন খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের জিহ্বা দিয়ে ধার্মিকতা পালনের জন্য আমরা ঈশ্বরের পরিচর্যা করতে পারি। কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন আমাদের এই জিহ্বা দিয়ে অন্যকে ধ্বংস করে না দিই। অন্যকে অভিশাপ না দিই, অন্যের সমালোচনা না করি। কারণ, "এই জিহ্বা দিয়েই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ দিই, আবার এর দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মানুষকে অভিশাপ দিই।" পবিত্র শাস্ত্র আমাদের এই বলে সাবধান করেছে যে, "আমাদের এই রকম হওয়া উচিত নয়" (৯,১০ পদ)। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে, আমরা আমাদের নিত্য দিনের ব্যবহারে মুখ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও প্রশংসা করি আবার আমরাই সেই মুখ মানুষের প্রতি অভিশাপ ও ভর্ৎসনা উচ্চারণ করি! যদি আমরা ঈশ্বরকে সত্যিই আমাদের পিতা হিসেবে আশীর্বাদ করি– ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি, তাহলে সেই সাথে আমাদের এটাও চিন্তা করা প্রয়োজন যে, আমাদের সমস্ত কথা ও কাজ এমন হওয়া প্রয়োজন যেন তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশিত হয়– ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যেন আমাদের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। যে জিহ্বা দিয়ে স্বর্গীয় খোদার প্রশংসা ও গৌরব করি, সেই একই জিহ্বা যদি কখনো অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন কিছুর প্রতি জঘন্য ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করি, তাহলে সেই ঐশ্বরিক প্রশংসা ও গৌরবের আর কোন মূল্য থাকে না।

তাই আমাদের জিহ্বাকে যদি আমরা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে তা এভাবেই আমাদের করে তোলে ঈশ্বরের চোখে পাপী ও অপরাধী। এখানে প্রেরিত যাকোব দেখিয়েছেন যে, এই জিহ্বা একই সাথে হতে পারে আমাদের জীবনের জন্য অনুগ্রহের উৎস, আবার হতে পারে আমাদের ধ্বংসের কারণ।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত ধার্মিকতায় কখনো পরস্পর বিরোধী কোন ধারণার অবস্থান থাকতে পারে না। একজন সত্যিকার ধার্মিক মানুষের কথায় ও কাজে কখনো অমিল থাকতে পারে না। আমরা যদি নিজ নিজ জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখি, তাহলে বহু পাপ ও অধার্মিকতা থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি। আমেন।

BACIB
International Bible CHURCH

একজন নেতার নেতৃত্বের আত্মিক উন্নয়ন

আমাদের খ্রীষ্টান সমাজে যে কয়জনকে আমরা নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছি তারা কোন না কোন ভাবে সেই আসনে বসার যোগ্যতা নিজেরাই অর্জন করে নিয়েছেন। কারণ এই আসনগুলো এমনি এমনিই পাওয়া যায় না। এই ১৬ কোটি মানুষের দেশে খ্রীষ্টান সমাজ একেবারেই ছোট্ট একটি সমাজ এবং তাও প্রচণ্ডভাবে ধর্মীয় সীমারেখায় বিভক্ত। সেই সীমারেখা ভুলে গিয়ে যদি আমরা নিজেদের যীশুর লোক বলে সামাজিক ভাবে পরিচয় দিই তবুও আমাদের এই ছোট্ট সমাজে নেতার সংখ্যা খুব বেশি নেই। আবার যা আমাদের আছে তা মূলত ধর্ম ও সেবা কেন্দ্রীক। ধর্মীয় পরিচর্যা ও এনজিও ভিত্তিক সেবার কারণেই তারা নেতা হিসাবে সমাজের একটি বিশেষ আসন দখল করতে পেরেছেন। ভাল-মন্দ মিশিয়েই আমরা মানুষ আর আমাদের সাধারণ মানুষের মতই তাদের জীবনে দোষ-গুণ দেখতে পাওয়া যায়। তাবুও আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমাদের আশা যে, আমাদের নেতারা আমাদের সামনে একটু আদর্শ জীবন-যাপন করবেন আর আমরা তাদের আদর্শ জীবন দেখে অনুপ্রাণীত হব।

নতুন নিয়ম এই কথা বলে যে, “যে শাসন করার বর পেয়েছে, সে আগ্রহ সহকারে শাসন করুক” (রোমীয় ১২:৮)। আবার এই কথাও লেখা আছে যে, যে নেতা হতে চায় সে একটি ভাল ইচ্ছা পোষণ করে।

প্রত্যেক খ্রীষ্টানকেই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য বাস করা উচিত এবং একজন নেতার ক্ষেত্রে সেটি আরও অনেক বেশি প্রয়োজন। সেজন্য সমস্ত রকম উপায়ে একজন নেতার একটি ভাল জীবন যাপন করতে হবে। অন্যান্য জনপ্রিয় কর্মীদের মতই এক জন নেতা হিসাবে খুব ভাল করার চেষ্টা করতে হবে। একজন বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে তাদেরকে আরও দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদিও আমরা ভবিষ্যত দেখতে পাই না, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর তাদেরকে আমাদের জন্য প্রস্তুত করছেন।

পবিত্র শাস্ত্রের আলোকে প্রতিটি খ্রীষ্টান বিশ্বাসী একজন নেতা বটে, কারণ কোন না কোন ভাবে কাউকে না কাউকে সে পরিচালনা দিয়ে থাকে এবং অন্যকে প্রভাবিত করে থাকে। সেজন্য আমাদের প্রত্যেককে নেতৃত্বের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। নেতৃত্বের উন্নয়ন অনেকভাবেই ঘটে থাকে– সামাজিক ও ধর্মীয় অনেক কর্মকাণ্ডে অংশ-গ্রহণের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে সমাজের লোকদের চোখে সে একজন নেতার আসন দখল করে নেয়। সেজন্য আমরা যারা নেতা হতে বাসনা করি, নেতা হয়ে সমাজ-মণ্ডলীর সেবা করতে আকাংখা করি, তাদের নিজেদের জীবনে নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

প্রথমত: আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ভুল ও দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে জানতে হবে। এরপর আমাদের ভুলগুলোকে সংশোধন করে আমাদের ভেতরে যে শক্তিগুলো আছে তার উন্নয়ন বা বিকাশ ঘটাতে হবে। নেতৃত্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যকে স্থির রাখতে হবে। হতে পারে আমরা আমাদের লক্ষ্যগুলোকে পরিষ্কার

করতে পারছি না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আমাদের লক্ষ্য আমাদের পরিপক্ক করে, আমাদের বিশ্বাসের উন্নয়ন ঘটায়, আমাদের জীবনের কার্যাবলীগুলোকে সমন্বয় করে।

বিশ্বাসের দিক থেকে আমাদের বিশ্বাস দুর্বল হতেই পারে আর সেই অবস্থার উন্নতি যদি আমাদের জীবনে না ঘটে তবে আমার বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারি।

একজন নেতাকে উজ্জীবিত হতে হয়। দুঃখময় মুখমণ্ডল তার মানায় না। খ্রীষ্টে পরিত্রাণ প্রাপ্ত একজন হিসাবে তার জীবনে পরিত্রাণের আনন্দের প্রকাশ থাকতে হবে। একজন উজ্জীবিত নেতাই একজন উজ্জীবিত অনুসরণকারী তৈরি করতে পারে।

অনেকে সমস্যা সংকুল পরিস্থিতি ভয় পায় এবং তা কাটিয়ে উঠতে ভয় পায়। তারা আশা করে সমস্যাগুলো হয়তো এমনিই চলে যাবে, আমরা হয়তো সেগুলো করতে গড়িমসি করি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একজন দুর্বল নেতা সমস্যার সময় সিদ্ধান্ত নিতে, কথাবার্তা বলতে ও সেই বিষয়ে লিখতে গড়িমসি করে। দেরি করা কোন সমস্যার সমাধান করে না এবং এতে সমস্যা আরও গভীর হয়। একজন নেতাকে সংকুল পরিস্থিতিতে অকুতভয় থাকতে হয় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তার মোকাবেলায় অগ্রসর হতে হয়।

একজন নেতাকে আগ্রহ নিয়ে সেবা করতে হয়। আমাদের প্রভু ও

গুরু– যাঁর কাছ থেকে আমরা নেতৃত্বগুণ শিক্ষা করি সেই যীশু খ্রীষ্ট সব কিছু আগ্রহ নিয়ে করেছেন। আপনার কাজে কি আপনার আগ্রহ– গভীর আগ্রহ আছে? যখন শিষ্যরা যিরূশালেমের মন্দিরে যীশুর পবিত্র ক্রোধ দেখতে পেয়েছিলেন, তখন তারা তাঁর সম্বন্ধে পুরাতন নিয়মের কথা স্মরণ করেছেন, "তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ আমাকে গ্রাস করবে" (যোহন ২:১৭)। যীশু খ্রীষ্টের আগ্রহ ছিল খুবই শক্তিশালী। কোন কোন সময় তার বন্ধুরা ভেবেছিল যে, তিনি বোকা (মার্ক ৩:২১)। শত্রুরা বলেছিল যে, তাঁকে মন্দ আত্মায় পেয়েছে (যোহন ৭:২০)। লোকেরা কি আপনাকে একজন গভীর আগ্রহে ভরা লোক মনে করে? একজন নেতা হবার জন্য এই গুণ আপনার খুবই প্রয়োজন।
আমাদের সামনে আরেকটি আদর্শ হলেন প্রেরিত পৌল। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আগ্রহে পূর্ণ ছিলেন। এডলফ ডাইসম্যান তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "দাম্মেস্কের রাস্তায়, ঈশ্বরের আলো যুবক সন্ত্রাসীর অন্তরকে আঘাত করলো। আমরা তাঁর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলাম, আমরা সেই শিখায় নিজেদের গরম অনুভব করলাম।"

পৌল যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস আনার আগে, তাঁর আগ্রহ তাঁকে নিষ্ঠুরতার দিকে পরিচালিত করতো। পরে তিনি তাঁর অন্যায় কাজগুলোর জন্য অনেক অনুতাপ করেছেন। পবিত্র আত্মা আমাদের খ্রীষ্টান জীবনে ঠিক একই ভাবে এই আগ্রহকে ভাল কাজে ব্যবহার করেন। তিনি প্রতিটি বিশ্বাসীকেই আগ্রহের সঙ্গে সাহায্য করেন যেন আমরা আমাদের ভেতরের শক্তিগুলোকে ব্যবহার করতে পারি। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে পৌল ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করেছেন ও ঈশ্বরের প্রেমের সেবা করেছেন। তিনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ধৈর্যের সঙ্গে

কাজ করেছেন। এইজন্য লোকেরাও পৌলের কথা শুনত। তিনি ভালভাবে পরিচালনা দিতেন। তিনি আগ্রহের সঙ্গে পরিচালনা করার কারণে সবাই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হত।

একজন নেতাকে আবেগের সঙ্গে পরিচালনা করতে হয়। এজন্য রোমীয় ১২:১১ পদে বলা হয়েছে, "পরিশ্রমী হও, অলস হয়ো না; আত্মায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রভুর সেবা কর।" এখানে উদ্দীপ্ত হওয়ার অর্থ হল গভীর আবেগের সঙ্গে সেবা করা। কোন উত্তেজনাকর মুহূর্তে একজন নেতা সহজেই উত্তেজিত হবেন। বেশিরভাগ নেতা কোন কোন সময় আত্মিকভাবে খুবই উত্তেজিত হয়ে যান ও তারা তখন ঈশ্বরকে খুবই নিকটবর্তী মনে করেন ও তাদের কাজে অনেক ফল লাভ করেন। কিন্তু আপনারা জানেন যে, জল গরম হলে পর সেই গরম জল আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ১১ পদ আমাদের বলে যে, আত্মায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা যেন তাঁর সেবা করি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র আত্মা হল আমাদের জীবনে ডেকচির নীচের আগুনের মত। আমরা যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকি, ততক্ষণ আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে, গভীর আবেগের সঙ্গে পরিচালনা দিতে সক্ষম হই।

জন বানিয়ান তাঁর 'যাত্রিকের গতি' নামক বইতে দেখিয়েছেন যে, যে লোকটির নাম 'খ্রীষ্টান' তিনি এই গোপন সত্যটি আবিস্কার করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যাকারীর বাড়িতে যান। তিনি সেখানে বড় আগুনের চুলা দেখতে পান। যদিও সেই চুলায় একজন জল ঢালছে তবুও আগুন জ্বলছে দেখতে পান। এরপর তিনি দেখতে পান আরেকজন সেখানে তেল ঢালছেন। সেই কারণে সেই আগুন নিভছে

না কিন্তু জ্বলছে।

যীশু খ্রীষ্ট প্রার্থনা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যদি আমরা যাচঞা করি তবে তিনি পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান করবেন (লূক ১১:১৩)। পৌল আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, "কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যার অন্তরে নেই, সে খ্রীষ্টের নয়" (রোমীয় ৮:৯)। একজন নেতা হিসাবে আমরা যেন আমাদের জীবনে এই আবেগ ও আগ্রহ লাভ করতে পারি সেজন্য পবিত্র-আত্মার উপর নির্ভর করতে হবে।

একজন নেতাকে কৌশলপূর্ণভাবে পরিচালনা দিতে হবে। চায়না ইন্ল্যাণ্ড মিশনের পরিচালক হাডসন টেইলর একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্য খুব সাধারণভাবে ও সোজাসুজি বলতেন। ১৮৭৯ সালে তিনি মিশনারী সেক্রেটারীকে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল: "চরিত্রের উন্নয়ন ঘটাও। কার্যকারীদের উপাসনা ও তাদের কৃতকার্যতার উপর নির্ভর কর। যদি সম্ভব হয় তবে বিঘ্নজনক পাথরগুলো সরিয়ে দাও। শুকনো চাকায় তেল দাও। ভাংগা জিনিষগুলো সারিয়ে নাও। যতদূর সম্ভব, প্রয়োজনগুলো পূর্ণ কর।"

এই সাধারণ উপদেশের মধ্যে তিনি একজন নেতার দায়িত্বের কথা বলেছেন। আসুন, এই কথাগুলো আমরা একটু পর্যালোচনা করি ও নিজেদের জীবনে খাটাই।

একজন নেতাকে প্রশাসনিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। তাকে অবশ্যই

আবিষ্কার করতে হবে যে, তার কোন কোন বিভাগগুলো দুর্বলভাবে কাজ করছে, এবং তাকে অবশ্যই তার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য কাজ করতে হবে। হয়তো এর মধ্যে থাকবে নতুন কার্যতালিকা, রিপোর্ট করার পদ্ধতি, এবং অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমের বিষয়।

একজন নেতাকে চারিত্রিক বৈশিষ্টসম্পন্ন লোক হতে হয়। সেটা আত্মিক ও জাগতিক উভয়ই। একজন নেতাকে তার কর্মীদের জীবনের ঈশ্বরভক্তির ও কৃতকার্যতার উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করতে হবে। মণ্ডলী বা সংস্থার আত্মিক মনোভাব প্রকাশিত হয় নেতার আত্মিক অবস্থার উপর– তার চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর। জল যেমন তার উৎসের লেভেলের উপরের দিকে উঠে যায়, তেমনি একজন নেতার কারণে তার মণ্ডলী, সমাজ ও সংস্থার সুনাম বৃদ্ধি পায়। একজন নেতা তার কাজের মান বৃদ্ধি করবেন ও তার কর্মীদের কাজের মানবৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবেন।

একজন নেতাকে দলগত সম্মান অর্জনে প্রত্যয়ী হতে হয়। প্রত্যেক সংস্থার মধ্যে কিছু না কিছু বিঘ্নজনক পাথর রয়েছে। একজন নেতাকে সেই টেনশন কমিয়ে আনতে হবে। যখন কোন সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় তখন দলগত আত্মবিশ্বাস কমে যেতে থাকে এবং সেখানকার কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। যদি সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য কাজ করা হয়, তখন এটি সংশোধন হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে একজন নেতাকে ভাল করে সমস্ত কিছু শুনতে হবে ও যে সমস্যা তৈরি করছে তাকে ভালবাসতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের কর্মী অবশ্যই কষ্ট পাবে না।

একজন নেতাকে সঠিকভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যখন গাড়ির চাকা শুকিয়ে যায় এবং সঠিক ভাবে চলে না, তখন তেল দরকার। ঠিক একই ভাবে দলের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুবই প্রয়োজনীয়। লোকদের নেতৃত্ব দেবার জন্য তাদের ভালবাসা নামক তেলে পূর্ণ হতে হবে।

একজন নেতাকে সমাস্যা-সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতেই হবে। যা ভেঙ্গে গেছে তা সাড়াতে হবে। একজন নেতার প্রধান দায়িত্ব হল কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান করা। সমস্যাগুলোকে সহজ করে তোলা; সমস্যা সমাধান করা একটি কঠিন কাজ। একজন নেতাকে সততার সঙ্গে সমস্যাগুলো এনালাইজ করতে হবে, এবং যতক্ষণ না এর সমাধান হয় এর জন্য কাজ করে যেতে হবে।

একজন নেতাকে সৃজনশীল পরিকল্পনাকারী হতে হয়। কোন পরিক-ল্পনার সমালোচনা করা সহজ কিন্তু কোন পরিকল্পনা সৃজন করা কঠিন। একজন নেতাকে তার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা পদ্ধতিকে পরিষ্কারভাবে দেখতে হবে যেন তার দল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

একজন নেতা পেছন থেকে নেতৃত্ব দিতে পারে না। সত্যিকারের নেতা সবসময়েই সামনে থাকে। পেছন থেকে নেতৃত্ব দেওয়া একটি মন্দ নেতৃত্ব, এই রকম নেতৃত্ব ইস্রায়েলকে আবার মরুভূমিতে নিয়ে যায়– আমাদেরকে আত্মিক জীবন থেকে জাগতিকতার দিকে নিয়ে যায়।

পবিত্র শাস্ত্র বলে যে, নেতা হওয়া ও নেতৃত্ব দেওয়া একটি ভাল কাজ।

আসুন, এই কাজে আমরা আমাদের সবটুকু দিয়ে অগ্রসর হই। সমাজ ও মণ্ডলী আমাদেরই আর একে পরিচালনা দেওয়া আমাদেরই কাজ।

যীশু খ্রীষ্টের দাবী - "আমিই তিনি" এবং আমাদের প্রতিক্রিয়া

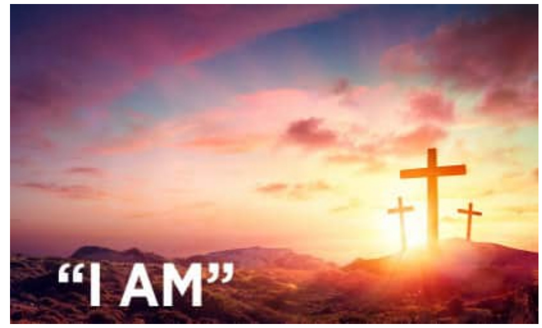

যীশু খ্রীষ্ট নিজের সম্বন্ধে অনেক দাবী করেছেন। সুসমাচারের পাতায় পাতায় সেগুলো লিপিবদ্ধ আছে। আজও আমরা তাঁর সেই দাবীগুলো পাঠ করে তাঁকে প্রকৃতভাবে চিনতে চেষ্টা করি– আবিস্কার করতে চাই তাঁর সম্পর্কে অনেক অজানা বিষয় যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি গৌরবময় সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি– যে সম্পর্কে সত্যিকারের সম্মান ও ভক্তি নিহিত থাকে।

যীশু খ্রীষ্টের দাবীগুলোর মধ্যে কিছু বিশেষ বিশেষ দাবী রয়েছে যেগুলো বাংলা অনুবাদে ই-প্রত্যয় ব্যবহার করে অনুবাদ করা হয়েছে যাতে আমরা সেগুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিই।

ই-প্রত্যয় যোগে যেসব দাবী আমরা চুল-চেরা বিশ্লেষ করে থাকি এবং যেগুলো নিয়ে আমরা আমাদের প্রচার-বাণীতে ব্যবহার করে থাকি আজকের আলোচনায় সেই রকমই একটি বিশেষ দাবী খুঁজে দেখতে চেষ্টা করবো। নতুন নিয়মে ই-প্রত্যয় যোগে যীশুর দাবীসমূহ খুঁজতে গিয়ে আমি একটু অবাকই হয়েছি এটা দেখে যে, মথি সুসমাচারে মাত্র একটি দাবী রয়েছে ২৮:২০ পদে "আর দেখ, আমিই যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" মার্ক ও লূক লিখিত সুসমাচারে কোন ই-প্রত্যয় যোগে দাবীর উল্লেখ নেই কিন্তু অন্যান্য দাবী রয়েছে আর যোহন লিখিত সুসমাচারে ই-প্রত্যয় যোগে ১০টি

দাবী পাওয়া যায়। আজকের আলোচনায় প্রকৃতপক্ষে এই ১০টি দাবী থেকে একটি দাবী নিয়ে আলোক পাত করতে চাই– এর রহস্য উদঘাটন করতে চাই এবং দাবীর সত্যতা নিরুপন করতে চাই এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। আর সেই দাবীটি পাওয়া যায় যোহন সুসমাচারের ৮:২৮ পদে: "আমিই তিনি।"

পৃথিবীর রীতি অনুসারে একশো বছর পার হতেই আমরা হিসাব নিকাশের খাতা খুলে, চুলচেরা বিচার করে একশো জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করি, আর তার পরে ফলাও করে প্রচার করি এই শতকে এরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা পৃথিবীর জন্য বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। পৃথিবীর বড় বড় পত্রিকাগুলোতে তাদের নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়, ছাপা হয় তাদের ছবি আর আমরা তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ধন্য ধন্য বলি। আমি এবার শুধু শত বছরের কথা বলছি না, কিন্তু হাজার বছরের কথা বলছি। যদি হাজার বছরের কথা বলি, এমন কি, যখন থেকে খ্রীষ্টাব্দ শব্দটি চালু হয়েছে তখন থেকে এই পর্যন্ত কে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন তবে কার কথা আমাদের মনে আসবে? এমন কেউ কি আছে যাঁকে আজও আমরা বলতে দ্বিধা করবো না যে, তিনি সহস্রাব্দের শ্রেষ্ট সন্তান– এক নম্বর মানুষ। শুধু আমাদের দু'একজন মানুষের বিচারে নয় কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের বিচারে তিনি এক নম্বর হবেন।

আসুন, এসব বিষয়গুলো সামনে রেখে আজকে যে দাবীটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি– "আমিই তিনি" এর আলোকে একটু আলোচনা করি। দেখতে চেষ্টা করি তিনি কে? কেন তিনি নিজের সম্বন্ধে এই

দাবীটি করেছেন।

আমি বাইবেল নিয়ে কাজ করা একজন মানুষ হিসাবে তাঁর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আমি চেষ্টা করেছি পুস্তক থেকেই তার সত্যতা নিরুপণ করতে।

সৃষ্টির যে ইতিহাস পবিত্র বাইবেলের মধ্য দিয়ে আমাদের হাতে এসেছে সেখানে মাত্র একটি ক্লু পাই যার সঙ্গে আমরা "আমিই তিনি"-র সম্পর্কযুক্ত করতে পারি। আর তা পাওয়া যায় আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে- "আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব; সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পায়ের গোড়ালি চূর্ণ করবে।"

এর পরে হয়তো হাজার হাজার বছর কেটে গেছে আমরা আর কোন ক্লু পাই না "আমিই তিনি"-র ব্যাপারে।

পবিত্র বাইবেলের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে এক সময়ে নতুন একটি অধ্যায় শুরু হয়। এল-এলিয়ন অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একটি লোকের মধ্য দিয়ে একটি জাতিসত্তার সৃষ্টি করার বাসনা করেছিলেন। এজন্য তিনি অব্রাহামকে বেছে নেন, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে একটি জাতি নির্মাণ করার পরিকল্পনা করেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে বিশেষভাবে আ-শীর্বাদ করেছিলেন যেন একটি জাতিসত্তা নির্মিত হয়। একটি জাতি একদিনে তৈরি হয় না- দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, একটি জাতি তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু

যে আশীর্বাদে তিনি অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছেন সেখানে সর্বজাতির আশীর্বাদের ব্যাপারটি খুবই স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে– যখন তিনি বলেছেন যে, "তোমার বংশের মধ্য দিয়েই সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে।" এই জাতি যখন একটি পরিবার থেকে অনেকগুলো পরিবার– পরিবার থেকে গোষ্ঠী– গোষ্ঠী থেকে বংশ এভাবে একটু একটু করে নির্মিত হচ্ছিল তখন আবার একটা ক্লু আমাদের চোখে ধরা পরে বিশেষ করে অব্রাহামের নাতি যাকোবের মুখ থেকে। তিনি তাঁর মৃত্যু শয্যায় তাঁর বারো সন্তানকে আশীর্বাদ করার সময় সেই 'আ-শীর্বাদের একজনের' আগমনের কথা উচ্চারণ করলেন এই বলে যে, "শীলো আসবেন" এবং তিনি এসে এই জাতিকে পথ দেখাবেন।

এরপর ৪০০ বছর কেটে গেল। এল-এলিয়ন যিনি পরে তাঁর নাম প্রকাশ করেন "যিহোবা" বা 'আমি আছি' বলে, তিনি তাঁর ইচ্ছামতই যাকোবের পরিবার মিসরে দাসত্বে বসবাস করান এবং সেখানে যাকোবের বংশ একটি জাতিসত্তায় রূপ লাভ করে।

আমরা দেখতে পাই যে, মোশির নেতৃত্বে সেই জাতিসত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে এবং তারা মিসর ছেড়ে বের হয় কনান দেশে যাবার জন্য– যে দেশটিকে যিহোবা তাদের দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু তারা নানা কারণে ৪০ বছর মরুভূমিতে অবস্থান করে সেই দেশে প্রবেশের আগেই একটি দক্ষ যুদ্ধবাজ জাতিতে পরিণত হয়।

অনেকেই হয়তো ভাবছিল যে, মোশি ছিলেন সেই শীলো, বা "অভিষিক্ত জন" যাঁর কথা যাকোব বলে গেছেন। কিন্তু মোশি এক

ঘোষণায় বললেন যে, আমার পরে আমারই মত একজন আসবেন যার কথায় এ জাতির লোকদের চলতে হবে। অর্থাৎ তিনি পক্ষান্তরে বলেছেন যে, তিনি সেই শীলো বা অব্রাহামের কাছে বলা 'আশীর্বাদের জন' নন। অথবা নারীর বংশে আসা সর্পের মস্তক চূর্ণকারী তিনি নন। তিনি পরে আসছেন। আবারও সেই লোকদের অপেক্ষা কখন তিনি আসবেন।

নব্য প্রতিষ্ঠিত ইস্রায়েল জাতির জীবনে নানা উত্থান-পতনের উত্তরণ ঘটিয়ে রাজা ও ভাববাদীদের যুগ সূচিত হয়। তারাও ক্রমে ক্রমে সেই 'অভিষিক্ত জনের' কথা একটু একটু করে বলতে লাগলেন। তিনি কোন্ বংশে আসবেন, কোথায় তাঁর জন্ম হবে, কেমন মেয়ের গর্ভে তিনি আসবেন, ইত্যাদি নানা কথা নবীরা বলতে লাগলেন। ইস্রায়েল জাতির জীবনে ভাববাদীদের সংগে সংগে রাজাদের যুগেরও সূচনা হল। রাজাগণ জাতির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাঁদের পাশে থাকতেন নবীরা যাঁরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন জাতিকে পরিচালনা দেবার জন্য।

এক সময় ইস্রায়েল জাতির জীবনে রাজা দায়ূদ আসলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে একটি স্থায়ী রাজ-বংশ এবং একটি রাজ ধারার সৃষ্টি হল। অনেকে হয়তো মনে করেছিল যে, দাউদই হয়তো সেই কথিত জন, সেই "শীলো" যার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতি হিসাবে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাবেন। তিনি সেই জন যিনি "সর্পরূপ বিজাতীয় শক্তির মাথা চূর্ণ করবেন"– কিন্তু দায়ূদ নিজেই এমন একজনের অপেক্ষা করছিলেন– যিনি ২ গীতে এমন একজন রাজার চিত্র অংকন

করেছেন যিনি যিহোবা বা সদাপ্রভুর অভিষিক্ত– ঈশ্বরের পুত্র, ইত্যাদি।

ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে যখন ভাল রাজাগণ ও খারাপ রাজাগণ রাজত্ব করছিলেন এবং এর সঙ্গে ভাববাদীদের কণ্ঠস্বর আওয়াজ তুলতে লাগল তখন মূলত আদিপুস্তক শাস্ত্রের সর্পের মস্তক 'চূর্ণকারী, শীলো', 'আ-শীর্বাদের জন' ও মোশির কথিত 'সেই নবী' এবং দায়ূদের কথিত 'অ-ভষিক্ত জনের' ছবি পরিষ্কার হতে লাগল।

এরপর যিশাইয় ভাববাদীর লেখায় আমরা এই 'অভিষিক্ত জনের' একটি জীবন-চিত্র দেখতে পাই– এখানে তাঁর উৎস – যেমন তিনি "সনাতন পিতা", "শান্তিরাজ"; তাঁর জন্ম– তাঁর জন্ম হবে "কুমারীর গর্ভে"; তাঁর কাজ– যেমন তিনি তাঁর প্রজাদের জন্য কি কি করতে যাচ্ছেন– পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তার লোকদের মিলন করার জন্য তার নিজের জীবন উৎসর্গ, ইত্যাদি বিষয়ে একটি সার্বিক চিত্র দেখতে পাই।

অন্যান্য ভাববাদীদের লেখায় তার জন্মস্থান, তাঁর অনন্তকালীন উৎপত্তি, ইস্রায়েল ছাড়াও অন্যান্য জাতিরাও যে তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসবার সুযোগ লাভ করবে সেসব বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে আসবার আগেই তাঁর জীবন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ছবি আঁকা হয়ে যায় যেন তিনি আসলে পর আমাদের তাঁকে চিনতে কোন অসুবিধা না হয়।

এরপর ইস্রায়েলীয়দের জীবনে বন্দিত্ব আসে। ৭০ বছরের জন্য তারা তাদের অবাধ্যতার শাস্তি হিসাবেই এই বন্দিত্ব তাদের জীবনে নেমে

আসে। এখানে থাকতে থাকতেই তারা সেই "অভিষিক্ত জনের" কথা বেশি করে প্রার্থনা করেন যেন তিনি এসে তাদের মুক্ত করেন।

বন্দিত্বের ৭০ বছর পরে যারা যারা তাদের দেশে ফিরে আসেন ও পুনরায় ইস্রায়েল রাজ্য, যিরূশালেম শহর এবং মন্দির পুনঃস্থাপন করেন, তাদের জীবনে সেই শক্তিশালী অবস্থা আর ফিরে আসে নি– যে অবস্থা দায়ূদের সময়ে ছিল। সেই জন্য "একজন দায়ূদের মত রাজার" আকাংখা তাদের মন থেকে সরে যায় নি।

পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদী মালাখীর পরে ৪০০ বছর পার হয়ে গেছে যখন তাদের জীবনে নানা উত্থান-পতন ঘটেছে। তাদের ও তাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে সাম্রাজ্যকরণের নানা প্রভাব তাদের জাতীয় জীবনে পড়েছে।

এই চারশো বছর নীরব সময় পার করার পর 'কাল পূর্ণ হলে' পর বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে লোকদের মনপরিবর্তনের কথা বলতে লাগলেন। তিনি সমাজের উঁচুনিচু অবস্থা সমান করা, পাহাড়-পর্বত সমতল করার কথা ঘোষণা করেন কারণ এমন একজন আসছেন যার কথা যুগ যুগ ধরে বলা হয়েছে। তাঁর জন্য রাস্তা সমান করতে হবে। তিনি সেই মেষ যিনি সকলের পাপ বহন করেন। ভাববাদী যিশাইয়ের পরে এই কথা আর কেউ বলেন নি। তিনি এসে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন যেন লোকেরা মন পরিবর্তন করে ও বাপ্তিস্ম নেয়।

প্রকৃতপক্ষে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের ছয় মাস পরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। মূলত এই দু'জনই একই সময়ে বেড়ে উঠেন। তবুও যোহন জানতেন না যে, যীশু-ই 'সেই জন'। কিন্তু তিনি তাঁর বাপ্তিস্মের সময়ে বুঝতে পারেন যে, তিনি যাঁর কথা প্রচার করছেন সেই লোকই তাঁর মাসতুত ভাই যীশু।

যীশুর জন্ম, তাঁর বেড়ে ওঠা সবই আমরা জানি। সুসমাচার লেখকগণ এসবই আমাদের কাছে লিখেছেন এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে, তিনিই 'সেই জন্য' যার কথা যুগে যুগে পুরাতন নিয়মের লেখকগণ বলে গেছেন। যীশু নিজেও সেই একই দাবী করেছেন।

আজকে আমরা তাঁর দাবীগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেন আমরা আমাদের বিশ্বাস ও বাধ্যতা এবং আশা তাঁর উপর রাখতে পারি যেন এই পৃথিবীতে এবং এই পৃথিবীর বাইরের জীবন আশীর্বাদযুক্ত হয় এবং তাঁরই সঙ্গে যুগে যুগে থাকতে পারি– এই পরম নিশ্চয়তায় যেন জীবন যাপন করি এবং এই রকম একটি পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বেঁচে থাকি যে, এই দেহের মরণ হলেও আমরা তাঁর মধ্যে– তাঁর সঙ্গে বেঁচে থাকব।

এই ঐতিহাসিক বর্ণনা দেওয়া হল যেন আমরা সত্যিই যীশুকে চিনতে পারি যে, "তিনি সেইজন"। তিনি যে সমস্ত দাবী করেছেন তা হল:

- "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, আমিই মেষদের দ্বার।" ১০:৭ (যার মধ্য দিয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হবে)।
- "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়ে না আসলে কেউ

পিতার কাছে আসতে পারে না।" যোহন ১৪:৬ (তিনিই পিতার কাছে যাবার একমাত্র পথ)।

- "আমিই উত্তম মেষপালক"; যোহন ১০:১১ (যার হাতে থাকলে আমরা নিরাপদ)।
- "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমার উপর বিশ্বাস আনে, সে মরলেও জীবিত থাকবে।" যোহন ১১:২৫ (যার হাতে থাকলে আমরা নিরাপদ শুধু এই জীবনে না পর জীবনেও)।
- "কিন্তু আমিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছি; আর আমি তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছি।" যোহন ১৫:১৬ (তাঁর হাতে থাকলে আমরা ফলবান হব ও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগ থাকবে চাওয়া-পাওয়ার বিষয়ে– যাকে আমরা প্রার্থনা বলি)।
- "আমিই সেই জীবন-খাদ্য।" যোহন ৬:৩৫ (তার জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকব প্রভুর ভোজ পালন করার মধ্য দিয়ে)।
- "আমিই তাঁকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।" যোহন ৬:৪০ (যারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকবে তারাই পুনরুত্থানের অংশী হবে।)।
- "আমিই তাঁকে জানি, কেননা আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি, আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।" যোহন ৭:২৯ (তিনি নিশ্চিত করেছে যে, উচ্চতর এক সত্তা যাকে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে জানি তিনি তাঁর কাছ থেকেই এসেছেন)।
- "আমিই তিনি"। যোহন ৮:২৮ (যার বিষয়ে বলা হয়েছিল– তাঁর কথাই তিনি নিশ্চিত করেছে যে, তিনিই সে)।
- "আমিই পৃথিবীকে জয় করেছি।" ১৬:৩৩ (তাঁর শেষ বিজয়ের দাবী করেছেন)।

এই দাবীগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে– এই পৃথিবীতে তাঁর মিশন-ভিশন প্রকাশিত হয়েছে– তাঁর পূর্বাপর পরিচিতি প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো পাঠ করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, আমরা যার উপর বিশ্বাস এনেছি– যে আশা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছি তা ব্যর্থ হবে না। কেন আমরা এরকমটা মনে করি ও বিশ্বাস করি কারণ: তিনি তাঁর দাবীগুলোর পক্ষে কাজ করেছেন– তিনি তাঁর দাবীগুলোর পক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন– তিনি তাঁর মিশন অর্থাৎ তাঁর কাজ শেষ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, “আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি” মথি ২৮:২০ পদ। তিনি তাঁর শিষ্যদের তিনি এই কথা বলেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গেই যুগান্ত পর্যন্ত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রশ্ন হল আমি কি তাঁর শিষ্য হতে পেরেছি? আমি কি অনুভব করি যে, তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন? আমার শান্তির জন্য, আমার নিরাপত্তার জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য আমি কি তাঁর শিষ্য হিসাবে জীবন-যাপন করছি কি না– যেন আমি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারি?

আসুন আজকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করি এবং প্রভুর কাছেই এর উত্তর দিই– যেন তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগবন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া

যীশু খ্রীষ্টের জীবনে কতগুলো মৌলিক সত্য রয়েছে– যে সত্যগুলো আমাদের শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়। কারণ এই মৌলিক সত্যগুলোর বিচারের মানদণ্ডেই আমরা শুধুমাত্র তাঁকে সঠিকভাবে আমাদের বোধে ধারণ করতে পারি। আর তা হল:

- ♦ যীশু খ্রীষ্টের প্রিএক্সিস্টেন্স অর্থাৎ তিনি পূর্বেই ছিলেন।
- ♦ সময় পূর্ণ হলে তিনি মানবরূপে জন্মগ্রহণ করলেন।
- ♦ তাঁর মিশন পূর্ণ করার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।
- ♦ মানুষের পরিত্রাণ নিশ্চিত করার জন্য ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য তিনি পুনরুত্থানের প্রথম ফসল হিসাবে পুনরুত্থিত হলেন।
- ♦ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি পিতার কাছে– যেখান থেকে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন সেখানে ফিরে গেলেন।
- ♦ তিনি আবার ফিরে এসে আমাদের অর্থাৎ খাঁটি বিশ্বাসীদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।

শেষের এই মৌলিক সত্যটি এখনও বাকী আছে। অন্যগুলো যখন পূর্ণ হয়েছে তখন আমরা বিশ্বাস করি এটিও পূর্ণ হবে।

আজ আমরা যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া নিয়ে একটু চিন্তা করছি।

প্রথমে আমরা দেখতে চাই সুসমাচারের লেখকগণ ও নতুন নিয়মের অন্যান্য লেখকগণ কিভাবে এই সত্যটিকে নতুন নিয়মের পাতায় অর্থাৎ তাদের লেখায় স্থান দিয়েছেন।

নতুন নিয়মের প্রথম যে পুস্তকটি আমাদের জন্য রাখা হয়েছে তা হল মথির লেখা সুসমাচার। এই সুসমাচারটিতে মথি যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে কোন কথা লিখেন নি। কেন লিখেন নি তা আমরা জানি না। যদিও অন্যান্য ঘটনায় দেখা যায় যে, যীশু খ্রীষ্ট যখন স্বর্গে ফিরে যান তখন মথি সেই ১১জনের সঙ্গে ছিলেন। তিনিও তাদের সকলের সঙ্গে একই রকম সাক্ষি যে যীশু খ্রীষ্ট আশীর্বাদ করতে করতে স্বর্গে উঠে গেলেন। কিন্তু তবুও আমরা তার লেখা সুসমাচারে সেটি দেখতে পাই না। তিনি যীশুর পুনরুত্থান ও তাঁর শেষ আদেশ দিয়ে তাঁর লেখা পুস্তকখানা শেষ করেছেন।

মার্ক লিখিত সুসমাচারখানা নতুন নিয়মের সূচিপত্রে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। যদিও পবিত্র বাইবেলের পণ্ডিতগণ এই কথা জোর দিয়েই বলে থাকেন যে, মার্কের লেখা পুস্তকখানাই নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্যে প্রথমে লেখা বই এবং তাঁর লেখাকে মূল ধরেই অন্যান্য লেখকগণ তাদের সুসমাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। মার্ক সরাসরি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য ছিলেন না। কিন্তু তিনি পৌল ও বার্নাবাসের সঙ্গী ছিলেন, এমন কি, পিতরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা ছিল বলে জানা যায়। তাঁর লেখা সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে মাত্র অল্প একটু কথাই পাওয়া যায়। মার্ক ১৬:১৯ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "তাঁদের সঙ্গে কথা

বলবার পর প্রভু যীশুকে ঊর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল এবং সেখানে তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসলেন।" মার্ক একটি বিশেষ কনটেক্সটে এই কথাটি বলেছেন। যীশুর শেষ আদেশ ও বিশ্বাসীদের পবিত্র আত্মা পাওয়া ও তাঁদের কাজের প্রমাণের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি যীশুর স্বর্গে ফিরে যাওয়ার কথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুসমাচারের তৃতীয় পুস্তক হল লূকের লেখা সুসমাচার। এই সুসমাচারে লূক বেশ একটুকু বর্ণনামূলক ভাবে যীশুর স্বর্গে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন। যদিও লূক সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য ছিলেন না। তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন এবং পৌলের সংস্পর্শে এসে মিশনারী কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। লূকের লেখাটি একটি গবেষণাধর্মী লেখা যা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন।

তিনিও যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রতি শেষ আদেশ ও নির্দেশ দেবার পরে ২৪:৫০-৫৩ পদে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, "পরে তিনি তাঁদেরকে বৈথনিয়ার সম্মুখ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং হাত তুলে তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন। পরে এরকম হল, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের থেকে পৃথক হলেন এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গে নীত হতে লাগলেন। আর তাঁরা তাঁকে প্রনাম করে মহানন্দে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন; এবং সব সময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকলেন।" যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে যাবার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেই তিনি তাঁর সুসমাচারের পুস্তকখানি শেষ করেছেন।

অন্যদিকে যোহন সুসমাচারখানি হল সুসমাচারের শেষ পুস্তক। দৃশ্যত

যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া

পুস্তকখানির লেখক যীশু খ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য যোহন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তিনিও যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়ার ঘটনার বিষয়ে কোন কথা লিখে যান নি। কেন লিখেন নি আমরা তার কিছুই জানি না। তবে যোহনই যীশু খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক সত্ত্বা সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। তাঁর লেখাতেই সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে যে, যীশু এই পৃথিবীর নন। তিনি স্বর্গীয় সত্ত্বা। তিনি মানব শরীর ধারণ করেছেন যেন মানুষের সঙ্গে থাকতে পারেন ও তাঁর মিশন পূর্ণ করতে পারেন। আমরা যোহনকে তাঁর শাস্ত্রের শেষের দিকে পিতরকে বিশেষ কিছু দায়িত্বে দেবার কথা বলেন ও যোহন কিভাবে মৃত্যুবরণ করবেন সেই রকম কিছু কথাবার্তা দিয়ে পুস্তকখানি শেষ করেছেন। তিনিও যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়ার ঘটনার কথা সরাসরি কিছু বলেন নি।

আমরা জানি যে, যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পরপরই প্রেরিতদের কাজের ফলে মণ্ডলীর কার্যক্রম শুরু হয়। আর লূক শাস্ত্রের লেখক ডা: লূক প্রেরিতদের কার্যক্রম নিয়ে ও প্রথম যুগের মণ্ডলীতে কিভাবে ঈশ্বর পবিত্র-আত্মার মধ্য দিয়ে কাজ করেছেন সেই কথা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে লিখে গেছেন। তিনি তার লেখায় যীশু খ্রীষ্টের শেষ আদেশ ও নির্দেশ এর সঙ্গে প্রেরিতদের চলমান কাজের একটি যোগসূত্র রচনার জন্য যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গটি আবারও প্রেরিত শাস্ত্রের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যা তিনি লূক লিখিত সুসমাচারে উল্লেখ করেন নি। প্রেরিত পুস্তক শুরুই হয়েছে পবিত্র-আত্মার আগমনের প্রতিজ্ঞা ও যীশুর স্বর্গে চলে যাবার কথা দিয়ে এবং সেখানেই আমরা পাই দু’জন স্বর্গদূতর কথা ও যীশু খ্রীষ্টের মেঘরথে করে স্বর্গে যাবার কথা ও

যিরূশালেম থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীতে প্রচার করার আদেশর কথা।

আজকে অনেকেই প্রশ্ন করেন কেন যীশু স্বর্গে চলে গেলেন? তিনি পুনরুত্থিত হবার পর ৪০ দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন। তবে তিনি কি পুরো সময়টা মানবজাতির সঙ্গে থাকতে পারতেন না? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু তিনিই দিতে পারেন। কিন্তু এটি সত্যি যে, তিনি স্বর্গে চলে গেছেন আর অনেকের চোখের সামনেই তিনি চলে গেছেন। কেন চলে গেছেন? আমার মনে হয় যেহেতু তিনি স্বর্গ থেকেই এসেছিলেন তাই তিনি তাঁর জায়গায় আবার ফিরে গেছেন। তাঁর জন্মের সময়ের ঘটনায় আমরা একটি বিশেষ ক্লু দেখতে পাই যে, তাঁর মানব শরীর নিয়ে জন্ম নেওয়ার যে প্রসেস তা "পবিত্র আত্মার ছায়া করা"-র মধ্যে নিহিত ছিল। এবং সেজন্যই পবিত্র শাস্ত্রে পরিষ্কার করেই বল হয়েছে, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।"

আর সেজন্যই হয়তো যীশু যোহন ৩:১৩ পদে বলেছেন, "আর স্বর্গে কেউ উঠে নি; কেবল যিনি স্বর্গ থেকে নেমেছেন, সেই ঈশ্বরের পুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন।"

যোহন ৩:৩১ পদে যীশু বলেছেন, "যিনি উপর থেকে আসেন, তিনি সর্বপ্রধান; যে পৃথিবী থেকে, সে পৃথিবীর এবং পৃথিবীরই কথা বলে; যিনি স্বর্গ থেকে আসেন, তিনি সর্বপ্রধান।"

যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া

আর যোহন ১:১৪ “আর সেই বাক্য মানব দেহে মূর্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন, আর আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা থেকে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।”

এসব পদ থেকে এই সত্যটিই পরিস্কারভাবে আমাদের মাঝে ফুটে উঠে যে, তিনি এই পৃথিবীর নন- তিনি বিশেষ মিশনে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। পৃথিবীতে কাজ করার জন্যই তিনি মানুষের শরীর গ্রহণ করেছিলেন। আর এখন কাজ শেষ করে তিনি ফিরে যাচ্ছেন- তিনি আবার আসবেন এবং তার অনুসারীদের নিয়ে যাবেন।

তাই আমরা যারা যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী তারা তাঁর পুনরুত্থান, স্বর্গারোহন ও তাঁর পুনরাগমনে বিশ্বাস করি। গত ১৪ই মে ছিল তাঁর স্বর্গে ফিরে যাওয়ার দিন। অনেক মণ্ডলীতে দিনটিকে বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করে থাকে ও বিশেষ আনন্দ অনুষ্ঠান ও ভোজের আয়োজন করে দিনটিকে সেলিব্রেশন করে থাকে।

যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে ফিরে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু কাজ দিয়ে গেছেন। সেই কাজগুলো হল-

- ♦ সুসমাচার প্রচার করা যাতে লোকেরা বিশ্বাস করতে পারে ও পরিত্রাণ পেতে পারে-
- ♦ এরপর তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া যেন তারা মন্ডলীতে প্রবেশ করতে অর্থাৎ তাঁর দেহের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে-

- ♦ এরপর তাদের শিষ্য হিসাবে গঠন করা যাতে তারা খ্রীষ্টান জীবনে বিকাশ লাভ করতে পারে–
- ♦ তাদের পালন করা যাতে স্বাভাবিক জীবন নির্বাহ করে তাঁর কাছে যাবার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে।

তিনি এখন স্বর্গে তাঁর কাজ করছেন। তিনি পিতার ডান পাশ থেকে আমরা কি করছি তা দেখছেন– তাঁর সত্যিকারের কর্মীবাহিনীকে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন ও আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন– মণ্ডলীকে শক্তিশালী করা– পবিত্র আত্মার সঙ্গে কাজ করা ইত্যাদি। পবিত্র শাস্ত্র বলে, "যিনি নেমেছিলেন, তিনিই সকল স্বর্গের অনেক উপরে উঠেছেন, যেন তিনি সমস্ত কিছু পূর্ণ করতে পারেন" (ইফি ৪:১০)।

যেহেতু তিনি পুনরুত্থিত, যেহেতু তিনি স্বর্গে জীবিত আছেন, যেহেতু তিনি আমাদের জন্য আবার ফিরে আসবেন তাই আমাদের জন্য অর্থাৎ মণ্ডলীর জন্য প্রত্যাশা আছে। সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজও বিশ্বে কোটি কোটি ভক্ত বেঁচে আছেন। কারণ আমরা জানি–

- ♦ তিনি ফিরে আসছেন।
- ♦ তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন।
- ♦ তিনি যেখান থেকে এসেছেন আমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন।
- ♦ চিরকাল আমরা তাঁর সঙ্গে থাকব।

কেন আমরা তাঁর সঙ্গে থাকতে চাই? কারণ তাঁর মত আমাদের আর

কেউ ভালবাসতে পারবে না– এটা প্রমাণিত। কেউ মানুষকে ভালবেসে মানুষের জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করেন নি। তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর স্বর্গে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা তাঁর মধ্যে মানুষের জন্য ভালবাসা দেখতে পেয়েছি। তাই আমরা তাঁর সঙ্গেই থাকতে চাই। তাই আমাদের জন্য এই কথা ইব্রীয় ৪:১৪-১৬ পদে বলা হয়েছে, "ভাল, আমরা এক মহান মহাপুরোহিতকে পেয়েছি, যিনি স্বর্গগুলো দিয়ে গমন করেছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব এসো, আমরা ধর্ম প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করি। কেননা আমরা এমন মহাপুরোহিতকে পাই নি, যিনি আমাদের দুর্বলতা ঘটিত দুঃখে দুঃখিত হতে পারেন না, কিন্তু তিনি সমস্ত বিষয়ে আমাদের মত পরীক্ষিত হয়েছেন অথচ পাপ করেন নি। অতএব এসো, আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ-সিংহাসনের কাছে উপস্থিত হই, যেন করুণা লাভ করি এবং প্রয়োজনের সময় সাহায্যের জন্য অনুগ্রহ পাই।"

আমরা এখন তাঁর অনুগ্রহেই বেঁচে আছি।

কোথায় গেলে পাব তাঁরে ....

বিজ্ঞান খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা এখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের খবরা-খবর নিমিষেই পেয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়ে যাদের আগ্রহ বেশি তারা ইন্টারনেটে গিয়েই গ্রহ-গ্রহান্তরের খোঁজ-খবর নেন। গ্রহের ছবি, এর এনালাইসিস ও সেখানকার ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আমরা জানতে খুবই উৎসুক। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন তার মধ্যে তারা পাঁচটি গ্রহকে আইডেন্টিফাই করেছেন যেখানে প্রাণের সম্ভবনা খুব বেশি কারণ গ্রহগুলোর এনালাইটিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সেগুলোর ভূ-প্রকৃতি অনেকটা পৃথিবরীর মত। সেজন্য তাদের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছে যে, হয়তো সেখানে প্রাণের আবির্ভাব থাকবে আর আমরা খুব তাড়াতাড়িই অন্য গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হবো।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এমন একটি আবহাওয়া মণ্ডল থাকা দরকার যেটি আমাদের পৃথিবীর মত– যেখানে জল, গাছপালা এবং আমাদের বায়ুমণ্ডলের মতই একটি আবহাওয়া মণ্ডল আছে। আমরা জানি যে, যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পরও তিনি মানুষই ছিলেন– তাঁর পুনরুত্থিত দেহের জন্যও আমাদের এই আবহাওয়া মণ্ডলের প্রয়োজন ছিল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য এবং তিনি এখন যেখানে আছেন

সেখানেও এরকমই একটি আবহাওয়া মন্ডল দরকার তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য। যুক্তি তাই বলে। হতে পারে সেখানকার আবহাওয়া মণ্ডল আমাদের চেয়েও বেশি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর কারণ সেটিকে আমরা স্বর্গ বা স্বর্গ বলে বিশ্বাস করি। সবচেয়ে বড় কথা হল সেখানে বেঁচে থাকার মত একটি পরিবেশ থাকতে হবে নইলে সেখানকার প্রাণী জগত বেঁচে থাকবে কি করে? পবিত্র বাইবেলের পরিষ্কার নির্দেশনা যে, তিনি স্বর্গে চলে গেছেন। লূক ২৪:৫১ পদে বলা হয়েছে যে, "তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের থেকে পৃথক হলেন এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গে নীত হতে লাগলেন।" এছাড়া প্রেরিত পুস্তকে ১:৯ পদে বলা হয়েছে, "এই কথা বলবার পর তিনি তাঁদের দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে নীত হলেন এবং একখানি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টিপথের আড়ালে নিয়ে গেল।"

বাইবেল ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম এটাকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। প্রশ্ন হল স্বর্গ কি কোন বাস্তব জায়গা অথবা কোন কল্পনার ছবি? যদি এটি একটি বাস্তব জায়গা হয় তবে নিশ্চয়ই কোন গ্রহ বা নক্ষত্র হবে কারণ এছাড়া পুরোটাই একটা নিকোশ কালো অন্ধকার ফাঁকা জায়গা। আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটিও এমনি ফাঁকা জায়গায় তার কক্ষপথে ঘুরছে। সাধারণ যুক্তিতে এটা বুঝা যায়, যে স্বর্গের কথা আমরা জানি তা নিশ্চয়ই কোন একটি জায়গা আর যদি জায়গা হয় তবে তা কোন না কোন গ্রহে বা উপগ্রহে।

আমাদের বিশ্বাস ও নতুন নিয়মের সাক্ষ্য এই কথা বলে যে, যীশু এখন স্বর্গে আছেন কারণ তিনি অনেক লোকের চোখের সামনেই মেঘের রথে (এখনকার ভাষায় আকাশযান) করে উপরের দিকে উঠে গেছেন এবং

সেই সময়ে দুই জন স্বর্গদূত সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন যে, যেমন তিনি এখন চলে গেলেন সেই যীশু আবার ফিরে আসবেন তোমাদের নিয়ে যেতে। তাই খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে তিনি বেঁচে আছেন ও স্বর্গে আছেন। তবুও আমার মত অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, যীশু এখন কোথায়? কোথায় গেলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। স্বর্গে থাকলেও কোন স্বর্গে আছেন? মুসলিমরা বলে স্বর্গ আটটি আবার খ্রীষ্টানরা বলে কমপক্ষে তিনটি কারণ পৌল তৃতীয় স্বর্গের কথা বলেছেন। আর মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে যে স্বর্গ বলতে কোন জায়গায় যায় সেরকম কোন ধারণা পুরাতন নিয়মের যিহূদীদের মধ্যেও ছিল না। তবে পবিত্র বাইবেলে 'স্বর্গ' একটি বহুবচনের শব্দ। 'স্বর্গের স্বর্গ' বলে শাস্ত্রে অনেক জায়গায়ই লেখা আছে। তাই যীশু এখন কত নম্বর স্বর্গে আছেন?

পবিত্র বাইবেলে স্বর্গ মানেই উর্দ্ধ জগত বা উপরের জগত। যা কিছু পৃথিবীর উপরে দেখা যায় তা-ই স্বর্গ। যদিও প্রকৃত অর্থে এই বিশ্বভ্রম্মাণ্ডে উপর-নিচ বলে কিছু নেই। কারণ যা কিছু আমরা এই পৃথিবী থেকে উপরের দিকে দেখি আবার সেখান থেকে পৃথিবীকেও উপরের দিকে দেখা যাবে। একটু সহজ করে বলি– আমরা মঙ্গল গ্রহকে উপরের দিকে দেখি কিন্তু মঙ্গল গ্রহ থেকে এই পৃথিবীকে উপরের দিকে দেখা যায়– তেমনি চাঁদ থেকেও পৃথিবীকে উপরের দিকে দেখা যায়। সেজন্য মহাকাশে উপর-নিচ বলতে কিছু নেই।

সে যা হোক, যে প্রশ্ন নিয়ে কথা বলছিলাম– যীশু এখন কোথায়? কোথায় খুঁজবো তাঁকে? কোথায় গেলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?

বিজ্ঞানীরা বলেন যদি তিনি থেকেই থাকেন তবে তিনি এখন কোন না কোন গ্রহে আছেন? বিধর্মীরা বলেন যদি তিনি জীবিতই হন তবে তিনি কোথায়? খ্রীষ্টানরা বলেন তিনি স্বর্গে আছেন– ঈশ্বরের ডান পাশে আছেন।

আমরা মানুষেরা এখন যেভাবে মহাকাশ খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা কি সত্যি একদিন যীশুকে খুঁজে পেয়ে যাবো? কোন যোগাযোগ কি আমরা করতে পারবো তাঁর সঙ্গে? আমরা কি যীশুকে খুঁজে পেয়ে বলতে পারব– 'তুমি তাড়াতাড়ি এসো প্রভু, তোমাকে এখন বড় প্রয়োজন পৃথিবীর।' আমি যখন বড় বড় হত্যাযজ্ঞ দেখি– বিশেষ করে খ্রীষ্টানদের উপর নির্মম অত্যাচার দেখি, মানব সভ্যতার উপর চরম আঘাত দেখি, সত্যি তখন আমার মনে প্রশ্ন উঠে 'যীশু তুমি কোথায়?' তুমি কি সত্যি আছ? তাহলে কেন তুমি তাদের রক্ষা করছো না? আসলে আমি পৃথিবীতে আমাদের রক্ষক হিসাবে এমন একজন রক্ষকের কল্পনা করি ঠিক যেন তিনি সুপারম্যানের মত। যেখানেই অন্যায়, অত্যাচার, বিপদ সেখানেই তাকে দেখতে পাওয়া যাবে রক্ষকের ভূমিকায়। হয়তো বাস্তবে তা কখনো সম্ভব নয় তবুও মানুষের মন তো– আমাদের প্রভুকে নিয়ে এমনটাই কল্পনা করতে আমার মন পছন্দ করে।

মানুষ খুঁজছে যীশু কোথায়? অন্যদিকে যীশু নিজেই বলেছেন তিনি কোথায়, এছাড়া বাইবেলও বলে যীশু কোথায়। যীশু খ্রীষ্ট মথি শাস্ত্রের শেষ বাক্যে বলেছেন: "আমিই যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" অর্থাৎ তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমরা জানি তিনি স্বর্গ থেকে মানুষ হিসাবে মানুষ রূপে এসেছিলেন।

তিনি মানুষকে ভালবেসেছিলেন। তিনি মানুষের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন। আজও তিনি মানুষের সঙ্গেই থাকতে চান। সেজন্য তিনি বলেছেন: "দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে আছি ও আঘাত করছি; কেউ যদি আমার গলার আওয়াজ শুনে ও দরজা খুলে দেয়, তবে আমি তার কাছে প্রবেশ করবো ও তার সঙ্গে ভোজন করবো এবং সেও আমার সঙ্গে ভোজন করবে" প্রকাশিত বাক্য ৩:২০ পদ। আজও তিনি আমাদের সঙ্গেই চরম সহভাগিতা চান, বাস করতে চান আমাদের সঙ্গে, খেতেও চান আমাদের সঙ্গে। কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন। তিনি মানুষকে ভালবাসেন। আর আমরা তাঁকে খুঁজে ফিরছি– কোথায় আছেন তিনি?

প্রশ্ন হল যীশুকে কি করে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে? বা কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে? প্রথমত: আমরা এই জীবিত শরীর নিয়ে এখন স্বর্গ যেখানে এখন তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করি আপনি-আমি সেখানে যেতে পারি না। তবে হয়তো সময় আসছে যখন মহা বিশ্বের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ যেখানে জীবন আছে বলে মনে হয় সেই সমস্ত জায়গায় এই পৃথিবীর মানুষ যাবে তখন তারা নিশ্চয়ই সেখানে যীশুর অনুসন্ধান চালাবে তাঁকে পাওয়ার জন্য? কিন্তু আমি বলি যীশুকে পাবার সর্বত্তোম জায়গা হল পবিত্র বাইবেল। এখানেই তাঁকে আবিস্কার করতে হবে। এটাই তাঁকে আবিস্কার করার সঠিক জায়গা।

দ্বিতীয়ত: যেখানে এখন যীশু সশরীরে আছেন সেখানে হয়তো আমরা যেতে পারছি না। কিন্তু তিনি অশরীরী অবস্থায় বা আত্মায় যেখানে আছেন সেখানে কিন্তু আমরা সহজেই যেতে পারি। বিষয়টি কখনো

ভেবে দেখেছেন কি? প্রথমত যীশু খ্রীষ্ট একজন বিশ্বাসীর সঙ্গে থাকেন। তিনি বলেছেন 'আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি'। তিনি একজন বিশ্বাসীর হৃদয়ে থাকেন বিশেষ করে যারা তাঁকে থাকবার জন্য তাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন। সেখানে আপনি-আমিও থাকতে পারি। তাঁর সঙ্গেই থাকতে পারি, তাঁকে নিয়েই থাকতে পারি– একই সহভাগিতায় থাকতে পারি! যীশু যেখানে থাকেন সেটাই তাঁর পিতার বাড়ি। তিনি সেই বাড়ি প্রস্তুত করেন যেন আমরাও সেখানে থাকতে পারি। এটা মানুষের হৃদয়– একজন বিশ্বাসীর হৃদয়– যেখানে তিনি থাকতে চান, থাকেন ও সহভাগিতা দেন।

এখন যদি আমরা যীশুকে পেতে চাই তবে দুটি রাস্তা আমাদের জন্য খোলা আছে তার একটি বাইবেল ও অন্যটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর হৃদয়। এ দুটো জায়গায় যদি আমরা যীশুর খোঁজ করি তবে আমার বিশ্বাস সেখানে তাঁকে খুজে পেয়ে যাবো। আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি মিথ্যে কথা বলেন নি। তিনি সত্যি মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তিনি চান আমরা যেন সেখানে তাঁর খোঁজ করি, শুধু ত-ই নয়, খুঁজে পেলে পর যদি আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয়ে আমন্ত্রণ জানাই তবে তিনি আমাদের হৃদয়েও বাস করার জন্য আসবেন। এটাই তাঁর থাকবার আসল জায়গা। এখানে তিনি থাকতে ভালবাসেন কারণ এজন্যই তিনি এক সময় স্বর্গ ছেড়ে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেন তিনি মানুষের সঙ্গে থাকতে পারেন।

আপনি যদি যীশুর খোঁজ করতে গিয়ে সত্যিই একজন বিশ্বাসীর অর্থাৎ একজন খ্রীষ্টান ভাইয়ের হৃদয় খোঁজ করতে চান তবে তাকে আমাদের

ভালবাসতে হবে– তাঁর হৃদয় জয় করতে হবে। আর আমরা জানি ভালবাসা ছাড়া, নিস্বার্থ ভালবাসা ছাড়া, একজনের হৃদয় জয় করা যায় না। টাকা-পয়সা, সাহায্য-সহযোগীতা দিয়ে আপনি একজনের হৃদয় ক্ষণ কালের জন্য জয় করতে পারেন কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা দিয়েই চিরকালের জন্য তাঁকে জয় করা যায়। আর সত্যি কথা বলতে কি যদি সত্যি সত্যি আপনি একজন খাঁটি খ্রীষ্টানের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন তবে সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যীশু সেই হৃদয়ে বসে তার জীবনে রাজত্ব করছেন। আর একই ভাবে তিনি আপনার হৃদয়েও রাজত্ব করতে চান।

পবিত্র বাইবেলে একজন বিশ্বাসীর হৃদয়কে মহান ঈশ্বরের থাকবার জায়গা, পবিত্র আত্মার মন্দির বলা হয়েছে। সেইদিক থেকে এটাই প্রকৃত অর্থে ‘পিতার বাড়ি’ যেখানে যীশু থাকতে চান। একজন বিশ্বাসীর হৃদয়ে যখন তিনি বাস করতে শুরু করেন তখন তিনি সেটাকে সত্যিকার অর্থেই পিতার বাড়িতে রূপান্তর করেন যেন সেখানে আরও অনেক বিশ্বাসী মানুষের থাকবার জায়গা হতে পারে। তিনি সেই হৃদয়কে সেই ভাবেই প্রস্তুত করতে থাকেন, অর্থাৎ সেই বিশ্বাসীর ভালবাসার পরিধিটা তখন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে যেন অনেকেই তার ভালবাসায় ঠাই পায়– যেন যীশুর সঙ্গে তারাও সহভাগিতা পায়।

তাই আসুন যীশুকে খোঁজ করার জন্য মহাকাশের দিকে তাকিয়ে না থেকে, বড় বড় উপাসনালয়ে তাঁর খোঁজ না করে তাঁর আসল থাকবার জয়গায় খোঁজ করে দেখি। সত্যিকারের হৃদয় ও মন নিয়ে খোঁজ করলে আমি নিশ্চিত যে তাঁকে পেয়ে যাবো– আমাদের হৃদয়ে তাঁকে

সহভাগিতা দেবার জন্য– তাঁর সঙ্গে আমার সহভাগিতার জন্য। আমেন।

আমরা যারা তাঁর ক্রুশের চারপাশে . . .

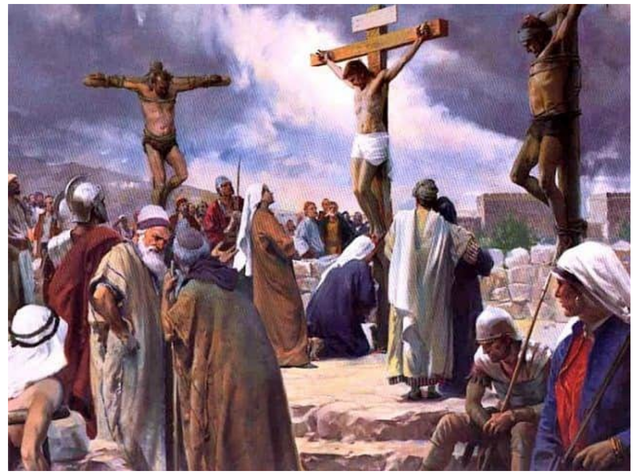

আমার নিজের কথা দিয়েই আজকের লেখা শুরু করছি। যখন আমি কিশোর ছিলাম এবং যখন আমি যীশুর রাজ্যে আসি নি তখনও আমি শুনতাম ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কথা। এরকম কোন ছবি দেখলে, বা কোন গল্প শুনলে চোখে জল এসে যেত। যখন আমি প্রথম বারের মত নতুন নিয়ম পড়াশুনা করছিলাম - তখন প্রথম বারের মত সমস্ত ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলাম তখন আমি অনুভব করেছিলাম খ্রীষ্টের হাতে ও পায়ে পেরেক বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা– কি অমানবিক যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন! যখন প্রথম বার গীর্জায় গিয়ে ক্রুশের গান শুনলাম তখন হৃদয়ে বেশ আবেগঘন ব্যাপার সৃষ্টি হয়েছিল। আমার এখনও মনে পড়ে 'গেৎশিমানী বনের' গানটি প্রথমবারের মত গাই তখন চোখ দিয়ে জল পড়েছিল– হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। আমি যখন অনুভব করতে শুরু করি খ্রীষ্টের যন্ত্রনা, তাঁর দুঃখভোগ, ক্রুশে অমানবিক মৃত্যু– আমি হৃদয়ে কষ্ট পেয়েছি। এতে কোন ভণিতা ছিল না– এই বিষয়ে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। ক্রুশ ধ্যানে তখন আমার হৃদয়ের গভীরে এক অসহ্য যন্ত্রনা অনুভব করতাম। যেটা আজও করি।

আমি জানি না আপনারা যখন ক্রুশ ধ্যান করেন তখন আপনাদের অবস্থা কি হয়? আপনাদের অনেকের জীবনেই জন্ম থেকে এই একই কথা, একই কাহিনী শুনতে শুনতে হয়তো কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

হয়তো বলবেন, আমাদের যীশু আমাদের জন্য মরেছেন এটা আর বিশেষ বিষয় কি? আর এই জন্যই তো আমরা এই ধর্ম পালন করি– নইলে তো আমরাও অন্যান্য ধর্মের মত অন্য একটা ধর্ম থাকতো। হতে পারে একে বারে জন্ম থেকে দেখেছেন বলে, শুনেছেন বলে অনেকেরই হৃদয়ের গভীরে বিষয়টি ধাক্কা দেয় না– যীশুর কষ্টটা অনুভব করতে পারেন না। কিন্তু যিনি বিষয়টি প্রথম বারের মত শুনতে পান– বুঝতে পারেন যে, যীশু এমন নির্মম অত্যাচার ও কষ্ট ভোগ করেছেন আর সেটা তারই পাপের জন্য তখন তার হৃদয়ের গভীরে ধাক্কা লাগাটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, যেটা আমারও হয়েছিল।

আমরা অনেকেই হয়তো 'এম্প্যাথি' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। শব্দটির অর্থ হলো অন্যের প্রাপ্ত যন্ত্রনাকে নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করা। মনে হয় বর্তমানে বেশির ভাগ লোক অপরের দুঃখভোগের প্রতি সমবেদনা, দুঃখ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে থাকে। এখনো যদি সঠিক ভাবে কোন দুঃখ-কষ্টকে মানুষের হৃদয়ের কাছে উপস্থাপিত হয় তবে সেই এম্প্যাথি আমাদের মধ্যে এখনও সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আলোচিত রাজন হত্যাকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের হৃদয় জাগ্রত হওয়া তা প্রমাণ করে। তবে এদের পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে কমে যাচ্ছে। হয়তো বর্তমান ওয়াল্ড ভিউ এর জন্য দায়ী। অন্য দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, বর্তমানে মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে পরেছে। টিভি ও ফেইজবুকে এই বিষয়ে নানা রকম খবর আমরা পেয়ে থাকি। আমি বিশ্বাস করি যে, এই কঠিন হৃদয়ের কারণ হতে পারে আমরা রোজ যা দেখছি টেলিভিশনে, ছায়াছবিতে, এবং আমাদের সাংস্কৃতিক গন্ডীর মধ্যে। ১৯৯৯ সালে মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে যেখানে উল্লেখ

রয়েছে যে, যুবকেরা ১৮ বছর হওয়ার আগেই ১৬,০০০ এর বেশি খুন টেলিভিশনে দেখে। প্রতি বছরে প্রায় ৯০০ খুন টেলিভিশনে দেখে এবং এটা শুধুমাত্র টেলিভিশনের মধ্যে। সেই খুন বা মৃত্যু গোনা হয়নি যা তারা ছায়াছবিতে, ভিডিও গেমে, এবং বিভিন্ন ধরনের সংবাদ মাধ্যমে দেখে।

আসুন আজ চেষ্টা করি এবং অনুভব করি খ্রীষ্ট যে ক্রুশে যাতনা ভোগ করেছেন সেই যন্ত্রণার কিছু মুহূর্ত। আসুন আজ চেষ্টা করি এই মুহূর্তগুলোর সঙ্গে আমরা নিজেদেরকে সম্পর্কযুক্ত করতে। আসুন আমাদের মনের পর্দায় তখনকার ক্রুশের একটি প্রেক্ষাপট, একটি দৃশ্য অঙ্কন করি।

যখন আপনি ক্রুশে খ্রীষ্টকে দেখেন তখন আপনি কি দেখেন? যে দিনে খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করেন, সেখানে অনেকেই ক্রুশের কাছে ছিল। সৈন্যরা তাঁকে ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করেছিল, তারা বসেছিল এবং "তাঁকে চৌকি দিচ্ছিল" (মথি ২৭:৩৬)। আরও অনেকেই সেখানে ছিল তারাও তাঁকে লক্ষ্য করছিলো। এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে আমি/আপনি কার মতন? আমরা আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই বিষয়ে চিন্তা একটু করতে চাই। যখন আপনি ক্রুশে খ্রীষ্টের দিকে দেখেন তখন আপনি কি দেখেন? আপনি কি আপনাকে সেখানে দেখতে পান? যদি আপনি নিজেকে সেখানে কল্পনা করেন তবে কাদের সঙ্গে আপনি সেখানে আছেন?

১. প্রথমত: আমরা সেখানে প্রধান পুরোহিতদের এবং প্রাচীনদের দেখতে পাই যারা দেখেছিল যীশু নামক একজন শত্রুকে ক্রুশে মারা হচ্ছে– তাদের অপছন্দের একজনকে মারা হচ্ছে।

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে: "আর সেভাবে প্রধান পুরোহিতেরা ধর্ম-শিক্ষকরা ও প্রাচীনরা বিদ্রূপ করে বললো, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করতো, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ও তো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক; তা হলে আমরা ওর উপরে বিশ্বাস করবো। ও তো ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি ওকে চান; কেননা ও বলেছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র" (মথি ২৭:৪১-৪৩)।

যখন তিনি ক্রুশে দুঃখভোগ করছিলেন। তখন তারা তাঁকে বিদ্রূপ ও উপহাস করেছিল। তারা তাঁকে একজন শত্রু হিসাবে দেখেছিল, ধর্ম-নাশাক হিসাবে দেখেছিল। তারা তাঁর ধর্মীয় মায়া জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত ছিল। আজও কি সেই ধরনের লোকদের আমাদের সমাজে যত্রতত্র দেখা যায় না?

না, আসুন আমরা তাদের প্রেক্ষাপটে তাদের কথা চিন্তা করি: কেন তারা এমনটা চিন্তা করছিল? তাদের প্রেক্ষাপট থেকে কথাটা ভাবুন– তারা মনে করেছিল এই লোকটি আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে– আমাদের সাব্বাত মানে না– আমাদের সংস্কৃতি পাল্টাতে চায়– আমাদের মন্দির ভেংগে ফেলতে চায়– সে নতুন একটা ধর্ম আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়– সে নাকি খ্রীষ্ট কিন্তু খ্রীষ্টের আগে এলিয় আসবেন তাকে তো দেখলাম না। খ্রীষ্ট আমাদের মুক্তি দেবেন,

স্বাধীনতা দেবেন, এই অত্যাচারী বিদেশী সরকারের হাত থেকে বাঁচাবেন– কিন্তু এ কি করেছে! লোকেরা একে রাজা রাজা বলে, দায়ূদের বংশধর বলে যিরূশালেমে স্বাগতম জানালো কিন্তু সন্ধ্যা হতেই সে নগর থেকে বের হয়ে গেল। সেজন্য একে মরতেই হবে। এ আমাদের বন্ধু নয় শত্রু। একে মরতেই হবে। এটাই তার সঠিক শাস্তি।

আজও কি আমরা এই একই রকম চিন্তা করি না? আমাদের জীবনে যখন কষ্ট, দুর্দশা নেমে আসে– যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যীশুর কাছে প্রার্থনা করি– অথচ আমাদের প্রার্থনা শ্রবন করা হয় না– তখন আমাদের মধ্যেও কি একই ক্ষোভের কথা সৃষ্টি হয় না। আমাদের হৃদয়ে যীশুর ক্রুশের রক্ত ক্ষরণ না হয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় কারণ তখন যেন আমরা যীশুর ক্রুশে থাকি।

অন্যদিকে আমরা যারা সমাজে প্রাচীন ও পুরোহিতের পদমর্জাদায় প্রতিষ্ঠিত, আমরা যখন আমাদের চাওয়া ও আকঙ্খার বিষয়টি যীশুর কাছ থেকে পাই না তখন আমরা আমাদের আচরণ দিয়ে, আমাদের ধর্মতত্ত্ব দিয়ে, আমাদের ব্যাখ্যা দিয়ে, সমাজ বিভক্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে যীশুকে এই ভাবেই ক্রুশে রাখতে পছন্দ করি না?

২. দ্বিতীয়ত: আমরা দেখতে পাই ক্রুশের নীচে রোমান সৈন্যরা যীশুর বস্ত্রের জন্য গুলিবাঁট করেছিল।

"পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে তাঁর কাপড়-চোপড় গুলিবাঁট করে ভাগ করে নিল; এবং সেখানে বসে তাঁকে চৌকী দিতে লাগল" (মথি

২৭:৩৫-৩৬)। আমাদের মনে রাখতে হবে এই লোকেরা ছিল রোমান, যিহূদী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল না। এই লোকেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক– যারা তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই ব্যক্তিরা এতটাই বস্তুবাদী ছিল যে, তারা খ্রীষ্টের এই নির্মম এই দুঃখ ভোগের সময়েও তাদের ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করতে পারে– খ্রীষ্টের বস্ত্রটি কার হবে এই বিষয় নিয়ে ভাবতে পারে। এর মূল বিষয় ছিল কিছু অর্থ প্রাপ্তি। তারা চিন্তা করছিল খ্রীষ্টের বস্ত্র বিক্রি করে যা কিছু অর্থ পাওয়া যায়। তাদের প্রেক্ষাপট থেকে চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট সম্পর্কে এদের কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল। তারা জানতো যে, দেবতারা মানুষের মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং তাদের যখন পুত্র সন্তান হয় তারা সাধারণত দেবতার পুত্র হয়ে থাকে। এদের প্রচণ্ড ক্ষমতা ও শক্তি থাকে। দ্বিতীয়ত: এরা সৈনিক। ক্রুশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যে কোন লোকের কাপড়-চোপড় বা সঙ্গে থাকা জিনিষপত্র যারা তাকে ক্রুশে দেয় তারা তা পেয়ে থাকে। সেজন্য যীশুরটাও তারা পেয়েছে। সাধারণ নিয়ম হল সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে কোন মালামাল পায়, এমন কি মানুষও, তখন তা লুটের মাল বলে গণ্য হয় এবং তা সৈনিকদের হয়। যীশুর বেলায়ও তাদের কাছে একই রকম। যীশুর একটা কাপড় আছে। সেই কাপড় এখন তাদের। প্রশ্ন হল ওটা কে নেবে? তাই গুঁলিবাট করার দরকার হয়েছিল। কেন জামাটা দরকার হয়েছিল কারণ জামাটা বিক্রি করে কিছু অর্থ পাওয়া যাবে।

সেদিন এই প্রশিক্ষত সৈন্যরা ক্রুশের নীচে থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিল। যুগের এই পর্যায়ে আমরাও প্রশিক্ষণ নিয়ে যীশুর ক্রুশের

নীচে আছি। আমরা আমাদেরকে এক কথায় 'মিনিষ্টার অফ ক্রশ' বলে থাকি। কিন্তু আমাদের মনের কেন্দ্রবিন্দুতে কে বসে আছে? যীশু না অর্থ? অথবা যীশুর পরিচর্যাকে কেন্দ্র করে অর্থ? আপনি কি দেখেন যখন আপনি ক্রুশের দিকে তাকান? কি ভাবেন যখন আপনি ক্রুশের নীচে আসেন?

অর্থ! অর্থ!! অর্থ!!! আমরা অনেকেই অর্থকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু মনে করি। আমরা যা কিছু করি তার মধ্যে অর্থের প্রাপ্তির খোঁজ করি। আমরা যখন যীশুর কাছে আসি তখন এর মধ্য দিয়ে কি অর্থ পাওয়া যেতে পারে তার খোঁজ করি। আমরা এটাকে 'যীশু ব্যবসা' বা 'ধর্ম-ব্যবসা, বা 'মিশন-ব্যবসা' বা 'চার্চ-ব্যবসা' বলে থাকি যা সেই প্রেরিত পৌলের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। যীশুর কাপড় অর্থাৎ যীশুর ধার্মিকতা বিক্রি করে– যীশুকে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করছি! হ্যাঁ, টাকা আমাদের সকলেরই দরকার– এটা আমরা আমাদের জীবন চলার জন্য চাই। কিন্তু সেটা যীশুকে বিক্রি করে নয় কিন্তু সৎ ভাবে উপার্যন করে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, নতুন নিয়ম বলে: "বস্তুত মানুষ যদি সমুদয় পৃথিবী লাভ করে আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তার কি লাভ হবে? (মার্ক ৮:৩৬)। পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের এত অর্থে লাভ কি, যদি সে তার আত্মাকে অনন্তকালের জন্য ধ্বংসের গহ্বরে হারায়? পৃথিবীর একজন সবচেয়ে বড় ধনীর কি হবে যদি তার আসল সত্ত্বা ধ্বংসের দিকে পরিচালিত হয়? রোমান সৈন্যরা শুধু দেখেছিল খ্রীষ্টের বস্ত্র থেকে কত অর্থ পাওয়া যায়। আপনি কি দেখেন যখন আপনি ক্রুশের দিকে তাকান? আপনি কি দেখতে পান যীশু ক্রুশের উপরে উলঙ্গ কারণ তাঁর বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রের ভাষায় বস্ত্র মানে

ধার্মিকতা। আমরা যারা তাঁর ধার্মিকতা ব্যবহার করে, তাঁর ধার্মিকতা বিক্রি করে এই পৃথিবীতে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে জীবন পরিচালিত করছি তারা কি যীশুকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখছি না!

৩. তৃতীয়ত: আমরা দেখতে পাই দু'জন দস্যুকে যাদের খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশারোপিত করা হয়েছিল আর তাদের একজন যীশুকে দেখেছিল ক্রুশে একজন অসফল ব্যক্তিরূপে।

আমরা জানি সেখানে যীশুর দুই দিকে দু'জন দস্যুকে, ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রথমজন যীশুকে দেখে ভেবেছিল সে কেবল অন্য আর একজন অপরাধী। সে ভেবেছিল যে, যীশু শুধুমাত্র এক পাগল ব্যক্তি যে বিশ্বাস করে যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। সে অগ্রাহ্য করেছিল খ্রীষ্টকে এক ধর্মীয় গোঁড়া ব্যক্তি হিসাবে, এবং তাঁর প্রতি তাকিয়ে খ্রীষ্টকে গালিগালাজ ও বিদ্রূপ করেছিল। সে অস্পষ্টভাবে ঈশ্বরনিন্দা করছিল। সে ভেবেছিল যীশু শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় গোঁড়া ব্যক্তি। সেইদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই এই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আমরা যারা যীশুর ক্রুশের চারপাশে আছি তারা যীশুকে নিয়ে কি ভাবিছি?

হ্যাঁ, দ্বিতীয় যে দস্যুকে আমরা ক্রুশের উপরে দেখতে পাই সে যীশুকে প্রভু ও পরিত্রাতা রূপে দেখতে পেয়েছিল। এই ব্যক্তি হয়তো সমস্ত সকালটা ধরে অন্য সকল জনতার সঙ্গে যীশুর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও পরিহাস করছিল। কিন্তু দুপুরে সমস্ত দেশ অন্ধকার হয়ে গেল। সে শুনতে পেলো যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছে তাদের জন্য যীশু প্রার্থনা

করছে। সে শুনতে পেয়েছিল যীশু প্রার্থনা করে বললেন, "পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না" (লূক ২৩:৩৪)। যীশুর এই প্রার্থনা ছিল যারা তাঁকে মারছে তাদের জন্য যা দ্বিতীয় দস্যুর হৃদয়ে গভীর ভাবে আলোড়ন নিয়ে এসেছিল। সে যীশুকে বিদ্রূপ করা বন্ধ করলো। সে মাথা তুললো, পরিত্রাতার প্রতি তাকাল, এবং তার হৃদয় বিগলিত হলো। সে কখনো জানতো না, এমন একজনকে যে তাঁর শত্রুদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এই ক্ষমার বিষয় নিয়ে এক কবি লিখেছেন:

"পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর"
এটাই কি তাঁর প্রার্থনা ছিল?
এমনকি যখন তাঁর শরীর থেকে রক্ত তড়িৎ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে!
এই বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর পাপীর জন্য প্রার্থনা!
কেউ নয় কিন্তু যীশু-ই সব সময় ভালবাসেন।
এ ভালবাসা রক্তের।
এজন্য তিনি মহিমান্বিত পরিত্রাতা, বহুমূল্য পরিত্রাতা।
এখন আমি দেখি তাঁকে কালভেরী ক্রুশে;
আঘাতপ্রাপ্ত এবং রক্ত ঝরছে,
অথচ পাপীর জন্য সনির্বন্ধ মিনতি তাঁর।
অন্ধ এবং অমনোযোগী যে আমি,
আমার জন্যই তিনি মরেছেন।"

হয়তো কবির এই উপলব্দি সেই সময়ে এই দ্বিতীয় দস্যুকে কবলিত করেছিল। সে আবিস্কার করেছিল যীশুকে পরিত্রাতারূপে আর

আত্মসমর্পন করেছিল সম্পূর্ণভাবে। এই আবিস্কার ও উপলব্ধি কি আমার আছে?

দস্যুদ্বয় দেখেছিল জনতার উগ্ররূপ এবং তাদের প্রতি যীশুর অকৃত্রিম ভালবাসা, এবং যীশুর ক্রুশের উপরে একটি ফলক যাতে লেখা ছিল, "এই ব্যক্তি যিহূদীদের রাজা" (লূক ২৩: ৩৮)। কিন্তু দু'জনের একজন মাত্র যীশুকে আবিস্কার করতে পেরেছি– সে তাঁর উপর বিশ্বাস করলো। সে নিশ্চিতভাবে শুনতে পেল যে, যীশু-ই জনতার আরোগ্যদাতা ও পরিত্রাতা। সে বুঝতে পেরেছিল এই ব্যক্তি হলেন যিহূদীদের সত্যিকারের রাজা। এই ব্যক্তিই হচ্ছেন খ্রীষ্ট। ইনিই হলেন পরিত্রাতা।

অন্যদিকে এই দস্যু জানতো যে, সে একজন পাপী। সে নিজের হৃদয়ে তা অনুভব করেছিল তার পাপ ও অন্যায়। তাই সেই অবিশ্বাসী অন্য দস্যুকে বলেছিল, "আমরা তো একই দণ্ড পাচ্ছি। আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাচ্ছি; কারণ যা যা করেছি, তারই সমুচিত ফল পাচ্ছি; কিন্তু ইনি কোন অপকর্ম করেন নি" (লূক ২৩:৪১)।

নতুন নিয়ম সহজভাবে প্রকাশ করেছে, "ধার্মিকতার জন্য মানুষ হৃদয়ে বিশ্বাস করে" (রোমীয় ১০:১০)। মৃত্যুপথযাত্রী দস্যু মাথা ঘুরিয়ে যীশুর দিকে তাকাল এবং সে বললো, "যীশু আপনি যখন আপন রাজ্যে ফিরে আসবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন" (লূক ২৩:৪২)। এই শব্দগুলো তার মুখ থেকে বের হওয়ার আগেই, এই দস্যু ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান পেয়ে গেছে। সে খুবই কম ধর্মতত্ব জানতো। ক্রুশে বিদ্ধ হবার আগে সে জানতো না যে, যীশু-ই প্রভু ও পরিত্রাতা।

BACIB | International Bible CHURCH

কিন্তু সে যীশুকে বিশ্বাস করেছিল, যেমন "ধার্মিকতার জন্য মানুষ হৃদয়ে বিশ্বাস করে।" সে সরলভাবে যীশুকে বিশ্বাস করেছিল। এটাই ঈশ্বর আমাদের কাছে দাবী করেন।

যে মুহূর্তে একজন পাপী বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাস করে ক্রুশারোপিত যীশুর উপর, তাঁর ক্ষমা সে তৎক্ষণাৎ পায়, তাঁর রক্তের মাধ্যমেই পূর্ণ মুক্তি সে অর্জন করে। সেই দস্যু যীশুকে বিশ্বাস করেছিল, এবং মুহূর্তে সে পরিত্রাণ পেয়েছিল।

আমরা জানি যে, এইভাবেই আমরা সকলে ঈশ্বরের রাজ্যে এসেছি। আমরা যীশুতে বিশ্বাস করেছি। আমরা তাঁর উপরে নির্ভর করেছি। আমরা তাঁর রাজ্যে এসেছি। আর যীশু সেই পরিত্রাণ প্রাপ্ত দস্যুকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে" (লূক ২৩:৪৩)। সেই দিনেই এই দস্যু ক্রুশের উপরে মারা যায় এবং যীশুর সঙ্গে পরমদেশে যায়। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে একজন কবি লিখেছেন:

ক্রুশারোপিত একজনের রক্তের দ্বারা পরিত্রাণ
এখন পাপ থেকে মুক্তি ও নূতন জীবন শুরু,
পিতার প্রশংসা গাও! এবং পুত্রের প্রশংসা গাও!
ক্রুশারোপিত একজনের রক্তের দ্বারা
আমি পাপ থেকে মুক্ত মুক্ত মুক্ত!
আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে,
আমার অপরাধ সব ধুয়ে গেছে
মুক্ত, মুক্ত, ক্রুশারোপিত একজনের রক্তের দ্বারা

আমি পাপ থেকে মুক্ত।

যে মুহূর্তে আপনি যীশুকে বিশ্বাস করবেন, এবং হৃদয় দিয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করবেন, ক্রুশের উপরে পরিত্রাতার পাশের দস্যুর ন্যায়– আপনি মুহূর্তের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান পাবেন। যীশু দস্যুকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। সেই দিন ক্রুশের উপরে রক্ত সেচনের মাধ্যমে যীশু সমস্ত মানুষের পাপ ধৌত করেছেন। আজও তাঁর সেচিত রক্ত আপনার সমস্ত পাপ ধৌত করতে সক্ষম। আজ যদি আপনি সরলভাবে যীশুতে নির্ভর করেন তবে তিনি তাঁর রক্তের মাধ্যমে আপনার সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন। আপনি পরিত্রাণ পাবেন। তাঁর রাজ্যে স্থান পাবেন। আপনি প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হবেন। খ্রীষ্টে আপনার নতুন জীবন হবে।

চতুর্থতঃ আমরা দেখতে পাই যে, যারা যীশুকে ভালবাসত, তাঁর সেবা করতো তারা বিদ্রুপকারী জনতার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বুক চাপরাচ্ছিল– যীশুর যন্ত্রণা নিজেদের হৃদয়মধ্যে উপলব্দি করছিল।

পবিত্র শাস্ত্র বলে, "আর সেখানে অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন, দূর থেকে দেখছিলেন; তাঁরা যীশুর পরিচর্যা করতে করতে গালীল থেকে তাঁর পিছনে পিছনে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের ও যোষির মা মরিয়ম এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মা ছিলেন" (মথি ২৭:৫৫-৫৬)।

এরা ছিলেন যীশুর সত্যিকারের পরিচর্যাকারী। নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, সময় ব্যয় করে, নিজেদের শ্রম দিয়ে এরা যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের পরিচর্যা করতেন। শুধু তাঁর মৃত্যুর সময়ে যে ক্রুশের

চারপাশে ছিলেন তা নয় কিন্তু যীশু তাঁর সারে তিন বছরের জীবন কালে যখন বিভিন্ন ভাবে পরিচর্যা করছিলেন তখনও তারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাদের সেবা করতেন। যিহূদী নেতারা যখন যীশুর বিচার করছিলেন– নানাভাবে তাঁকে শাস্তি দিচ্ছিলেন তখন এরা সেখানে ছিলেন। যীশুকে যখন ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল তখন এরাই বুক চাপরে চাপরে কান্না করতে করতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। ক্রুশের ঘটনার সমস্ত সময় ধরে এরা ক্রুশের কাছে থেকে সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করছিলেন। হ্যাঁ, যীশুর যে শিষ্যরা সারে তিন বছর ধরে তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলে তারা তাদের সেই গুরুকে ফেলে পালিয়েছিলেন কিন্তু এই সেবাকারীরা যীশুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

এরা সত্যিই সত্যের সেবাকারী ছিলেন। কিছু পাবার আশা করে নয় কিন্তু তাদেরটা দিয়েই তারা যীশুর সেবা করতেন। আজ তারা ক্রুশের সাক্ষী। সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষকারী। এমন কি ক্রুশের পরের ঘটনায়ও তারাই সাক্ষী। যীশুর দেহে সুগন্ধি তেল ও গন্ধরস মাখাতে তারাই এসেছিলেন কবরের কাছে। এরা সত্যিকারের মিনিষ্টার। এরা যীশুর সত্যিকারের পরিচর্যাকারী।

এখন ফিরে আসি আমাদের কথায়। আমরা যীশুর ক্রুশের চারপাশে বেশ কয়েক ক্যাটাগরির লোক দেখতে পাই। প্রথমত: প্রাচীন ও পুরোহিতবর্গ যারা যীশুকে তাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। দ্বিতীয়ত, আমরা প্রশিক্ষিত সৈনিকদের দেখতে পাই যারা যীশুর পোশাক খুলে নিয়ে গুলিবাঁট করেছিল কে সেই কাপড়খানা পেতে পারবে, আর তা বিক্রি করে অর্থ উপার্যন করতে পারবে। তৃতীয়ত,

আমরা যীশুর দু'পাশে দু'জন ডাকাত বা দস্যুকে দেখতে পাই যার একজন যীশুকে চিনতে পেরে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল আর যীশুর প্রতিজ্ঞা করা পরমদেশে গিয়েছিল। আর অন্যজন তার নিজের পাপে হারিয়ে গিয়েছিল। চতুর্থত, আমরা যীশুর একদল সেবাকারীকে দেখতে পাই যারা যীশুর দুঃখে নিজেদের বুক চাপরিয়ে দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ করছিল। যীশুর কষ্টে তাদের নিজেদের কলিজাই যেন ফেটে যাচ্ছিল।

আসুন, আজ আমরা নিজেদের একটু পরীক্ষা করে দেখি। আমরা যারা যীশুর চার পাশে আছি, তাঁর ক্রুশ ধ্যান করি, তাঁর ক্রুশের নীচে আছি বলে সমাজের কাছে নিজেদের জানান দিই, আমরা এই চার ক্যাটাগরির কোন ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছি।

আমরা যারা সমাজে পৌরহিত্য করছি এবং এর বিনিময়ে সামাজিক সুবিধা আদায় করে নিচ্ছি আমরা আজও কি যীশুকে আমাদের শত্রুই করে রেখেছি? আমরা যারা সৈনিকদের মত যীশুর ধার্মিকতার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করছি– নিজেদের ভাগ্য যাচাই করছি, আমরা এখনো কি সেই সৈনিকদের মত যীশুর পোশাক খুলে যীশুকে উলঙ্গ রাখছি এবং তাঁর ধার্মিকতা নিয়ে ব্যবসা করছি?

আমরা যারা যীশুর দু'পাশে থাকা দস্যু কিন্তু মন পরিবর্তন করে যীশুর সঙ্গে থাকতে চাই তাদেরকে যীশু আজও পরমদেশের প্রতিজ্ঞা করে থাকেন। আমরা যারা সেই সেবাকারীদের মত যারা তাদের সর্বস্ব দিয়ে যীশুর সেবা করতে চাই তারা আজও সত্যিকারের মিনিষ্টার,

পরিচর্যাকারী যাদের ঈশ্বর ভালবাসেন, সম্মান করেন তাঁর পুত্রের রাজ্যের সহভাগী করেন। আসুন, আমরা নিজেদের একটু যাচাই করি।

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের দুঃখভোগ এক ঐশ্বরিক সত্য

“কিন্তু আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় থেকে কয়েক জন যিহূদী এসে লোকদেরকে প্রবৃত্তি দিয়ে নিজেদের দলে ভিড়ালো। তারা পৌলকে পাথর মারলো এবং তিনি মরে গেছেন মনে করে নগরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু শিষ্যরা তাঁর চারপাশে দাঁড়ালে তিনি উঠে নগর মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরদিন তিনি বার্নাবাসের সঙ্গে দর্বীতে চলে গেলেন” (প্রেরিত: ১৪:১৯-২২)

কষ্ট ও দুঃখভোগকে আমরা কেউই সহজভাবে নেই না। নেবার কথাও নয়। তবুও দুঃখ-কষ্ট আমাদের জীবনে নেমে আসে। যাদের জীবনে দুঃখ আসার কথা আমরা মনে করি আমরা যখন তাদের জীবনে ঐশ্বরিক দুঃখ বা বিচার নেমে আসতে না দেখি, উল্টো ধার্মিকের জীবনে কষ্ট নেমে আসতে দেখি তখন মনের ভিতর থেকেই যে প্রশ্ন বের হয়ে আসে, ঈশ্বর তুমি কোথায়? একই প্রশ্ন রাজা দায়ূদ ও ভাববাদী ইয়োবের জীবনে দেখা যায়।

নতুন নিয়মের সময়ে, খ্রীষ্টান সমাজ-মণ্ডলী শুরুর পর্যায়ে তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের জীবনে নির্যাতনের বিভীষিকা নেমে এসেছিল। এই দুঃখভোগের কারণে বিশ্বাসীগণ মধ্যপ্রাচ্য সহ তৎতকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য এই ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখবরও ছড়িয়ে পরেছিল।

বিশ্বাসের কারণে দুঃখভোগ নেমে আসে। আর এটি আসবেও। এটিই শাস্ত্রের কথা। তবে আমরা যদি জানি যে আমাদের বিশ্বাসের কারণে এই কষ্ট নেমে আসছে তখন আমাদের আনন্দ করা উচিত কারণ এর ফল আমাদের জীবনে মহত্তর হয়ে দেখা দেয়।

চীন দেশের একজন পালকের কথা বলছি। মাও-সে-তুং যখন চীনের ক্ষমতা দখল করে তখন সে মাত্র ৩৯ বয়স বয়স্ক এক উদ্দিপ্ত পালক। এক দিন পুলিশ তার মণ্ডলীতে এসে ঘোষণা দিল যে, এখন থেকে এই মণ্ডলী সরকারের এবং মণ্ডলীর পালক সরকারী কর্মচারী। সুতরাং সরকার যেভাবে মণ্ডলী চালাতে বলবে পালক সেই ভাবেই তার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু পালক অস্বীকৃতি জানালেন। তাকে বন্দি করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। পালকের উপর ভীষণ চাপ প্রয়োগ করা হল কিন্তু তিনি তার বিশ্বাস থেকে সরে আসলেন না। বিচারে তার ২১ বছর জেল হয়ে গেল।

ঘরে তার স্ত্রী ও ছয়টি ছেলেমেয়ে এবং তার বৃদ্ধ মা। এদের সমস্ত দায়িত্ব এসে পরলো পালকের স্ত্রীর উপর। তার স্ত্রী অতি কষ্টে ছয়টি ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে লাগলেন। তিনি একটি কাজ জুটালেন

যার মজুরী ছিল দিনে মাত্র ৫০ টাকা। এই নিয়েই তার সংসার চলতে লাগল অতি কষ্টে। ছোট্ট একটি ঘরে এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে তাকে থাকতে হত।

একদিন তিনি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করলেন কেন তার জীবনে এই কষ্ট নেমে এসেছে। উত্তরে ঈশ্বর বললেন যে, তাঁর কাছ থেকেই এই কষ্ট নেমে এসেছে। তিনি ঈশ্বরকে বললেন যদি এই কষ্ট তোমার কাছ থেকে নেমে এসে থাকে তবে তা তোমার ইচ্ছা মতই হোক– কষ্ট বইবার শক্তি তুমি যোগাও।

তার স্বামী জেলে যাবার পর থেকে তার উপর মানসিক চাপ আসতে থাকে– মাংসিক অভিলাসের চাপ বাড়তে থাকে। সরকারী লোকেরা তাকে তার স্বামীকে পরিত্যাগ করতে বলে। এমন কি তারা অন্য একজন লোককেও ঠিক করে দেওয়া হয় বিয়ে করার জন্য। বিয়ে করলে নতুন ঘর ও ভাল চাকরী দেবার লোভ দেখানো হয়।

এদিকে তার স্বামী জেলে যাওয়ায় কোন ভাল কাজ তিনি পেতেন না– কোন অফিসে বা কারখানায় কাজ পেতেন না। অত্যন্ত কষ্টকর কাজ তাকে দেওয়া হত এবং কম বেতন দেওয়া হত।

এছাড়া তার উপর রাজনৈতিক চাপ ছিল। স্বামী জেলে ছিল বলে তাকে সরকার বিরোধী বলে গণ্য করতো। তার বিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য সব সময় চাপ প্রয়োগ করা হত। গোয়েন্দারা এসে নানা রকম অত্যচার করতো।

দীর্ঘ একুশ বছর জেল খাটার পর তিনি মুক্ত হয়ে আসলেন। যখন সে জেলে যায় তখন তার বয়স ছিল ৩৯ আর এখন তার বয়স ৬০ বছর। জেল থেকে ফিরে এসে তিনি আবার পালকীয় পরিচর্যা শুরু করেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রভুর রাজ্যের জন্য কাজ করতে থাকেন। তার মণ্ডলী এখন চীনে সবচেয়ে বড় মণ্ডলীর একটি। তার এই কাহিনী এখন দেশে দেশে বলা হয় নির্যাতিত খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্য।

আমরা পবিত্র শাস্ত্রে দেখেছি যে, প্রেরিত পৌলের উপর পাথর মারা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, কষ্টভোগ করতে করতেই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। আজকে আমরা খ্রীষ্টানদের দুঃখভোগের চিরন্তন সত্যের বিষয়েই চিন্তা ও ধ্যান করতে চাই যেন আমরা প্রস্তুত থাকতে পারি।

খ্রীষ্টানদের জীবনে দুঃখভোগ আসবেই। এটি শাস্ত্রীয় সত্য। ২ করিন্থীয় ১:৫ পদে বলে, "কেননা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে।"

ফিলিপীয় ১:২৯ পদ বলে, "যেহেতু তোমাদের খ্রীষ্টের খাতিরে এই দয়া দান করা হয়েছে যেন কেবল তাঁতে বিশ্বাস আনতে পার তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখভোগও করতে পার।"

বিশ্বাসীদের জীবনে কষ্টভোগ আসে। আমরা অনেকে মনে করি, যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস এনেছি সব সমস্যা তিনি তুলে নিয়েছেন– আর কোন সমস্যা আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র বলে

খ্রীষ্টানরা দুঃখভোগ করবে। আমরা পবিত্র শাস্ত্রে দেখতে পেয়েছি যে, অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। অনেকে মনে করেন যে, মণ্ডলীতে দুঃখভোগ বিষয়ে শিক্ষা দিলে অনেক বিশ্বাসীরা ভয়ে তাদের বিশ্বাস থেকে সরে যাবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই প্রেরিত পৌল বর্তমান পরিস্থিতি ও আগামী দিনের বাস্তবতার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।

পবিত্র বাইবেলে অনেক পদ আছে যেখানে দুঃখ ভোগ করার কথা বলা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন যে আমার পিছনে আসতে চায় সে আপন ক্রুশ বয়ে নিক। সুতরাং দুঃখ আসলে যেন আমরা হাসি মুখেই তা বরণ করে নিতে পারি এবং আনন্দিত মনেই তার মোকাবেলা করতে পারি কারণ আমরা জানি যে, এর শেষ ফল আনন্দের।

একজন বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বর দুঃখভোগ ঘটতে দেন। অনেক সময়েই ঈশ্বর আমাদের জীবনে দুঃখভোগ যোগ করেন। আমাদের কষ্টের জন্যই যে তিনি তা যোগ করেন তা নয় কিন্তু এর ফলে যেন সুসমাচারের দরজা খুলে যায় এবং আরও অনেক লোক পরিত্রাণের আলো খুঁজে পায় সেজন্য তিনি তা আমাদের জীবনে অনুমোদন করে থাকেন। যেহেতু খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের দুঃখভোগ করতে হবে তাই ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুঃখভোগ করার জন্য আমাদের প্রস্তুতও থাকতে হবে। ১ পিতর ২:১৯, ২০ পদে এই সত্যটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানে লেখা আছে: "কেননা কেউ যদি ঈশ্বরের উদ্দেশে বিবেক অনুয়ায়ী অন্যায় ভোগ করে দুঃখ সহ্য করে, তবে তা-ই সাধুবাদের বিষয়। বস্তুতঃ পাপ করে মার খেয়ে যদি তোমরা সহ্য কর, তবে তাতে

প্রশংসা করার কি আছে? কিন্তু সদাচরণ করে দুঃখভোগ করলে যদি সহ্য কর, তবে তা-ই হবে ঈশ্বরের কাছে সাধুবাদের বিষয়।”

পৌল এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তিনি তিনবার প্রার্থনা করে বলেছিলেন যেন তার শরীরের কাঁটা প্রভু দূর করেন কিন্তু ঈশ্বর দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে এই কাঁটা থাকাটা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং এই দুঃখ ভোগ তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

অনেক খ্রীষ্টান দুঃখ আসলেই পরাজিত হন কারণ তারা জানে না যে, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি তারা এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পায় তবে তারা অন্তরে শক্তি পাবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে। রোমীয় ৮:২৮ পদে এই কথা বলে, “আর আমরা জানি, যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহ্বান পেয়েছ, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে।”

ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে দুঃখ ভোগ তাতে জীবনের বিশেষ অর্থ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুঃখভোগ করি তখন সর্বদাই এর পিছনে কোন অর্থ ও উদ্দেশ্য থাকে। আমাদের সরল ভাবেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ঈশ্বর কেন তার লোকদের জীবনে নির্যাতন ও কষ্টভোগ আসতে দেন তার কতগুলো কারণ নতুন নিয়মে দেওয়া হয়েছে:

- বিশ্বাসের পরীক্ষা ও সিদ্ধতা প্রমাণের জন্য (১ পিতর ১:৬-৭; যাকোব ১:২-৪ পদ)

- ♦ অহংকার পুড়িয়ে ফেলবার জন্য (যেমন পৌলের জীবনে ২ করিন্থীয় ১২:৭-১৯ পদ)
- ♦ আমাদের জীবনকে আরও পবিত্র করার জন্য (ইব্রীয় ১২:৩-১০ পদ)
- ♦ অন্যের আত্মিক জীবন শক্তিশালী করার জন্য (ফিলপীয় ১:১৪ পদ)
- ♦ আমরা জানি না এমন কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য (১ করিন্থীয় ৩:১২ পদ)
- ♦ ঐক্যের জন্য একত্রিত করা – যেন এক আত্মিক শক্তি নিয়ে আসে (প্রেরিত ২:৪২-৪৭ পদ)। নির্যাতনের ফলে তারা বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়েছে এবং তাদের সংখ্যাও বেড়েছে।
- ♦ আত্মা জয়ের সুবৃহৎ সাফল্য আনার জন্য (প্রেরিত ৮:১-৪ পদ)।

ন্যায়ের পক্ষে দুঃখভোগ করার মধ্যে আশীর্বাদ রয়েছে। অন্যায় করে দুঃখভোগ করার মধে যে দীনতা রয়েছে ঠিক একই ভাবে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার ফলে, ন্যায় কাজ করে কষ্ট পাওয়ার মধ্যে মহত্ব রয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মহান লোকেরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবার জন্যই কষ্টভোগ করেছেন এবং ন্যায়ের পক্ষে কষ্টভোগ করার মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু তাদের মধ্যেই গণ্য হন। কারণ আপনিও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করবার জন্য কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। নতুন নিয়ম বলে যে, আমরা যখন পরীক্ষায় পরি তখন তা যেন আনন্দের বিষয় বলে গণ্য করি কারণ এর মধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে “হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন নানা রকম পরীক্ষায় পড়, তখন তা সর্বতোভাবে

আনন্দের বিষয় বলে মনে করো; জেনো, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ধৈর্য উৎপন্ন করে” (যাকোব ১:২-৩)। পরীক্ষায় জয়ী হলে আমরা জয়ের মুকুট পাব।

দুঃখভোগের বিষয়গুলো স্বর্গের মহিমার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের দুঃখকষ্ট ভোগ করা ফল হল স্বর্গে আমাদের জন্য গৌরব রক্ষিত আছে। আমাদের মনকে সেদিকে ঘুরিয়ে রাখে। যারা কষ্টভোগ করে তাদের জন্য স্বর্গের মহৎ মহৎ আশীর্বাদ প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, “ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদেরকে নিন্দা করে ও নির্যাতন করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের বিরুদ্ধে সব রকম মন্দ কথা বলে। আনন্দ করো, উল্লসিত হয়ো, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের আগে যে নবীরা ছিলেন, তাঁদেরকে তারা সেইভাবে নির্যাতন করতো” (মথি ৫:১১, ১২)।

পৌল বলেছেন স্বর্গে আমাদের জন্য যে গৌরব রয়েছে সেই তুলনায় এই পৃথিবীতে আমরা যে কষ্টভোগ করি তা খুবই সামান্য (রোমীয় ৮:১৭-১৮)। যারা দুঃখভোগ করছে তারা খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী। দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টানরা যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে (১ পিতর ২:২১-২৫)। দুঃখভোগের সময়ে আমরা প্রকৃতভাবে তাঁর সংগে দুঃখের অংশী হই, “আর যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারী, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ও খ্রীষ্টের সহ-উত্তরাধিকারী– যদি বাস্তবিক আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি তবে তাঁর সঙ্গে মহিমান্বিতও হব” (রোমীয় ৮:১৭)। যীশুর দুঃখভোগের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল

এবং আমাদের ক্ষেত্রেও তা করা হয়েছে। জগৎ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে একই ভাবে জগৎ আমাদেরও প্রত্যাখ্যান করবে এবং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বিজয়ী হওয়া যায়। এই মূল বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে। দুঃখভোগ বিজয়ের চাবিকাঠি। বিশ্বাসের জন্য যখন দুঃখ নেমে আসে এবং এই দুঃখ-কষ্টের সময়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে আত্মিক জগতে আমাদের বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। আমরা পরীক্ষায় পাশ করি এবং এর ফলও আমাদের জীবনে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ: ভাববাদী ইয়োব, দায়ূদ, যীশু খ্রীষ্ট, যীশুর শিষ্যগণ যদি কষ্টভোগ না করতেন তবে হয়তো আমরা খ্রীষ্টের কাছে আসবার সুযোগ পেতাম না। সম্পদ এবং প্রাচুর্য আমাদের বিজয় এনে দেয় না কিন্তু দুঃখভোগকে বরণ করে নেবার মধ্যেই আছে প্রকৃত বিজয়। আমাদের এই সত্যকে বিশ্বাস করতে হবে আমাদের জীবনে যাই ঘটুক না কেন সব কিছু বিশ্বাসীদের মঙ্গলের জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

উপসংহারে শুধু এই কথা বলতে চাই– মন্দ কাজের জন্য নিশ্চয় আমরা দুঃখভোগ করব না। আমাদের জীবনে কষ্ট নেমে আসতেই পারে আর তা যদি হয় আমাদের অন্যায়ের জন্য, খারাপ আচরণের জন্য, আমাদের পাপের জন্য, অথবা আমাদের দুষ্ট কাজের জন্য তবে সেই দুঃখভোগের মধ্যে কোন মাহাত্য নেই– নেই কোন মর্যাদা। অনেক সময় আমরা নিজেরাই নিজেদের নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়াই। আমরা যে সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বসবাস করি তখন অনেক সময়ই

অহেতুক অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে দুঃখভোগ ডেকে নিয়ে আসি। অনেক সময় আমরা এমন কিছু করি যা আমাদের প্রতিবেশীরা পছন্দ করে না ফলে আমাদের উপর নির্যাতন নেমে আসে। এর জন্য আমরা কোন পুরস্কারও পাব না কারণ এই কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পাওনা ফল ভোগ করছি।

আমাদের কষ্টভোগ যেন আমাদের ধার্মিকতার জন্য হয়– আমাদের বিশ্বাসের জন্য হয়– আমরা ভাল বলে যেন দুর্নামের ভাগি হই। আমরা ধন্য হব যদি ধার্মিকতার জন্য এবং তাঁর নামের জন্য দুঃখভোগ করি।

সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি আমাদেরকে খ্রীষ্টে নিজের অনন্ত মহিমা দেবার জন্য আহ্বান করেছেন, তিনি নিজে আমাদের ক্ষণিক দুঃখভোগের পর আমাদেরকে পরিপক্ক, সুস্থির, সবল, বদ্ধমূল করবেন। যুগপর্যায়ের যুগে যুগে তাঁরই পরাক্রম হোক। আমেন।

বাংলাদেশের মণ্ডলীর জন্য ভবিষ্যত নির্দেশনা ও পূর্বাভাষ

“আমি যে এখন তা পেয়েছি, কিম্বা এখনই লক্ষ্যে পৌঁছেছি তা নয়; কিন্তু যার জন্য খ্রীষ্ট যীশু কর্তৃক ধৃত হয়েছি, কোনক্রমে তা ধরবার চেষ্টায় দৌড়াচ্ছি। ভাইয়েরা, আমি যে তা নিজের চেষ্টায় ধরেছি, নিজের বিষয়ে এমন মনে করি না; কিন্তু একটি কাজ করি, অতীতের বিষয়গুলো ভুলে গিয়ে সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হয়ে, লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার পাবার জন্য যত্ন করছি।” (ফিলিপীয় ৩:১২-১৪)

বাংলাদেশের খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান সমাজ একটা খুবই ছোট সমাজ। খুব সম্ভবত এর মূল কারণ গত দুই শত বছর ধরে মণ্ডলীর যে ক্রমবৃদ্ধি তা পরিকল্পিত উপায়ে হয় নি। আমার কাছে মনে হয়েছে মণ্ডলীগুলো তাদের বৃদ্ধির কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির না করেই কাজ করে যাচ্ছে। তাই আমি আজকের লেখায় ‘মণ্ডলীকে মণ্ডলীর ক্রমবৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থাপন’ করার বিষয়ে একটু বেশী জোর দিব। হয়তো কেউ কেউ মনে করে থাকবেন “লক্ষ্য স্থির করা” পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করা নয়, কিন্তু আমরা যীশু খ্রীষ্টের পর একজন খুবই কার্যকর পরিচর্যাকারীকে অর্থাৎ প্রেরিত পৌলকে দেখতে পাই যিনি লক্ষ্য স্থির করে কাজ করেছেন। যে কোন কাজই আমরা সম্পন্ন করতে চাই, তার

জন্য লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন কারণ লক্ষ্য পরিকল্পনার জন্ম দেয়, পরিকল্পনা কি কাজ করতে হবে তা নির্ধারণ করে দেয়, সেই নির্ধারিত কার্যসমূহ ফল চয়ন করে এবং সেই ফল আমাদের জীবনে সন্তুষ্টতা বয়ে নিয়ে আসে।

বছরের প্রথম দিকে, আমরা হয়তো বড় কিছু বা ক্ষুদ্র কিছু, দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী কোন কিছু প্রস্তুত করি, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা আমরা করতে পারি তা হল একটি 'সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য' স্থির করা। আজকের পুস্তক পাঠে পৌল সেই কথাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

এই পৃথিবীতে আমরা একটি ভ্রমনে বা জার্নিতে রয়েছি। এই জার্নিতে থাকা অবস্থায়ই আমরা নিরূপিত কর্ম সকল করে যাচ্ছি। কিন্তু নিরূপিত কর্ম সকল করার জন্য হয়তো আমরা এখনও কোন এক্সপার্ট হয়ে গড়ে উঠি নি, কিন্তু পৌলের মত লক্ষ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি স্থির রাখতে পারি এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করার জন্য নিজেকে চাপের মুখে রাখতে পারি। পবিত্র শাস্ত্রে দেখতে পাই যে, ঈশ্বর আমাদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর হবার জন্য আহ্বান করেছেন কিন্তু যদি আমাদের চোখ সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিবিষ্ট না রাখি, তবে সামনে পৌঁছাতে ব্যর্থ হব। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন তৎকালীন জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত যিনি লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে গেছেন:

- ♦ তিনি তাঁর ১২ জন্য শিষ্যকে ট্রেনিং দেবার জন্য লক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন,
- ♦ আমাদের পাপের বদলী হিসাবে মৃত্যুবরণ করার লক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন,
- ♦ ঈশ্বর দেখতে সত্যিই কেমন সেই অদেখা ঈশ্বরকে তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে দৃশ্যমান করার জন্য লক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন।

শয়তান ঈশ্বর সম্পর্কে আদম ও হবাকে মিথ্যে কথা বলেছিল (আদিপুস্তক ৩:৫) সেটা আমরা জানি। কিন্তু যদি যীশু কোন লক্ষ্য বা নির্দেশনা ছাড়া এই পৃথিবীতে আসতেন তবে তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেই কর্মসূচি পূর্ণ করতে হয়তো তিনি ব্যর্থ হতেন।

‘সময়’ সব সময়ই মূল্যবান এবং বাংলাদেশের মণ্ডলীগুলোকে এই সময়কে যথার্থ ভাবেই ব্যবহার করতে হবে। কথায় বলে, Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. আমাদের হাতে মাত্র একটি দিনই থাকে আর তা হল ‘আজ’ এবং যদি আমরা তা সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার না করি তবে খুব শীঘ্রই তা অতিবাহিত হয়ে যাবে যা আর কখনও ফিরে আসবে না। আমাদের পিতার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য হয়তো আর একটা দিন ফিরে নাও আসতে পারে। ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন কেমন ভাবে একটি অর্থপূর্ণ লক্ষ্য স্থির করা যায়, সুতরাং আসুন এটাকে আর একটু

বিস্তারিত ভাবে দেখি।

১. ‘লক্ষ্য স্থাপনের নির্দেশনা’ চেয়ে মণ্ডলীকে প্রার্থনা করতে হবে

কেউ কেউ ভাবেন যে, লক্ষ্য স্থির করার জন্য কেন আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, কিন্তু ঈশ্বর মাত্র সেই একজন যিনি ভবিষ্যৎ জানেন। সেইজন্য আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করতে হবে যেন আমাদের হৃদয়ে তিনি সেই লক্ষ্য স্থাপন করেন যে ‘লক্ষ্য স্থাপন’ তিনি চান। আমরা নিজেরা যখন লক্ষ্য স্থাপন করি তখন সেই লক্ষ্য কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের দর্শন কখনও পরিবর্তন হয় না, যদিও আমাদের লক্ষ্য পরিবর্তন হয়। দেখুন শাস্ত্র কি বলেঃ

- “মানুষ মনে মনে নানা সঙ্কল্প করে, কিন্তু জিহ্বার উত্তর সদাপ্রভু থেকে হয়।” (হিতোপদেশ ১৬:১)
- “মানুষের মন নিজের পথের বিষয় সঙ্কল্প করে; কিন্তু সদাপ্রভু তার পদক্ষেপ স্থির করেন।” (হিতোপদেশ ১৬:৯)
- “মানুষের মনে অনেক সঙ্কল্প হয়, কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকবে।” (হিতোপদেশ ১৯:২১)

পৌলকে যে পরিচর্যা করার অপূর্ব সুযোগ প্রভু দিয়েছিলেন সেখানে তিনি এরকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু লক্ষ্য করুন কি ঘটেছিলঃ “তাঁরা ফরুগিয়া ও গালাতীয়া প্রদেশ দিয়ে গমন করলেন, কেননা এশিয়া প্রদেশে বাক্য প্রচার করতে পবিত্র আত্মাকর্তৃক নিবৃত্ত হয়েছিলেন। আর তাঁরা মুশিয়া

দেশের কাছে উপস্থিত হয়ে বিথুনিয়ায় যেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁদেরকে যেতে দিলেন না।” (প্রেরিত ১৬:৬-৭)

পৌল এশিয়াতে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা তাঁকে ইউরোপে যেতে নির্দেশনা দিলেন। পৌলকে তখন যা করতে বলা হয়েছিল তিনি তা-ই করলেন। তিনি হিতোপদেশের কথা পালন করেছিলেন, যেখানে লেখা আছে: “দয়া ও বিশ্বস্ততা তোমাকে ত্যাগ না করুক; তুমি এদের তোমার গলায় বেঁধে রাখ, তোমার হৃদয়-ফলকে লিখে রাখ। তা করলে অনুগ্রহ ও সুবুদ্ধি পাবে, ঈশ্বরের ও মানুষের দৃষ্টিতে পাবে; তুমি একাগ্র চিত্তে সদাপ্রভুর উপর ভরসা রাখ; তোমার নিজের বিবেচনায় নির্ভর করো না; তোমার সমগ্র পথে তাঁকে স্বীকার কর; তাতে তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করবেন।” (হিতোপদেশ ৩:৩-৬)

পৌলের মত আমাদের ‘লক্ষ্য’ হতে পারে ভাল এবং হয়তো ভবিষ্যতে তা অনুমোদন করাও হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে পবিত্র-আত্মার কথা শ্রবণ করা প্রয়োজন তারপর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। পবিত্র আত্মা আমাদের নির্দেশনা দেন, আমাদের জটিল সময়ে তিনি নির্দেশনা দেন। একজন স্ত্রীলোক ড. চার্লস স্টেনলিকে জিজ্ঞাস করেছিলেন, “বিশ্বাসে জীবন-যাপন করে কি লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব? যখন ড. স্টেনলি বললেন হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে? ড. স্টেনলি বললেন যে,

এটা ঠিক বিদুৎ চমকানোর মতই আসে কিন্তু নিশ্চিত হতে হবে যে, "সেই লক্ষ্য নির্ধারণ ঈশ্বরের হৃদয় থেকে এসেছে কি না।"

লক্ষ্য নির্ধারণ করার সময় এমন কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো মণ্ডলী হিসাবে আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত:

১) এই কাজটি করতে চাওয়ার জন্য আমাদের উদ্দেশ্য বা কারণ কি?

২) আমরা কি স্বার্থপরের মত লক্ষ্য নির্ধারণ করছি অথবা আমরা কি তাই করতে চাইছি যা ঈশ্বর চান?

৩) আমরা কি 'তাঁর লক্ষ্যকে' সম্পূর্ণ করার জন্য কাজ করছি?

৪) এই কাজের মধ্য দিয়ে কি তাঁর ধার্মিকতার রাজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে?

৫) এই লক্ষ্য স্থাপনের মাধ্যমে আমরা কি আত্মিক নীতিকে অমান্য করছি?

৬) আমি বিশ্বাস করি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে আমাদের সঠিক লক্ষ্য স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২. লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মণ্ডলীকে এ্যাকশনের জন্য তৈরি হতে হবে

আমরা কখনোই কোন যথার্থভাবে স্থাপিত কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে পারবো না, যদি আমরা কোন কাজ না করি, কোন একশনে না যাই। একটি ছোট ঘটনার কথা বলছি: কলেজের একজন তরুণ ছাত্র আরেকজন তরুণের সাথে ছাত্রাবাসের একটি কক্ষ শেয়ার

করেছিল। সে প্রথম যে কাজটি করেছিল তা হচ্ছে, সে তার কক্ষের দরজার ভেতর দিকে “ভি” (V) লেখা একটি পিতলের ফলক টাঙ্গিয়েছিল। তার সহপাঠীরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এর মানে কি, সে কোন উত্তর দেয় নি। প্রতিদিন সে এমনভাবে সেই “ভি” লেখা ফলকটিকে পরিষ্কার করতো, যেন এটাই পৃথিবীতে তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে তার সহপাঠীরা তাদের গ্রাজুয়েশনের দিনে ঠিকই এর অর্থ বুঝতে পারলো, যখন সেই ছাত্রটি তার গ্র্যাজুয়েশন ক্লাসে তাদের সকলের মধ্যে “ভ্যালেডিকটরিয়ান” (Valedictorian) বলে গণ্য হল। সে তার কলেজের প্রথম দিন থেকেই তার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে রেখেছিল এবং সে তার লক্ষ্য অর্জন করেছিল।

আপনারা হয়তো ইতিমধ্যেই আমাদের কিতাবুল মোকাদ্দস ডিকশনার-ীটি দেখেছেন। আমাদের খ্রীষ্টান সাহিত্য-ভাণ্ডারে এটি একটি বড় কাজ। আমার কর্ম অভিজ্ঞতায় জানি এরকম একটি কাজ সম্পাদন করতে ৮-১০ বছর সময় লাগে। কিন্তু আমরা প্রকল্পের প্রথমেই লক্ষ্য স্থির করেছিলাম যে, এটি ৩ বছরের মধ্যে সমাপ্ত করবো। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা প্রতিদিন কাজ করেছি। তিন বছরের আগেই এটা আমরা ছাপিয়ে মানুষের হাতে দিতে সক্ষম হয়েছি। ‘লক্ষ্য নির্ধারণ’ সব সময়ই এই কাজ শেষ করতে আমাদেরকে চাপের মুখে রেখেছিল এবং আমরা তা করতে সক্ষম হয়েছি।

একটি ছোট্ট ছেলে আকাশে এলোমেলো ভাবে তীর ছুঁড়ছিল। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কিসের দিকে তাক করে তীর ছুঁড়ছো, তখন সে বললো, "কোন কিছুর দিকেই নয়।" সে বার বার লক্ষ্যহীনভাবে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিল। আমরা যদি নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুকে আমাদের 'লক্ষ্য' হিসেবে নির্ধারণ না করি, তাহলে আমরা এমন কিছুকে আঘাত করি যা "কোন কিছুই নয়"। এ ব্যাপারে প্রেরিত পৌলের বক্তব্য লক্ষণীয়: "ভাইয়েরা, আমি যে তা নিজের চেষ্টায় ধরেছি, নিজের বিষয়ে এমন মনে করি না; কিন্তু একটি কাজ করি, অতীতের বিষয়গুলো ভুলে গিয়ে সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হয়ে, লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার পাবার জন্য যত্ন করছি। (ফিলিপীয় ৩:১৩,১৪)।

যখন আমরা নির্দিষ্টভাবে জানবো মণ্ডলী হিসাবে আমরা কি চাই– আমাদের লক্ষ্য কি এবং তা অর্জনের জন্য কি কাজ করে যেতে থাকব, মাত্র তখনই আমরা তা অর্জনে শতভাগ সাফল্য লাভের আশা করতে পারি। তবে বাস্তব বিষয় হল, বিশ্বাসীদের নিয়ে যে মণ্ডলী তাদের প্রায় ৯৫ শতাংশ বিশ্বাসীদের জীবনে *কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই*। বহু বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জরিপে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের মাত্র ৩ শতাংশের লিখিত লক্ষ্য ছিল এবং আবার অনেক বছর পরের এক জরিপে দেখা যায় এর তেমন কোন উন্নতি হয় নি। যে ৩ শতাংশ

শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, তারা অন্য সকল শিক্ষার্থীদের তুলনায় তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোমাত্রায় সফল হয়েছে।

'লক্ষ্য' আমাদেরকে দেখতে সাহায্য করে যে, ভবিষ্যৎটা কেমন হতে পারে। প্রেরিত পৌলের লক্ষ্য ছিল আত্মা জয় করা, যত বেশি পরিমাণে সম্ভব মানুষের সাথে সুসমাচার শেয়ার করা। হয়তো বা তিনিও যেন তাঁর দরজায় "এস" (S) লেখা একটি পিতলের ফলক ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, যা "শেয়ার" করা বা সহভাগিতার (SHARE) অর্থ বহন করে। যখন আমরা কাজের জন্য প্রস্তুত হই, তখন আমাদের বয়স যাই হোক না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই তা অর্জনের জন্য কাজ শুরু করতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তিরা হয়তোবা মনে করতে পারেন যে, আমরা এ কাজ করার জন্য অনেক বেশি বয়স্ক হয়ে গেছি, কিন্তু তাদেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে জীবনে লক্ষ্য স্থির করার। আর যদি তারা তা না করেন, তাহলে তারা জীবনভর শুধু ঘুরবেন-ফিরবেন, খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং এক সময় মারা যাবেন।

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ বয়স কোন ফ্যাক্টর নয়। চিন্তা করুন, কালেব যখন তার শ্বশুরকে বলেছিলেন "আমাকে ঝর্ণাসহ ঐ পাহাড়গুলো দিন," তখন তার বয়স ছিল ৮৫। কর্নেল স্যাণ্ডারস (কে এফ সি বা কেনটাকি ফ্রাইড চিকেনের প্রতিষ্ঠাতা) যখন প্রথম "ফিঙ্গার লিকিং গুড চিকেন" বা "আঙ্গুল চেটেপুটে খাওয়ার মত মজাদার মুরগির মাংস" তৈরি করেন, তখন তার বয়স ছিল ৭০ বছর। রে ক্রক তার ৭০ বছর বয়সে আমেরিকাকে বিগ ম্যাক বা ম্যাকডোনাল্ডস-এর সাথে পরিচয়

করিয়ে দেন। পিকাসো তার ৮৮ বছর বয়সেও ছবি আঁকতেন। টমাল আলভা এডিসন, যিনি বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তিনি ৮৫ বছর বয়সে মিমিওগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কোন বিষয়ে সাফল্য অর্জন করার পক্ষে খুব বেশি বয়স্ক আমরা কখনোই হব না, যদি আমরা এর জন্য কোন লক্ষ্য স্থির করি এবং সেই অনুসারে কাজ করি।

৩. মণ্ডলীকে বিরোধিতা মোকাবেলা করার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে

ব্যক্তি জীবনে ও মণ্ডলীর জীবনে বিরোধিতা মোকাবেলা করা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সকলেই দুই ধরনের বিরোধিতার মুখে পড়ে থাকি: ১) শত্রুদের বিরোধিতা; ২) ব্যর্থতা। প্রভু যীশু, মোশি, যোষেফ, পৌল এরা সকলেই বিরোধিতার মুখে পড়েছেন এবং আমরাও পড়বো।

এই নামগুলো পড়ুন এবং চিন্তা করে দেখুন আপনি তাদেরকে চেনেন কি না: ১) শম্মূয়; ২) শাফট; ৩) যিগাল; ৪) পল্টি; ৫) গদ্দীয়েল; ৬) গদ্দি; ৭) অম্মীয়েল; ৮) সথুর; ৯) নহ্‌বি; ১০) গূয়েল। এদের কারও কথা কি আপনার মনে পড়ছে? হয়তো বা না, কারণ এরা হচ্ছে সেই ১০ জন গুপ্তচর, যারা বলেছিল, "যারা সেখানে বাস করে তাদের গায়ে শক্তি বেশী এবং তাদের শহরগুলোও বেশ বড় বড় আর দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঐ লোকদের সংগে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়;

আমাদের চেয়ে তাদের গায়ে শক্তি বেশী। আমরা যে দেশের খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছি সেই দেশটা তার বাসিন্দাদের গিলে খেয়ে ফেলে। যে সব লোক আমরা সেখানে দেখেছি তারা দেখতে খুব বড়। তাদের দেখে আমরা নিজেদের মনে করলাম ঘাস-ফড়িং আর তারাও আমাদের তা-ই মনে করল।" মনে আছে সেই লজ্জাষ্কর উক্তিগুলোর কথা? তারা ভুলে গিয়েছিল যে, ঈশ্বর তাদেরকে বলেছিলেন এই দেশ তাদেরই হবে! তাদের বেশিরভাগ রিপোর্টই ছিল মিথ্যে, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে যা দিতে চেয়েছিলেন তাদের অবিশ্বাসের জন্যই তারা তা পায় নি।

তারা ঈশ্বরকে ছোট করেছিল এবং সেই দৈত্যাকৃতির মানুষগুলোকে বড় করে দেখেছিল। তারা তাদের দূরবীনের উল্টো দিক থেকে সেই লোকগুলোকে দেখেছিল এবং আমরা যদি সতর্ক না হই তাহলে আমরাও এই একই ভুল করে বসতে পারি।

সব সময়ই আপনি কোন না কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন। সব সময়ই আমাদের সামনে বিরোধীরা অবস্থান নেবে, যারা আমাদের পরাজয় দেখতে চায়। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের সাফল্য তাদের পরাজিত করবে, তাই তারা যে কোন মূল্যে আমাদের পতন দেখতে চায়। তারা চায় যেন আমরা উল্টো তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে এগিয়ে যেতে না পারি। যখন ঈশ্বর কোন সুযোগের দরজা খুলে দেন, তখন কোন না কোন মানুষ ঠিকই থাকে যারা সেই দরজা বন্ধ করে দিতে

চায়। কেউ কেউ সব সময়ই আমাদের লক্ষ্যকে অস্পষ্ট করে দিতে চায় এবং আমাদের সঙ্কল্পকে ধ্বংস করে দিতে চায়।

একবার এক জ্ঞানী ব্যক্তি কি বলেছিলেন তা শুনুন:

- “একজন অন্ধ ব্যক্তি যা কিছু স্পর্শ করতে পারে তার মাঝেই তার জগৎ সীমাবদ্ধ।”
- “একজন মূর্খ ব্যক্তি যা কিছু জানে তার মাঝেই তার জগৎ সীমাবদ্ধ।”
- “একজন মহৎ ব্যক্তির জগতের সীমানা চিহ্নিত হয় তার স্বপ্নের দ্বারা– তার দর্শনের দ্বারা।”

আর দেখুন, নতুন নিয়মে প্রেরিত পৌল কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “কারণ আমার সম্মুখে কাজ করার একটি বড় খোলা দরজা রয়েছে এবং অনেকে এর বিপক্ষতাও করছে” (১ করিন্থীয় ১৬:৯)। বিপক্ষতাকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যও সঠিকভাবে অর্জন করতে পারবো না। যীশু খ্রীষ্টই ছিলেন একমাত্র মানুষ যিনি তার সবগুলো লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। আমরা যদি কোন লক্ষ্য স্থির করি, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং বিরোধিতা মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ব্যর্থতা দুর্ভাগ্যসূচক কোন কিছু নয়। আমরা সকলই কোন না কোন সময় সফল হব, তা এখন হোক বা পরে হোক। ব্যর্থতা মোটেও মারাত্মক কিছু নয় এবং এটাই শেষ কথা নয়। এটা তখনই সমাপ্তি বলে গণ্য হবে যখন আমরা তা সমাপ্তি বলে রায় দেব। এ বিষয়ের ব্যাখ্যা হিসেবে আসুন আমরা দু'টি গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করি– একটি হচ্ছে জাপানী বনসাই এবং আরেকটি হচ্ছে ওয়েস্টার্ন সিকোইয়া। কোন গাছের মূল শিকড় বেঁধে দিয়ে এবং মাটি ভেদ করে যে শিকড়গুলো বের হয় সেগুলোকে বেঁধে দিয়ে বনসাঁই তৈরি করা হয়। এটি কখনোই ১৫-১৮ ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। অপরদিকে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'সিকোইয়া' নামের এক ধরনের গাছ রয়েছে, যেগুলো লম্বায় ২৭২ ফুট এবং ব্যাস ৮০ ফুট হয়ে থাকে। পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং-এ রকম গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছ থেকে এত কাঠ পাওয়া যায় যে, তা দিয়ে পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট প্রায় ৪৫টি বাড়ি তৈরি করা যায়। এই দু'টি গাছের মধ্যে পার্থক্য কি? একটি মাত্র জিনিস। এদের কোন বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই। সিকোইয়ার স্বভাব হচ্ছে বিশাল আকৃতি ধারণ করা এবং সে তাই করে। বনসাই হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতির এবং তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছোট করে রাখা হয়।

আমাদের সাথে এদের কি সম্পর্ক? একটি বিষয়। এদের বেছে নেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমাদের রয়েছে। আমরা তা করতে পারি যদি আমরা আমাদের লক্ষ্য স্থির করি এবং সেই উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাই। আমরা এই বছরকে আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বছর করে গড়ে তুলতে পারি, যদি আমরা আমাদের লক্ষ্য আজকেই স্থির

করি এবং আজকে থেকেই কাজ শুরু করি। এই বছরটি আপনার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বছর হিসেবে পরিণত হতে পারে অথবা তা হতে পারে আপনার ব্যর্থতার বছর। এটি নির্ভর করে আপনারই উপরে। ঈশ্বর আপনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, আর তাই কোন মানুষও তা পারে না।

উপসংহারঃ আমরা যে দেশে বাস করি এটাকে বলা হয় উর্বর ভূমি। এদেশের মানুষগুলোও খুবই উর্বর। অথচ দুইশত বছর ধরে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী এই জমি সুখবরের বীজ দিয়ে চাষ করছে কিন্তু ফসল খুবই কম ফলেছে। হয়তো আমরা সঠিকভাবে চাষ করতে পারি নি– হয়তো আমরা সঠিকভাবে সার ও জল দিতে পারি নি। কিন্তু প্রেরিত পৌল বলেছেন যে, আমাদের সামনে একটি বৃহৎ দরজা খোলা রয়েছে– সংগে সংগে এর বিপক্ষতাও রয়েছে। গত বিশ বছর ধরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এদেশে বৃহত্তর সমাজে সুখবর প্রচার করা সম্ভব এবং সঠিক ভাবে সুখবর পৌঁছে দিতে পারলে ভাল ফল লাভ করা সম্ভ ব। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক মণ্ডলী, ডিনমিনেশন, মণ্ডলী সংগঠন এখন বৃহত্তর সমাজের কাছে সুখবর প্রচার করার জন্য কাজ করছে যারা ১০ বছর আগে তা করতেন না এবং দৃশ্যত ভাল ফল লাভ করছে। এখনও বেশীর ভাগ মণ্ডলীর কাজ 'হাউজ চার্চ' হিসাবে পরিচিত। কিন্তু মনে রাখবেন এই হাউজ চার্চগুলো হাউজ চার্চ হিসাবে থাকবে না। এদের দল ক্রমশ বড় হবে এবং এদের নিজেদের প্রয়োজনেই স্থানীয় মণ্ডলী তৈরি করবে– যে মণ্ডলী হবে দৃশ্যমান

মণ্ডলী। এরকম সময়ে বিশেষ ভাবে বিরোধিতা আসবে, আক্রমণ আসবে, কারণ শয়তান দৃশ্যমান মণ্ডলীকে ভয় করে। এই সময়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখবেন, এই সময়টা অতিক্রান্ত হলেই আপনি স্থানীয় ভাবে শক্তিশালী রূপে স্থাপিত হবেন এবং শয়তানের কোন শক্তি আর ততটা আপনার বিরুদ্ধে কাজে লাগবে না। সেই পর্যন্ত আমাদেরকে বিরোধিতা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলাদেশের মণ্ডলীকে এমন লক্ষ্য স্থাপন করে কাজ করতে হবে যে লক্ষ্য স্থাপন ঈশ্বর চান। সেই ঈশ্বরীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এ্যাকশনে যেতেই হবে এবং এর জন্য যে বিরোধিতা আসবে তা মোকাবেলা করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলে প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধি লাভ করবে– শতকোটি মানুষ প্রভুর নাজাতে আলোকিত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। পবিত্র শাস্ত্র বলে, "যিনি আমাকে শক্তি দেন তাঁর জন্য আমি সবই করতে পারি।" (ফিলিপীয় ৪:১৩)। আমেন।

‘যীশু’ আশ্চর্য এক নাম

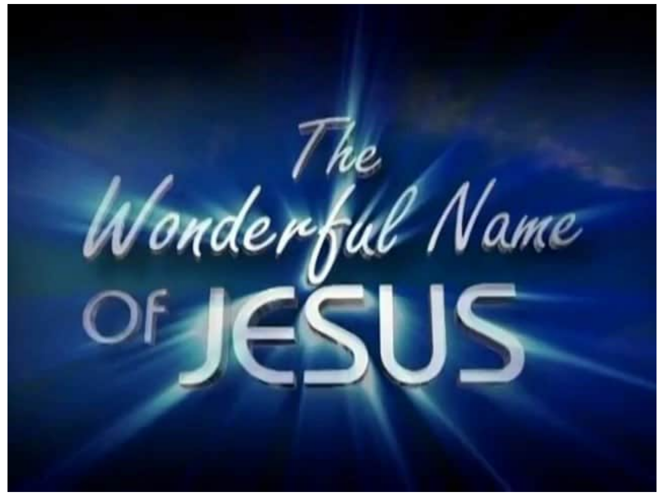

আজকের আলোচনা পবিত্র শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত পদ দিয়েই শুরু করতে চাই। সাধারণত এই পদটি আমরা বড়দিনের বাণীতে বেশি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আজ আমি পদটি আরও বড় রকমের অর্থে ব্যবহার করতে চাই। আর সত্যি তা শুধু মাত্র তাঁর জন্মের বিষয়ে নয় কিন্তু তাঁর চিরকালীন সত্ত্বার বিষয়। পদটিতে লেখা আছে, *ÒKviY GKwU evjK Avgv‡`i Rb¨ R‡b¥‡Qb, GKwU cyÎ Avgv‡`i‡K †`Iqv n‡q‡Q; Avi ZuviB Kuv‡ai Dc‡i KZ©Z¡fvi _vK‡e Ges Zuvi bvg n‡e ÔAvðh© gš¿x, wecyj kw³ Cki, wbZ¨¯’vqx wcZv, kvwšÍivRÕÓ (wh‡kvBq 9:6)*|

এই পৃথিবীতে জন্মের পূর্বে কারো কখনো কোন নাম দেওয়া হয় না। সাধারণত জন্মের পরেই নাম দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কি নাম রাখবে তা বলা হয়েছে, যেমন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের নাম। যোহন জন্মাবার আগেই তাঁর জন্মের শুভ সংবাদ দেবার মুহূর্তে স্বর্গদূত তার পিতার কাছে এই নাম রাখার কথা বলেছিলেন। তবে যোহনের নাম যোহন ছাড়া আর কিছু ছিল না। অপরদিকে যীশু খ্রীষ্টের নামও স্বর্গদূত দ্বারা স্থিরকৃত হয়েছিল এবং তাঁর মা-বাবা সেই নামই তাঁর জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু যীশুর এই নামটি ছাড়া আরও অনেক নাম তাঁর ছিল যে নাম তাঁর জন্মের শত শত বছর আগেই দেওয়া হয়েছিল। যেসব নাম দিয়ে আমরা তাঁকে জানতে পারি, তাঁকে তাঁর আসল স্বরূপ বুঝতে পারি, তাঁর সত্যিকারের সত্ত্বাকে চিনতে পারি এবং

নত হয়ে তাঁর কাছে আমরা আমাদের জীবন সমর্পণ করি।

যুগে যুগে আমরা যীশু নামের শক্তি সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। আমরা যুগ যুগ ধরে চার্চের ইতিহাসে এই নামের শক্তি আবিস্কার করতে সমর্থ হয়েছি। সেই প্রথম যুগ থেকে– প্রেরিতদের যুগ থেকেই আমরা এই নামের শক্তি সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। প্রেরিতেরা মহা শক্তিতে এই নাম ব্যবহার করেছেন। যীশুর স্বর্গে চলে যাওয়ার পর আমরা পিতর ও যোহনকে এই নাম ব্যবহার করতে দেখি কারণ তারা এই নামের মহা পরাক্রম সম্বন্ধে জানতেন। সেজন্যই তারা মন্দিরে যাবার পথে সুন্দর নামক দরজার কাছে জন্মখঞ্জ ভিখারীকে যীশুর নামে হেঁটে বেড়াতে আদেশ করেছিলেন এবং যীশুর নামের শক্তিতে সেই দিন যে লোকটি জন্ম থেকেই খঞ্জ সেই লোকটি হেঁটে বেড়াতে সমর্থ হয়েছিল। আমরা প্রেরিত পৌলকে যীশু নাম ব্যবহার করে অসংখ্য অসুস্থ লোককে সুস্থ করতে দেখতে পাই। এমন কি, যারা তখনও যীশুতে বিশ্বাস করে নি তারাও যীশু নাম ব্যবহার করে মন্দ আত্মা বা মন্দ-আত্মা ছাড়িয়ে বেড়াত। সত্যিই যীশু নাম এক আশ্চর্য শক্তিশালী নাম।

কখনও আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে কি কেন তাঁর নাম যীশু রাখা হল? যীশু নামের অর্থই হল পরিত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা– এই পরিত্রাণ শুধুমাত্র পাপ থেকে পরিত্রাণই নয় কিন্তু একজন বিশ্বাসীর জীবনে যখনই যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন সেই সমস্যা থেকে রক্ষা করতে যীশু সমর্থ। সেজন্যই তিনি যীশু– পরিত্রাণকর্তা । আমরা যতজন তাঁর নামে ডাকি, তাঁকে স্মরণ করি, তিনি আমাদের উদ্ধার করতে সমর্থ।

পবিত্র বাইবেলে যেসব নাম যীশুকে দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। আর বাইবেলে তাঁর নাম বিভিন্নভাবে তালিকাবদ্ধ হয়ে রয়েছে– যেমন:

- ♦ **পরিত্রাতা,** - যিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্তির এক বিশেষ কার্য করে থাকেন।
- ♦ **খ্রীষ্ট,** - যিনি ঈশ্বরের পক্ষে এক বিশেষ মিশন পরিচালনার জন্য অভিষিক্ত।
- ♦ **ঈশ্বরের মেষশাবক,** - যিনি প্রায়শ্চিত্ত সাধনের জন্য নিজেকে বলি হিসাবে দান করবেন।
- ♦ **ইম্মানুয়েল,** - যিনি চেয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে বাস করার জন্য– কারণ তিনি মানুষকে ভাল বাসেন।
- ♦ **ঈশ্বরের পুত্র,** - যিনি ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি অনন্তকাল ধরে আছেন ও থাকবেন ও যিনি সমস্ত সৃষ্টির কাজ সাধন করেছেন।
- ♦ **মনুষ্যপুত্র,** - যিনি ঈশ্বর হয়েও মানুষ– সম্পূর্ণ মানুষ– যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ হলেন মানুষকে ভালবেসে।
- ♦ **বাক্য,** - যিনি পিতার মুখে ছিলেন। পিতার পক্ষে কায´সাধন করতেন।
- ♦ **উদ্ধারকর্তা,** - শুধু মানুষের পাপের মুক্তির জন্য নয় কিন্তু মানুষের সমস্ত সমস্যার উদ্ধার করেন। যারা সদাপ্রভুর নামে ডাকে তারাই উদ্ধার পায়– সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পায়। সেই উদ্ধার তিনিই করে থাকেন।

♦ **উত্তম মেষপালক,** - তিনিই পালনকর্তা। তিনিই উত্তম নেতৃত্বদানকারী। মানব জাতিকে উত্তমরূপে পালন করার ক্ষমতা শুধু তিনিই রাখেন।

♦ **সর্বশক্তিমানের দাস,** - সমস্ত কাজ যা পিতা তাঁর জন্য নিরুপণ করে থাকেন। একজন আজ্ঞাবহ দাসের মতই তিনি সমস্ত কিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন করে থাকেন।

এছাড়াও আরও অনেক নাম তাঁর রয়েছে। কিন্তু যিশাইয় ভাববাদী যে নাম দিয়েছেন সেই নামের কাছে কোনকিছুই তাৎপর্যমূলক নয়– **আশ্চর্যমন্ত্রী, বিক্রমশীল ঈশ্বর, নিত্যস্থায়ী পিতা, শান্তিরাজ**। আসুন আজকে আমরা যিশাইয় ভাববাদীর দেওয়া নামগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করি।

প্রথমত : তাঁর নাম হবে আশ্চর্যমন্ত্রী। মন্ত্রনা প্রদানে যিনি আশ্চর্য বা যিনি আশ্চর্য মন্ত্রনা দান করতে সক্ষম। আশ্চর্যমন্ত্রী নামটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে চাই।

ক. যার সব কিছুই ছিল আশ্চর্য : বিখ্যাত প্রচারক স্পারর্জন বলেছেন অতীতে যীশু ছিলেন আশ্চর্য ব্যক্তি। তাঁর অনন্তকালীন অস্তিত্বের বিষয়ে বিবেচনা করুন, জগত আরম্ভের পূর্বাবধি তিনি ছিলেন পিতার এক মাত্র সত্ত্বা। তিনি ছিলেন পিতার সহিত সমান। তিনি সৃষ্ট নন কিন্তু আদি থেকেই তিনি ছিলেন, ঈশ্বরের সমান, অনন্তকালীন, "ঈশ্বরের একমাত্র অস্তিত্ব।" যীশুর ঐশ্বরিক স্বভাব বাস্তবে আশ্চর্য। মানুষের বেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁকে আমরা বৈৎলেহেমের যাবপাত্রে দেখতে পাই,

এক আশ্চর্য শিশু সন্তান, ঈশ্বর আমাদের সহিত, যার নাম ইম্মানুয়েল এই পৃথিবীতে যতটুকু সময় তিনি যাপন করেন তার সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন আশ্চর্য ব্যক্তি। নাসারতীয় যীশু ছিলেন স্বর্গের রাজা। তথাপি তিনি দরিদ্র হলেন, অবজ্ঞাত, তাড়িত এবং অপবাদক নামে আখ্যাত হলেন। সেই বিষয়টা আমরা বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু আমরা তাঁকে ভালবাসি। যত দিন আমরা বেঁচে থাকব তত দিন আমাদের মতো পাপীর জন্য যন্ত্রনা ও দুঃখভোগের জন্য তাঁর প্রশংসা আমরা করবো। কিন্তু আমরা কোনদিনও হয়তো তা বুঝে উঠতে পারব না। তাঁর নামের সমুদয় দিক দিয়ে বিচার করে তাঁর নামকে অতি অবশ্যই আশ্চর্য বলেই আমাদের সম্মোধন করতে হবে।

কিন্তু তাঁকে ক্রুশের উপরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখুন। তাঁর নিজের শরীরে আপনার পাপের ভার বহন করতে দেখুন। তাঁর হাতে ও পায়ে পেরেক বিদ্ধ হয়ে থাকতে দেখুন। তাঁর শরীর দেখুন, তাঁর পিঠে চাবুকের আঘাত মাথায় কাঁটার মুকুট দেখুন। কিভাবেই না তিনি স্বর্গের গৌরব ছেড়ে এই প্রকারে নিজেকে শেষ করলেন আর এটাই আমাদেরকে আশ্চর্য করে তোলে। তাই সত্যিই তিনি আশ্চর্য যীশু। তিনি আপনার জন্যই প্রচণ্ড দুঃখার্ত? তিনি আপনাকে চিরকালীন ভালবাসায় ভালবেসেছেন। এখানেই এটাই হল তাঁর অনুপম প্রেম। তাঁর এই অনুপম প্রেমের জন্যই তিনি দুঃখভোগ করলে, তাঁর সেই অনুপম শক্তি তাঁকে সমর্থ করে তুলল তাঁর পিতার সমস্ত পাপের ভারকে সহ্য করতে। আর এখানেই তাঁর সীমাহীন দয়ার কারণেই তিনি নিজে দুঃখভোগ করলেন যেন আমাদের মতো পাপী মানুষকে নরকের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই জন্যই এবং তাঁর নামই হবে "আশ্চর্য

মন্ত্রী" কারণ তিনি আশ্চর্য যীশু।

কিন্তু তাঁকে আমরা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হতে দেখি। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে পাতালে ত্যাগ করলেন না এবং তাঁর পবিত্রতমকে বিনষ্ট হতে দিলেন না। তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে উঠলেন। যে কাপড়ে তাঁকে মুড়ে রাখা হয়েছিল তা অতি যত্ন সহকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কবরের পাথরখানি একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং যীশু সেই দিনেই অতি প্রত্যুষে সেই কবর থেকে হেঁটে বাইরে এসেছিলেন। সেইজন্যই তাঁর নাম হবে "আশ্চর্যমন্ত্রী" আর শত শত বছর আগে তা ঘোষণা করা হয়েছিল।

এখন তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর শিষ্যেরা মাথা উঁচু করে তাঁকে স্বর্গে উন্নত হতে দেখেছিলেন। পরিশেষে স্বর্গদূতেরা তাদের বলেছিলেন - যে ভাবে তারা তাঁকে মেঘে উন্নিত হতে দেখলেন সেইভাবে তিনি আবার ফিরে আসবেন। সেই জন্যই "তাঁর নামই হবে আশ্চর্যমন্ত্রী"– সমস্ত মন্ত্রণায় যিনি সত্যিই আশ্চর্য।

খ. তিনি আশ্চর্য মন্ত্রণাকারী ঈশ্বর:

তিনি যখন এই জগতে ছিলেন তখন কিছু মানুষ তাঁর আশ্চর্য মন্ত্রণার পরামর্শের কথা শুনেছিলেন। আর আজকেও অবিশ্বাসী জগতের অনেকে তাঁর আশ্চর্য মন্ত্রণাকারী পরামর্শের কথা অগ্রাহ্য করে। এমনকি আমরা যাঁরা তাঁকে ভালবাসি ও বিশ্বাস করি তারাও তাঁর পরিচালনা মান্য করা থেকে বহু সময়ে দূরে থাকি। যিনি "সমস্ত কিছুর উত্তমরূপে করেন" তাঁর উপর নির্ভর না করে আমরা নিজেদের উপর নির্ভর করি, অধৈর্য হই এবং তাঁর উপরে আস্থা না রেখে নিজেদের উপরেই আস্থা

রাখি।

কিন্তু তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন তা আর সেই মতো থাকবে না। তখন সমস্ত লোকেরা তাঁকে "আশ্চর্য মন্ত্রণাকারী" ব্যক্তি বলেই ডাকবেন। তিনি যখন দাউদের সিংহাসনে বসবেন তখন প্রতিটি জায়গাতে সমস্ত লোক তাঁর অন্বেষণ করবে এবং তাঁর আশ্চর্য মন্ত্রণাকারী পরামর্শের বাধ্য হবে। সেই গৌরবময় দিনে খ্রীষ্টই হবেন ধার্মিক বিচারক এবং রাজাধিরাজ। আর তিনিই হবেন এই জগতের বিক্রমশীল ব্যক্তি। কোন এক কবি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

"সূর্যের ন্যায় হবে যীশুর রাজত্ব
সেখানেই শুরু হবে তার আধিপত্য;
তটে তটে ছড়িয়ে পরবে তাঁর রাজত্ব,
যতক্ষণ পর্যন্ত না চন্দ্রাতাপের জ্যোতি হয় অবক্ষয়।"

দ্বিতীয়ত : তাঁর নাম হইবে বিক্রমশালী ঈশ্বর

আজকে মানুষ তাঁকে সেই নামে উন্নত করে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে বিভ্রান্তিকর মুর্খ হিসাবে ডাকেন। হিন্দুরা তাঁকে "অবতার" বলে ডাকেন। মুসলমানেরা তাঁকে একজন "সাধারণ নবী হিসাবে ডাকেন। যিহোবা ওয়িটনেসের লোকেরা তাঁকে "সৃষ্ট সত্ত্বা" হিসাবে আখ্যা দেন। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে তাঁকে "বিক্রমশালী ঈশ্বর" হিসাবে সম্মানিত করেন। হাল্লেলুইয়া! তিনি হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্ত্বা। স্বর্গে এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়ছে। "বিক্রমশালী ঈশ্বর" কি আশ্চর্যই না এই যীশুর নাম!

- "বিক্রমশালী"- কি অদ্ভুতই না এই নাম! সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত শক্তি,

সমস্ত প্রতাপ এবং পরাক্রম তাঁর মশীহের পরাক্রমি শক্তি এই জগতকেই কিছু না থেকে অস্তিত্বের মধ্যে নিয়ে এলো।

- ♦ সমস্ত অবিন্যস্ত অবস্থা থেকে তাঁর রব সমস্ত কিছুকে সুবিন্যস্ত করলো। তাঁর আদেশে সমস্ত অন্ধকার থেকে জ্যোতির আগমন হল।
- ♦ যেখানে আমাদের জন্য অনন্তকালীন দণ্ডাজ্ঞা ও মৃত্যু স্থিরকৃত হয়েছিল– সেই মৃত্যুর ও দণ্ডাজ্ঞার হাত থেকে তিনি নিয়ে এলেন অনন্তকালীন জীবন। মশীহের পরাক্রমি শক্তির দ্বারাই সমস্ত প্রকৃতি পূর্ণ করবে তাঁর উদ্দেশ্যকে। সমস্ত প্রকার ফুল, সমস্ত পাখি, সমস্ত বৃক্ষ, সমস্ত পর্বত, সমস্ত উপত্যকা, বজ্রপাতের সমস্ত আওয়াজ এবং বিদ্যুতের চমকানি মশীহের শক্তির কথাই ব্যক্ত করে, কারণ “তাঁর নাম হবে বিক্রমশীল ঈশ্বর।”

তৃতীয়ত : তাঁর নাম হবে নিত্যস্থায়ী পিতা

এই নামকে ব্যাখ্যা করা আমার কাছে অত্যন্ত শক্ত কাজ বলে মনে হয়। স্পারর্জন বলেছেন, “যতদূর পর্যন্ত ঈশ্বরত্বের অস্তিতের কথা বলা যায়, আমাদের প্রভুর প্রকৃত নাম, সেই দিক দিয়ে তিনি পিতা নন কিন্তু তিনি হলেন পুত্র। অতএব বিভ্রান্তিকর বিষয় থেকে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। সেই পুত্র পিতা নন, আর নাতো পিতা পুত্রের ভূমিকা পালন করেন; এই বিষয়টা অতি সতর্কতার সঙ্গে বিশ্বাস এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সেই পিতা কোন পুত্র নন এবং সেই পুত্রও পিতা নন। আমাদের পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশ সেই ব্যক্তিত্বের অবস্থান এবং উপাধির প্রসঙ্গে একে অপরের বিষয়ে কিছু তুলে ধরছে না; এটা সেই ঐশ্বরত্বের যে সম্পর্ক সেই বিষয়ে ইঙ্গিত করছে না, বরং আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করছে। আমাদের কাছে তিনি ‘নিত্যস্থায়ী পিতা’।”

তিনি হলেন নিত্যস্থায়ী পিতা, "যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যা ছিলেন তিনি তাই আছেন" (ইব্রীয় ১৩:৮)। তিনি চিরকাল ছিলেন। তিনি চিরকাল যা ছিলেন তাই আছেন। তাঁকে বলা হয় "পিতা।" কোন দিক দিয়ে যীশু একজন পিতা? চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি হলেন একজন পিতা, শেষ আদমের ন্যায় তিনি হলেন উদ্ধারপ্রাপ্ত সকলের মস্তক। আমাদের প্রতি প্রথম যে অভিশাপ বা দণ্ডাজ্ঞা এসেছে তা প্রথম আদমের অপরাধের ফলেই এসেছে। সেই আদম ছিলেন আমাদের আদি-পিতা। কিন্তু এখন আমরা খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে অবস্থান করছি। তিনি হলেন আমাদের চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ের মস্তক। তিনি হলেন তাঁর লোকেদের পিতা। আদম আমাদের "নিত্যস্থায়ী পিতা" নয়, কিন্তু যীশু হলেন আমাদের "নিত্যস্থায়ী পিতা," ঠিক নতুন চুক্তির এক মস্তক। তিনি হলেন সমস্ত খ্রীষ্টানদের পিতা, খ্রীষ্টানিটির পিতা, যে অনুগ্রহের মধ্যে আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি সেই সমস্ত পদ্ধতির পিতা হলেন তিনি। আপনি যদি হারানো অবস্থার মধ্যে থেকে থাকেন তবে এখনও পর্যন্ত আদম হলেন আপনার পিতা। কিন্তু আপনি যদি তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন তবে যীশু হলেন আপনার "নিত্যস্থায়ী পিতা," এবং আপনার আত্মার পরিত্রাণকর্তা।

চতুর্থত : তাঁর নাম হবে শান্তিরাজ

যীশু যখন বৈৎলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন তখন স্বর্গদূতেরা বেশ কিছু রাখাল বালকদের কাছে প্রকাশিত হয়ে তাদের কাছে ঘোষণা করে বলেন, "উদ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতিপাত্র, মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি" (লূক ২:১৪)।

আমাদের শান্তিপ্রদানের জন্য যীশুর আগমন হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের শান্তি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন নিয়ম বলে, "অতএব বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধার্মিক পরিগণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে" (রোমীয় ৫:১)। আমাদের পাপ ক্ষমা করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মিলন করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করলেন। "তাঁর ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করে তাঁর দ্বারা যেন নিজের সঙ্গে স্বর্গের হোক, বা পৃথিবীর হোক, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁর দ্বারাই করেন" (কলসীয় ১:২০)।

কিন্তু তিনি যখন "শান্তিরাজ" হিসাবে মেঘ সহকারে পুনরায় আগমন করবেন তখন তিনি এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবেন। সেই দিনে "আর তিনি জাতিদের বিচার করবেন এবং অনেক দেশের লোক সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করবেন; আর তারা নিজ নিজ তলোয়ার ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফাল গড়বে ও নিজ নিজ বর্শা ভেঙ্গে কাস্তে গড়বে; এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে আর তলোয়ার তুলবে না, তারা আর যুদ্ধ শিখবে না" (যিশাইয় ২:৪)।

পরিশেষে আবারও যিশাইয় ভাববাদীর বিখ্যাত উক্তিটি হৃদয়ে ধারণ করুন: "কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন, একটি পুত্র আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে; আর তাঁরই কাঁধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকবে এবং তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, নিত্যস্থায়ী পিতা, শান্তিরাজ'" (যিশাইয় ৯:৬)।

আমি প্রার্থনা করি যেন আজ আপনি যীশুতে নির্ভর করেন। তাঁর সমস্ত সুন্দর নাম এটাই প্রকাশ করে যে, তিনি আমাদের জন্য কি করতে পারেন। আপনি তাঁর নামে যেমন পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন তেমনি আপনার সমস্ত সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট থেকে তাঁর নামে উদ্ধার পেতে পারেন। আপনার সমস্ত সমস্যা, বিপদ তাঁর উপর ফেলে দিতে পারেন। তিনি আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তিনি আপনার লজ্জাকে তাঁর রক্তের দ্বারা পরিষ্কার করতে পারেন। তাঁর রক্ত আমার/ আপনার জন্য পাতিত হয়েছে। সেজন্য বাপ্তিস্মদাতা যোহন বলেছেন, "ঐ দেখো ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার বহন করে নিয়ে যান" (যোহন ১:২৯)। আমেন।

সাক্ষ্যমের স্তিফান ও আজকের আমরা

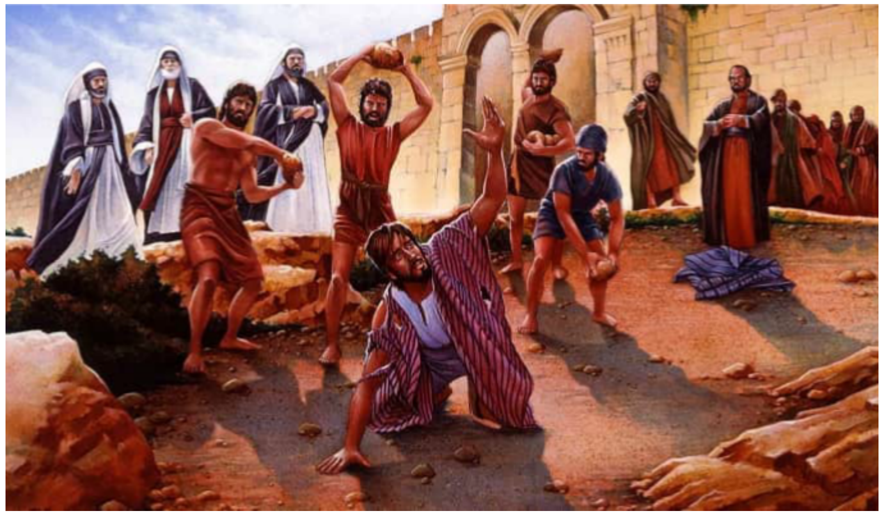

আজকের আলোচনার জন্য প্রথমেই নতুন নিয়ম থেকে দু'একটি পদ পাঠ করতে চাই। পদগুলোর কথা মনে থাকলে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুটা ধরতে আমাদের জন্য সুবিধে হবে। আমি বিশ্বাস করি এতে আমাদের মনের খোলা দরজা দিয়ে যে চিন্তাগুলো প্রবাহিত হবে তাতে ঈশ্বর যা বলতে চান তা হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হব। পদগুলো হল, *ÒwKš‘ wZwb cwe¨ AvZ¥vq cwic~Y© n‡q ¯^‡Mi cwZ GK `„ó †P‡q †`L‡jb †h, Ck¦‡ii gwngv i‡q‡Q Ges hxï Ck¦‡ii Wvb cv‡k `vuwo‡q Av‡Qb, Avi wZwb ej‡jb, †`L, Awg †`LwQ, ¯^M †Lvjv i‡q‡Q Ges gbyl¨cyÎ Ck¦‡ii Wvb cv‡k `vuwo‡q Av‡QbÓ* **প্রেরিত ৭:৫৫-৫৬। "তখন এক নির্ধারিত দিনে হেরোদ রাজপোশাক পরে সিংহাসনে বসে তাদের কাছে বক্তৃতা করলেন" প্রেরিত ১২:১। "আমি তোমাদেরকে যা বলেছি, আমার সেই কথা স্মরণে রেখো, 'দাস তার প্রভু থেকে বড় নয়;' লোকে যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরকেও নির্যাতন করবে; তারা যদি আমার কথা পালন করতো, তোমাদের কথাও পালন করতো" যোহন ১৫:২০।**

বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই এই বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। সারা পৃথিবীতেই সাক্ষ্যমরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষ করে যুদ্ধপিরিত

দেশগুলোতে যেভাবে বিশ্বাসের জন্য লোকেরা জীবন দিচ্ছে তাতে প্রাণ আত্‌কে উঠে। আমাদের দেশেও বিগত বছর জুড়ে বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে– বিশেষ করে তাদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের জন্য জীবন দিতে হয়েছে। জীবন দেওয়া ছাড়াও নানাভাবে নির্যাতনের শিকার অনেকেই হচ্ছে সেটা হয়তো আমাদের অনেকের চোখেও পড়ে না। এরই ধারাবাহিকতায় কয়েক দিন আগে আমরা হোসেন আলী ভাইকে আমাদের দেশের লোকেরা প্রভুর কোলে চির বিশ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাকে তারই বাড়ির কাছে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। গত এক দশকে এমন অনেককে তারা প্রভুর কোলে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমরা যদি এনালাইসিস করে দেখি তবে দেখব যে, এদের মধ্যে কেউই সেই রকম নেতা গোছের নয়; এরা ঈশ্বরের রাজ্যের সাধারণ কর্মী। ঈশ্বরের সহকর্মী। কেন ঈশ্বর এই সাধারণ কর্মীদেরই এই গৌরবের সম্মান দিয়ে থাকেন?

পারর্সিকিউশন বা নির্যাতন যুগে যুগে ঈশ্বরের লোকদের উপর নেমে এসেছে, তাদের রক্ত উৎসর্গের রক্ত হিসাবে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র বাইবেল নির্যাতিতদের ইতিহাসের পুস্তক– নির্যাতিতরাই পবিত্র বাইবেল লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, বিতরণ করেছেন। আর সত্যি কথা বলতে কি যারা এই সেবা কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের এখনও নির্যাতন করা হচ্ছে।

একটু চিন্তা করে দেখুন তো যোষেফকে কতভাবে নির্যাতন করা

হয়েছে– তাঁর ভাইয়েরা নির্যাতন করেছে, মিসরীয়েরা নির্যাতন করেছে। মিসরে ইসরাইলীয়দের শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে রাজ আদেশের দ্বারা। তারই ধারাবাহিকতায় মোশির উপরে কি রকম নির্যাতন নেমে এসেছে– তাঁকে ফৌরণের ভয়ে পালাতে হয়েছে, কতব-ার তার নিজের লোকেরাই তাকে পাথর মারতে চেয়েছে। এই মোশিই পবিত্র বাইবেলের প্রথম পাঁচটা পুস্তক যাকে আমরা পঞ্চ পুস্তক বলি সেই পুস্তকগুলো লিখেছেন বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে।

রাজা দায়ূদ কত রকম ভাবে নির্যাতিত হয়েছেন– জীবনের বেশীরভাগ সময়েই রাজা শৌলের ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। এমন কি নিজের দেশেও থাকতে পারেন নি– পালিয়ে পাশের দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। রাজ পরিবারের সদস্য ভাববাদী যিশাইয় এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছেন যে, তাঁকে গাছ কাটার করাত দিয়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে ফেলেছেন বলে কথিত আছে। ভাববাদী যিরমিয়কে মেরে ফেলবার জন্য শুকনো কূয়োর মধ্যে দিনের পর দিন ফেলে রেখেছে যেন সেখানেই তিনি মারা যান। বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে রাজা হেরোদের আদেশে কারাগারে মাথা কেটে হত্যা করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলে যে সমস্ত প্রমিন্টে ফিগার আছে তাদের প্রত্যেকের বেলায়ই এই কথা সত্যি।

ঈশ্বরের লোকদের প্রত্যেকের জীবনে এমন কোন না কোন ঘটনা আছে নির্যাতনের। তারা তাদের বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিয়েছেন অকাতরে। এমন কি যে যীশু আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন– তাঁর শিশু কালে তাঁর জীবনের জন্য অনেকগুলো শিশুকে জীবন দিতে হয়েছে। এরপর যীশু

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি মানুষকে ভালবেসে এই পৃথিবীতে এলেন তাঁকেই মানুষ হত্যা করলো।

ঈশ্বরের লোকদের হত হবার বা জীবন দেবার ইতিহাস খুবই দীর্ঘ। ইঞ্জিল শরীফে হত বা সাক্ষ্যমর হবার ইতিহাসও খুবই লম্বা যেখানে আমরা স্তিফানকে প্রথমে দেখতে পাই। প্রেরিতদের সবাই– একমাত্র শিষ্য যোহন ছাড়া বাকী সবাই সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন। যোহনকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু ঈশ্বর অনুমোদন দেন নি।

প্রত্যেকটি নির্যাতনেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট আছে। আজকে আমরা স্তিফানের সাক্ষ্যমর হওয়ার বিষয়টি একটু গভীরভাবে দেখতে চাই। সেই সময়কার মণ্ডলী ছিল একেবারে নতুন, খ্রীষ্টান নাম তখনও তাদের উপর বর্তায় নি। যিহূদীদের একটি নতুন শাখা হিসাবেই তারা আত্মপ্রকাশ করেছিল– যেখানে একদল যিহূদী যীশু নামে একজনকে খ্রীষ্ট বা মশীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাঁর দেওয়া শিক্ষাগুলো তারা মানতে শুরু করেছে।

মণ্ডলী তখন নতুন, কার্যকর। এর সভ্যগণ সবাই সামাজিক ভাভে যিহূদী– ধর্মীয়ভাবে তারা নবগঠিত মণ্ডলীর লোক। দিনের পর দিন মণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোকেরা তাদের সম্মান করতো, ভয়ও করতো যে তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মহা মহা আশ্চর্য কাজ করছেন। যিরূশালেমের বিশ্বাসীরা একটি পরিবারের মত, একসঙ্গে থাকত, খেত এবং খরচের যোগান দিত। তাদের জায়গাজমি বিক্রি করে প্রেরিতদের হাতে দিত যেন মণ্ডলী চলতে পারে।

আর এদিকে প্রেরিতগণ ঈশ্বরের বাক্য প্রচারে নিয়োজিত। মণ্ডলীর লোকেরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ। ঈশ্বর তাদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হচ্ছেন। তখনও পর্যন্ত অ-যিহূদীদের জন্য মণ্ডলীর দরজা খোলা হয় নি। তখনও তারা ঈশ্বরের রাজ্যরূপ মণ্ডলীর বাইরে অবস্থান করছে।

এই অবস্থায় আমরা স্তিফানকে দেখতে পাই মণ্ডলী তাঁকে পরিচর্যাকারী হিসাবে বেছে নিয়েছে। যে সতজনকে বেছে নেওয়া হয় তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। লেখা আছে প্রভু স্তিফানের মধ্য দিয়ে মহা মহা আশ্চর্য কাজ করতে লাগলেন। প্রভু তাঁর প্রেরিতদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন পবিত্র আত্মা আসলে পর যখন তারা শক্তিপ্রাপ্ত হবেন তখন প্রথমে যিরূশালেম, এরপর শমরিয়া, এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত তাঁর সাক্ষী হবে। কিন্তু সেই সময় তারা কেবল যিরূশালেম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারা ভুলেই গিয়েছিলেন যে, তাদের পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে হবে।

স্তিফানের নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যিরূশালেমের ঈমানদারগণ ছড়িয়ে পরেছিল। তারা এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছিল এবং সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল সুসমাচার। এর ফলে মণ্ডলী দ্রুত অ-যিহূদী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মণ্ডলীর প্রচারের মূল কেন্দ্র যিরূশালেমে নয় কিন্তু আন্তিয়খিয়াতে চলে যায় এবং সেখান থেকেই বিশ্ব মিশনের ইতিহাস পরিচালিত হয়। এটা হতো না, যদি যিরূশালেমে এই নির্যাতন নেমে না আসতো। স্তিফানের সাক্ষ্যমরের পরে প্রতিটি বিশ্বাসীই হয়ে উঠেছে স্তিফানের মত সাহসী, নির্ভিক যারা প্রভুর রাজ্য বিস্তারে নিজেকে দিয়ে দিয়েছেন।

আমরা কোন কোন সময় চিন্তা করি– আজ যদি প্রভু আমাদের কাউকে মহা মহা পরাক্রম কাজ ও অলৌকিক কাজ, সুস্থ করার কাজ দিয়ে পরিচালিত করেন ও একই সঙ্গে মানুষকে প্রভুর কাজে আসবার আহ্বান জানান তবে কি হবে? এর ফল কি খুব ভাল হবে, মণ্ডলীর জন্য কি সুখময় হবে? দলে দলে কি লোকেরা প্রভুর কাছে আসবে? নাকি শত্রুতা বেড়ে যাবে, ও অত্যচার নেমে আসবে? আমি যখন প্রথম ঢাকায় আসি তখন শুনতে পেয়েছিলাম যে, কয়েক বছর আগে একজন প্রচারক-মিশনারী এসেছিলেন ও তিনি সুস্থ করার কাজ করছিলেন ও প্রচার করছিলেন। দলে দলে লোকেরা সুস্থ হবার জন্য তার কাছে আসতো। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সরকারী লোকদের নজরে এলেন এবং পরে তাকে ধরে এয়ারপোর্টে তুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে তিনি আর প্রচার করতে না পারেন। আপনারা যদি প্রেরিত পুস্তক পাঠ করেন তবে দেখতে পাবেন, পৌল ও বার্ণবা এবং তাদের সঙ্গী সাথীরা যখন পরাক্রমের সঙ্গে প্রচার করছিলেন, লোকদের মধ্যে আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করছিলেন তখনই যিহূদীদের মধ্য থেকে একটি বিরুদ্ধ শক্তি তাদের উপর ঝাপিয়ে পরেছে ও তাদের কাজ বন্ধ করতে চেয়েছে কারণ তারা ভাল করেই জানতো যে, যদি তারা এভাবে আশ্চর্য কাজ করতে থাকে তবে তাদের জাতির অন্য সকল যিহূদীরা 'সেই পথে' চলে যাবে। এর মানে ঈশ্বর যখন তাদেরকে আশ্চর্য কাজ করার শক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন তাঁর রাজ্য বৃদ্ধির জন্য তখনই শয়তানের শক্তিও যিহূদীদের মধ্য দিয়ে সেই কাজে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিত। আজও এই থিওরি একই ভাবে কাজ করে।

তবে এসবের মধ্য দিয়ে আমরা একটা বিষয় দেখতে পেয়েছি যে, যুগে

যুগে নির্যাতনের মধ্য দিয়েই সুসমাচার বৃদ্ধি পায়– প্রথম যুগেও তা হয়েছিল এবং আজও তা হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা চিন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়ার কথা বলতে পারি। এখনও পর্যন্ত বলতে গেলে বাংলাদেশে তেমন নির্যাতন নেই, তাই মণ্ডলীর ক্রমবৃদ্ধিও খুব কম। আমরা যদি বাংলাদেশে মণ্ডলীর ক্রমবৃদ্ধি চাই তবে নির্যাতনকে আমাদের সুস্থ ও ভালমনেই গ্রহণ করতে হবে।

এবার আসুন নির্যাতনকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটু আলোচনা করি। সাধারণত দু'রকম ভাবেই নির্যতনকে দেখা হয়ে থাকে– যেটাকে আমরা পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ও নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি বলে থাকি। পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি: দুঃখ-কষ্ট বা নির্যাতন ভোগ করা যখন সাহায্য হয়।

- ♦ কেন দুঃখ-কষ্ট বা নির্যাতন নেমে এসেছে তা বুঝবার জন্য, ধৈর্যের জন্য ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি।
- ♦ আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করি, হতে পারে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে তা নিয়ে যথেষ্ট সময় ধরে চিন্তা করি না।
- ♦ আমরা এর জন্য প্রস্তুত থাকি বিষয়টি চিহ্নিত করার জন্য ও যারা এই কষ্টের মধ্যে পড়েছে তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য।
- ♦ যারা ঈশ্বরের পথে চলেন তারা যদি সাহায্য করতে চান তবে তাদের জন্য যেন দরজা খোলা রাখি।
- ♦ আমরা নির্ভরযোগ্য ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকি।

- ♦ খ্রীষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে যে কষ্টভোগ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের কষ্টভোগকে চিহ্নিত করে তা বুঝতে চেষ্টা করি
- ♦ এই পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের যে কষ্টভোগ চলছে তার সঙ্গে নিজেদের এক করে দেখতে শিখি।

নির্যাতন ভোগের নেগেটিভ দৃষ্টিভংগি: দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা যখন ক্ষতি হয়–

- ♦ আমাদের মন যখন শক্ত হয়ে যায় ও আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করি।
- ♦ আমরা কোন প্রশ্ন করতে অস্বীকার করি এবং এতে আমাদের জন্য যে ভাল শিক্ষা রয়েছে তা বুঝতে ব্যর্থ হই।
- ♦ এর মধ্য দিয়ে যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে তুলি।
- ♦ অন্যেরা আমাদের যে সাহায্য দিতে চায় তা নিতে অস্বীকার করি।
- ♦ এই কষ্টভোগ থেকে ঈশ্বর যে ভাল কিছু নিয়ে আসতে পারেন তা অস্বীকার করি।
- ♦ ঈশ্বরকে অন্যায় বিচার করেছেন বলে আমরা যখন তাঁকে দোষারোপ করি ও অন্যদেরকে তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য পরিচালনা দিই।
- ♦ আমরা আমাদের জীবনকে পরিবর্তনের জন্য কোন সুযোগ না দিই।

নতুন নিয়মে প্রেরিতেরা নির্যাতনকে পজেটিভ দৃষ্টিভংগিতে নিয়েছিলেন: প্রেরিত কিতাবে লেখা আছে: “তখন প্রেরিতেরা মহাসভার সম্মুখ থেকে

আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন, কারণ তাঁরা সেই নামের জন্য অপমানিত হবার যোগ্যপাত্র গণিত হয়েছিলেন।” প্রেরিত ৫:৪১।

যে দেশগুলোতে সুখবর প্রচারে কোন বিধিনিষেধ নেই, কোন রকম নির্যাতন নেই, সেই সব দেশের মণ্ডলীগুলো নির্জীব হয়ে পড়েছে মরে যাচ্ছে– ইউরোপ, আমেরিকার অবস্থাও সেই রকম। নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সেই দেশে একদিন খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস প্রচারিত হয়েছিল এমন কি পুরো দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাস একমাত্র ধর্মবিশ্বাস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সব দেশগুলোতে ধর্মীয় বিষয়ে অবারিত স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং এই স্বাধীনতার সুযোগে অন্য ধর্মগুলো সেই সমস্ত দেশগুলোতে ঢুকে পরে তাদের ধর্মের বিস্তার ঘটাচ্ছে আর খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস লোপ পাচ্ছে। এটা আমরা পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে নির্যাতন আছে সেখানে মণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন হল আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও মাণ্ডলীক জীবনে নির্যাতানকে কি হিসাবে দেখব? আমরা কি স্তিফানের মর্জাদা চাই না? মানুষ তো একদিন মরবেই কিন্তু যে মরণে ঈশ্বরের গৌবর হয়, সুসমাচার বৃদ্ধি পায় আমরা কি সেই মরণ চাই না? ঈশ্বর আমাদের নিজেদের অন্তরকে আলোকিত করুন।

এর মানে এই নয় যে, আমরা মণ্ডলীতে অত্যচারকে নামিয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজ -কর্ম চালিয়ে যাব। প্রভু যে সেবা-কাজ আমাদের কাছে সমর্পণ করেছেন নির্যাতনের ভয়ে তা থেকে পালিয়ে যাব না কিন্তু সতর্ক

থাকবো কারণ প্রভুই বলেছেন যেন আমরা সাপের মত সতর্ক হই ও কবুতরের মত দয়ালু হই।

আমাদের এই কথাও মাথায় রাখতে হবে যে, যুগের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইচ্ছে করলেই আমরা মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু গুটিয়ে এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারি না। সেজন্য একজন খ্রীষ্টীয় হিসাবে আমাদের চারপাশে যারা বাস করে তাদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এমন কোন কাজ আমরা করবো না যাতে আমাদের প্রতি তাদের ভালবাসা কমে গিয়ে শত্রুতায় রূপ নেয়।

পরিবার ও মণ্ডলী নিয়ে আমাদের বাস করতে হলে অবশ্যই প্রতিবেশীকে ভালবাসার এই অত্যাবশ্যকীয় সত্যটি আমাদের পালন করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের নিরাপত্তা প্রভুর কাছ থেকে আসে– এবং প্রভু আমাদের চারপাশের লোকদের মধ্য দিয়েই কাজ করেন।

আমাদের অনেকেরই এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে এবং অনেককেই এমন কাহিনী আমরা বলতে শুনেছি যে, প্রভুর রাজ্য বিস্তারের কাজে যখন কোন আক্রমন এসেছে, কোন বাধা এসেছে অথবা কোন বিপদ নেমে এসেছে, তখন তাদের সাহায্য করতে যারা এগিয়ে এসেছে তারা আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের কেউ নন। অথচ তারাই আমাদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন। যদি প্রশ্ন করেন কেন এটা হয়েছে? প্রকৃত অর্থে ঈশ্বর আপনাকে বাঁচাবার জন্য তাদের ব্যবহার করেছেন। আজও তিনি

তা করে থাকেন। আসুন যিনি আমাদের জীবনের অধিকর্তা আমরা তাঁর উপর নির্ভর করে সৎভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করি। তিনিই আমাদের এপারের ও ওপারের রক্ষাকর্তা। আমেন।